মোবায়েদুর রহমান

পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং

প্রাসঙ্গিক জটিলতা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

মোবায়েদুর রহমান

পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা

মোবায়েদুর রহমান

বি আই এল আর এল এ সি-৬

ISBN : 978-984-33-3068-6

প্রকাশনায় : **এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**
জেনারেল সেক্রেটারী
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭, মোবাইল : ০১৯৪০-৩৮২১২৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

প্রকাশকাল : জুলাই : ২০১১

প্রাপ্তিস্থান : সকল সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী

প্রচ্ছদ : কালার ক্রিয়েশন

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ : গ্রীনটাচ্

দাম : ২৫০ টাকা US $ 10.5

Published by **Advocate Muhammad Nazrul Islam**. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Dhaka, Price Tk. 250 US $ 10.5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আব্বা মরহুম আফছার উদ্দিন আহমদ
এবং
আম্মা মরহুমা মেহের আকতারকে

মোবায়দুর রহমান

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

জনাব মোবায়েদুর রহমান বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক, বিশ্লেষক, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং চিন্তাবিদ। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তার কিছু অনন্যপ্রসূ কলাম এর সমন্বয়ে গ্রন্থিত হয়েছে এ পুস্তক।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার– মূলত একটি আইন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Think Tank)।

সংবিধান আইনেরই একটি অংশ। সংবিধান রাষ্ট্রপরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। সংবিধানের বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনের বিষয়সমূহ, তার পটভূমি ও যৌক্তিকতা এ পুস্তকে উপস্থাপিত নিবন্ধসমূহে স্থান পেয়েছে।

এ পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দবোধ করছি। এ পুস্তক প্রকাশে আমাদের দায়িত্ব দেয়ায় আমরা জনাব মোবায়দুর রহমানের নিকট কৃতজ্ঞ। আশা করি এ পুস্তক পাঠে দেশের জনগণ বিশেষভাবে, ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, পেশাজীবি রাজনীতিবিদ ও আইনবিদগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সব প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন এই মহাবিশ্ব এবং তার প্রাণীকুলকে এবং যার অপার করুণায় এই গ্রন্থটি দিনের আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে।

শুরুতেই আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে, আমি পেশায় কোনো আইনজ্ঞ নই, নই কোনো সংবিধান বিশেষজ্ঞ। সংবিধান নিয়ে অথবা রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে কোনো মামলা মোকদ্দমার রায়ের ওপর মন্তব্য করার মত বিশেষ জ্ঞান অথবা ধৃষ্টতা কোনোটাই আমার নেই। তবে দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক বিবর্তন (Constitutional Development) সম্পর্কে বরাবরই আমার প্রচন্ড আগ্রহ ছিলো এবং এখনও আছে। তাই পাকিস্তানের গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়াকে কেন্দ্র করে তৎকালীন স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দীন খান যখন সিন্ধু হাইকোর্টে মামলা করেন, তখন থেকে আমি মামলার অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। তখন এসব বিষয় বোঝার মত আমার মস্তিষ্ক পরিপক্বতা লাভ করেনি। তাই প্রথমে সিন্ধু হাইকোর্টের রায় এবং পরবর্তীতে ফেডারেল কোর্টের রায়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও আমি মামলাগুলোর রায় গভীর মনোযোগের সাথে পড়ি। এরপর পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আইয়ুব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, জেনারেল জিয়াউল হক প্রমুখের সামরিক শাসন সংক্রান্ত মামলার রায় আমি পাঠ করি এবং ঐসব রায়ের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করি। জেনারেল পারভেজ মোশাররফের কতিপয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ইফতেখারউদ্দীন আহমদের কঠোর অবস্থান আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করি।

বাংলাদেশ হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ তাদের রায়ে খন্দকার মোশতাক, জাস্টিস আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, জিয়াউর রহমান প্রমুখের সমগ্র শাসনকালকে যখন অবৈধ ঘোষণা করেন এবং তাদের সকলকেই অবৈধ ক্ষমতার দখলদার হিসেবে চিহ্নিত করেন তখন সারাদেশে ভূমিকম্পের মত একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঐ বেঞ্চের যে দুইজন বিচারপতি এই রায় দেন তাঁরা হলেন বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবির। পরে জনাব খায়রুল হক বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদের সপ্তম সংশোধনী বাতিল করেছেন হাই কোর্ট ডিভিশনের অপর একটি বেঞ্চ। সম্প্রতি ঐ বেঞ্চের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। জেনারেল এরশাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করেননি। তাই সপ্তম সংশোধনী সম্পর্কে এখন পর্যন্ত হাইকোর্টের এই রায়টিকেই উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায় বলে গণ্য করা যায়। আমি গভীর বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, সপ্তম সংশোধনীর রায়টিতে এরশাদের মার্শাল ল'কে অবৈধ বলা হলেও সেখানে এরশাদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যত কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলা হয়েছে মরহুম জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এরশাদের সামরিক শাসনের কথা বলতে গিয়ে সেই লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান সৃষ্টি এবং সবশেষে 'জয় বাংলা' 'বাংলাদেশ বেতার' 'রেডিও বাংলাদেশ' এসব প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রেও মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। পঞ্চম এবং সপ্তম সংশোধনী বাতিল রায়ে যতগুলো পয়েন্ট এবং বিষয় আনা হয়েছে তার প্রায় অধিকাংশই রাজনৈতিক। যেসব রাজনৈতিক বিষয়ে উচ্চ আদালতের কয়েকজন মাননীয় বিচারপতি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেই সব সিদ্ধান্তের সাথে দেশের বড় দুই তিনটি রাজনৈতিক দল একমত নয়। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে চারটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার দুইটিতে আওয়ামী জোট এবং দুইটিতে বিএনপি জোট জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের রায় একটি জোটের পক্ষে এবং একটি জোটের বিপক্ষে গিয়েছে। এর ফলে আমাদের উচ্চ আদালত দেশের মৌলিক রাজনৈতিক ইস্যুতে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। উচ্চ আদালতের বিশেষ মর্যাদার কারণে এসব রাজনৈতিক বিষয় থেকে তাদের দূরে থাকা প্রয়োজন ছিল বলে শুভ বুদ্ধির মানুষরা বলছেন। তারা আরো মনে করেন, ইতিহাস ব্যাখ্যার দায়িত্ব ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ব্যাখ্যার দায়িত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাজনীতিবিদদের, আদালতের নয়।

এখন বিশ্বব্যাপী এই বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে যে, উচ্চ আদালতের রায় সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, যদি সেই সমালোচনা গঠনমূলক এবং একাডেমিক ধরনের হয়। সেই স্পিরিট নিয়ে আমি 'দৈনিক ইনকিলাব' 'দৈনিক সংগ্রাম' 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' প্রভৃতি পত্রিকায় পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছি। কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনকে অনুক্ষণ আলোড়িত করেছে এবং এখনো করছে। সেই প্রশ্নগুলো হলো-

(১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অতীতে উচ্চ আদালতের অনেক বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন, আজো আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। মার্শাল ল'র মতো আরো দু-একটি ঘটনায় অতীতে একাধিক প্রধান বিচারপতি যে রায় দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হিসেবে জনাব খায়রুল হক ও আপিল বিভাগের বিচারপতিদের রায় সেই সব রায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহলে কার জাজমেন্টটি সঠিক বলে গণ্য হবে? বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি আগামীকাল থাকবেন না। সেদিন যারা আসবেন তারা যদি বর্তমান বিচারপতিদের রায়ের সাথে একমত না হয়ে ভিন্ন রায় দেন তাহলে কার কথা তখন সঠিক বলে গণ্য হবে?

www.pathagar.com

(২) পঞ্চম সংশোধনীর রায় মোতাবেক রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো কেউ সংশোধন করতে পারবেন না, এমনকি পার্লামেন্টও নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নাকি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। এগুলো অনন্তকাল অপরিবর্তিত থাকবে বলে যা বলা হলো, সেটি কিন্তু বলেছে সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের পার্লামেন্ট নয়। আগামীতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংবিধান থেকে যদি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সংশোধন করতে হয় তাহলেও কি পার্লামেন্ট সেটি করতে পারবে? পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায় মোতাবেক সেটি তারা পারবেন না। তাহলে পার্লামেন্ট কি জুডিসিয়ারী বা বিচার বিভাগের সাবোর্ডিনেট হয়ে গেলো না? আরো একটি বিষয় এখানে বলা দরকার। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ এখনো বহাল আছে। সুতরাং সেটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে কিনা সেটি ভেবে দেখা দরকার।

(৩) পঞ্চম সংশোধনীর রায়ে কয়েকজন বিখ্যাত বিচারপতির রেফারেন্স টানা হয়েছে। এরা হলেন-পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস মুনির, জাস্টিস কর্নেলিয়াস, জাস্টিস কায়ানি, হামুদুর রহমান, জাস্টিস ইফতেখারসহ আরো অনেকে। দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম এবং সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায়ে যেসব পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে সেগুলোর সাথে পাকিস্তানের ঐ সব নামজাদা বিচারপতি এবং বাংলাদেশের কয়েকজন প্রধান বিচারপতি যথা- জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী, জাস্টিস সাহাবুদ্দিন আহমেদ, জাস্টিস মোস্তফা কামাল, জাস্টিস এটিএম আফজাল প্রমুখের রায়ের মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ 'হাজী জয়নাল আবেদীন বনাম রাষ্ট্র' মামলায় বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী তার রায়ে বলেন, "Badrul Haider Chowdhury sought to extricate the 1975 Martial Law from the clutches of the all pervading doctrine of revolutionary legality and sought to bring it within the purview of doctrine of state necessity and constitutional deviation in the following words: "We have already found that present Martial Law is completely different from that of 1958 or 1969. The Constitution has not been abrogated; only certain part of it has been circumscribed by the Martial Law Proclamation out of necessity. This Martial Law is a mere constitutional deviation and not one of Wellingtonian Style". প্রাক্তন বিচারপতি রুহুল ইসলাম 'সলিমুল্লা বনাম বাংলাদেশ' মামলায় জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল তার গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন, "It is well vetted that Martial Law is not a part of the constitutional scheme of this country. It is an extra constitutional dispensation. It is a temporary measure, a short term arrangement. It meets only an interim need. When it leaves, it usually legalises all past actions for purposes of immunity, with

www.pathagar.com

the tacit acknowledgement that its interference with the constitutional process is an aberration and needs to be condoned. But while leaving, the Martial Law does not leave a trail of disqualification. It is good as long as it lasts. But with its departure it no longer casts a shadow upon the ordinary laws of the land." স্থানাভাবে আর উদাহরণ বাড়াতে চাই না।

দুই : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঠিক ইতিহাস এবং বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর ব্যাপারে উচ্চ আদালতের রায়ে বস্তুনিষ্ঠতা এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পায়নি বলে মনে হয়। মরহুম জিয়াউর রহমান কোনো দিনই মার্শাল ল' জারি করেননি, জারি করেছিলেন খালেদ মোশাররফ। খন্দকার মোশতাক সামরিক শাসন জারি করেছেন, কিন্তু পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেননি এবং সংসদও বহাল রেখেছিলেন। খালেদ মোশাররফ সংসদ ভেঙ্গেছেন এবং সংবিধান স্থগিত করেছেন। অথচ উচ্চ আদালতের রায়ে একটি বারের জন্যও খালেদ মোশাররফকে দৃশ্যপটে আনা হয় নি।

এই ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন আমার মনকে আলোড়িত করেছে। সেই সব আলোড়নের কয়েকটি বুদ বুদ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অবিভক্ত বাংলা ভাগ হয়েছিল পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলা নামে। পূর্ব বাংলা পরে হলো পূর্ব পাকিস্তান এবং তারও পরে হলো বাংলাদেশ। বাংলা ভাগের জন্য সামগ্রিকভাবে দায়ী হলো কংগ্রেস। অথচ এ জন্য নন্দঘোষ ঠাওরানো হয় মুসলিম লীগ এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে। এসব বিষয় হাইলি পলিটিক্যাল এবং ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোকে আমাদের জাতিসত্তার ইতিহাসের অংশ করতে হলে পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে হবে।

বিগত ২১ বছর ধরে রাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন ও সংবিধান এবং সংস্কৃতিসহ অনেক বিষয়ের ওপর লিখে চলেছি। কোনো দিন লেখা ছাপার জন্য কোনো ব্যক্তি বা মহল বিশেষের কাছে ধরনা দেই নি। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' উদ্যোগী হয়ে আমার কয়েকটি লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছে। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। প্রায় চার দশক হলো আমার সুখ-দুঃখের সাথে যিনি জড়িয়ে আছেন, আমার সেই সহধর্মিণী বেগম সুলতানা এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমাকে দীর্ঘদিন ধরেই তাগিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে সামান্যতম হলেও বেগম সুলতানার একটি অবদান রয়েছে।

সবশেষে এই বইটি যদি সত্যের আলোকবর্তিকা বহনে বিন্দুমাত্রও সহায়তা করে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো। আপনারা সুখে থাকুন, ভালো থাকুন।

আল্লাহ হাফেজ

মোবায়েদুর রহমান

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. মাইমুল আহসান খান-এর অভিমত

জনাব মোবায়েদুর রহমান এদেশের একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক। পঞ্চম, সপ্তম ও এয়োদশ সাংবিধানিক সংশোধনী বাতিলের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থটি যে কোন মনোযোগী ও দেশপ্রেমিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবী রাখে। আমাদের দেশে সাংবিধানিক বির্তক বলতে গেলে পুরোটাই রাজনৈকিত ও দলীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। তাই এ বিষয়ে গ্রন্থরচনা করার বিড়ম্বনা নানাবিধ।

সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার অধীনে সংবিধান রচনা এবং এর পরিবর্তনের ক্রমবিকাশের ধারা মূলত একটি আইনী প্রক্রিয়া। এই আইনী প্রক্রিয়ার সর্ব প্রথম বিষয়বস্তু হচ্ছে আইনের বিভিন্ন থিওরী এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিবেচনায় রেখে আইনের ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিষয়াবলীর যথাযথ অনুশীলন ও প্রয়োগ।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সংবিধান তৈরী ও এর সংশোধন প্রক্রিয়ায় জুরিসপ্রুডেন্সিয়াল কোন তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক পদ্ধতির কলাকৌশল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। এ বিবেচনায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের কৃতিত্বে, আনাড়িপনা নাকি নাদানীপনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে তা হলফ করে বলার উপায় নেই । অথচ এ দুঃসাধ্য কাজটিতেই হাত দিয়েছেন স্বনামধন্য সাংবাদিক মোবায়েদুর রহমান।

সাধারণত এই ধরনের বই লেখার কথা কোন আইন বিশেষজ্ঞের; কোন সাংবাদিক কর্তৃক এই ধরনের বিষয়ে বই রচনার সুবিধা অসুবিধা অনেক। প্রথমত বিচারকের আসনে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও যোগ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করার পরই একজন বিচারপতি কর্মজীবনের শেষের দিকে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তাই সাংবিধানিক বিষয়ে প্রধান বিচারপতিগণ কখনই কোন বিতর্কিত রায় ঘোষণা করে জাতিকে বিপদের দিকে ঠেলে দিতে তৎপর থাকেন না বরং অতি সতর্কতার সাথে সাংবিধানিক সকল বিতর্ক এড়িয়েই উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে থাকেন। এক্ষেত্রে বিচারপতি খায়রুল হক এক অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী বিচারপতি।

বিচারপতি খায়রুল হক হয়তো পৃথিবীর ইতিহাসের এমন এক ব্যতিক্রমধর্মী বিচারপতি যিনি প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করার বহু পূর্বেই ২০০৬ সালে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষণা করে একটি বিশেষ ধারার রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে আদালতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সুবিধা দেয়ার অশুভ সাক্ষ্য প্রমাণ সমগ্র জাতির কাছে পরিষ্কার করে তোলেন। এরফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সুবিধাভোগী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের নেক নজরে চলে আসেন। অবশ্য নিন্দুকেরা বলেন, খায়রুল হক ছাত্রজীবন থেকেই উগ্রধারার রাজনীতির কর্মী এবং মনে মগজে একেবারেই একজন সংকীর্ণ স্যাকুলার মানসিকতা সম্পন্ন দলীয় আইনজীবি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে আইনজীবিদের অনেকেই দলীয় রাজনীতি করেন। কিন্তু বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর গণ্ডিবদ্ধ দলীয় মানসিকতা সম্পন্ন বিচারক ও নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ আদলে বিচারিক কাজ পরিচালন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বিচারপতি খায়রুল হক। বিচারপতি খায়রুল হকের বিচারিক কাজে দলীয় মানসিকতার যে বিভীষিকা আমাদের সর্বোচ্চ আদালতে ছড়িয়ে পড়েছে তার একটি প্রামাণ্য দলীল জনপ্রিয় কলামিস্ট মোবায়েদুর রহমানের এই বই।

যেহেতু বিচারপতি খায়রুল হকের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়টি মূলতই একটি নির্জলা রাজনৈতিক ভাষ্যের পরিপূর্ণ দলীল, তাই মোবায়েদুর রহমানকে এজন্য আইনের শাস্ত্রীয় দিকসমূহ নিয়ে তেমন গভীর কোন আলোচনা বা পর্যালোচনা করার দরকার পড়েনি। এটি ছিল লেখকের জন্য বড় সুবিধা। লেখক তাঁর এই সুবিধাজনক অবস্থান থেকেই বইটি রচনা করেছেন। কাজেই এতে আইনী বিশ্লেষণের চেয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজপাঠ্য হয়েছে।

সাংবাদিকের অবস্থান থেকে লেখক বইটিতে দেশের বহু আইনজ্ঞের কথাবার্তার বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ দিয়েছেন। বিচারপতি খায়রুল হক থেকে শুরু করে দেশের প্রথিতযশা বেশ কিছু আইনজীবি, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনের শিক্ষকের উদ্ধৃতিতে বইটি সমৃদ্ধ হবার কথা ছিল। কিন্তু এদের অনেকেরই অন্তসার শূন্য বোলচাল বেশী গুরুত্ব পাওয়ার কারণে লেখকের অভিমতসমূহ অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বহীন থেকে গেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, অন্যরা কে কী টকশোতে বলেছেন বা পত্রিকায় লিখেছেন এসবের দীর্ঘ অবতারণা না করে লেখক সরাসরি নিজের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারতেন। অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে সাংবাদিক মাহমুদুর রহমানকে বলতে গেলে বিনা বিচারেই দীর্ঘ দিন আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হবার ঘটনাটি এদেশের ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিকদের কলমকে মাত্রাতিরিক্ত সাবধানী ভূমিকায় নিয়ে আসে। তাই এখানে মোবায়েদুর রহমান রচিত বইটিকে ঐতিহাসিক এই করুণ ও নির্মম পরিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

সাংবাদিক মোবায়েদুর রহমান তাঁর লেখায় আশংকা প্রকাশ করেছেন, হয়তো এদেশে আর ইসলাম ও মানবাধিকার নিয়ে কথা তোলার কোনই সুযোগ থাকবে না। পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে বিচার করতে গেলে লেখকের অনুমান ও ভবিষ্যতবাণী সঠিক হয়েছে। অথচ লেখক এই কথাগুলো লিখেছেন পঞ্চদশ সংশোধনী সংসদে গৃহীত হওয়ার বহু আগে এটি লেখকের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

লেখক বিচারপতি খায়রুল হক এর সকল রায় ও বক্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রমাণ রেখেছেন বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে। লেখক অপার বিস্ময়ে লক্ষ

www.pathagar.com

করেছেন যে, দীর্ঘদিন ধরেই প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, অন্যান্য প্রভাবশালী মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট মেম্বারগণ দেশের ইসলাম সমর্থিত দল ও মতের মানুষদের নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে চলেছেন। সাংবাদিক হিসাবে তাই তিনি এর একটি সুরাহা বের করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাগাড়ম্বর নির্ভর আমাদের এই রাজনীতির দাবাখেলায় কোন রুচিসম্পন্ন বা ভদ্রোচিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সন্ধান লেখকের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি কখনো আইনমন্ত্রীকে আবার কখনো অন্য কোন সরকারী হোমরা চোমড়াকে বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে তার লেখনীকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

প্রতিটি অধ্যায়ে লেখকের এই প্রচেষ্টায় তাঁর আন্তরিকাতার প্রমাণ মিলে । মুন সিনেমা হলের মালিকানার মামলা কিভাবে শেষ পযর্ন্ত আমাদের সংবিধানের সংশোধনীগুলোকে একের পর এক অবৈধ করে দিতে পারলো, তা যেমন লেখকের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে, অন্যদিকে উদ্ভট এই সংশোধনী কার্যকর হওয়ার পর এদেশে ইসলাম নিয়ে বা গণমানুষের দাবী দাওয়া নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আইনী অধিকার আদৌ থাকবে কি-না তা নিয়ে লেখকের গভীর উদ্বেগ ও সংশয় ফুটে উঠেছে।

লেখক নানা ভাবে সরকার ও ক্ষমতসীন দলের নীতিনির্ধারকদেরকে ইতিহাস থেকে সঠিক শিক্ষা নেয়ার অনুরোধ জানাতে কার্পণ্য করতে চাননি। তাই তিনি পাকিস্তান আমলের বহু ঘটনা প্রবাহকে বাংলাদেশ আমলের আওয়ামী শাসনের ঘটনা সমূহের সাথে তুলনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৪৬ সালের হ্যানকেলসেন প্রণীত 'গ্রুন্ডনর্ম থিওরীর' কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ থিওরী অনুসারে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটে। পাকিস্তানের এই মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না। পাকিস্তানের ঐ মৃত্যু ছিল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দৈউলিয়াপনা এবং পাকিস্তানী সামরিকজান্তাদের উত্থানে ইসলামী বেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যচ্যুতির মৃত্যু।

মুসলিম লীগের জন্ম ও মৃত্যুর সাথে পাকিস্তানের সৃষ্টি ও ধ্বংস অনিবার্যভাবে জড়িত ছিল। বাংলাদেশের ভাগ্যের সাথে আওয়ামী লীগের উত্থান পতনের অনুরূপ সম্পর্ক রয়েছে কিনা, এ বিষয়ে বইটিতে বহু ইঙ্গিত রয়েছে। তাই ১৯৭৫ সালের সামরিক নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন থেকে শুরু করে পুনরায় আওয়ামী লীগের উত্থান নিয়ে বইটিতে চমকপ্রদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। লেখক ফিরে গেছেন ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে আবার ফিরে এসেছেন প্রধান বিচারপতি হিসাবে দেয়া খায়রুল হকের বহু নেক্কারজনক উদ্ধৃতিতে। লেখকের কাছে বোধগম্য হয়নি কিভাবে খায়রুল হককে প্রধান বিচারপতি করা হলো, আর বিচারপতি হয়েই খায়রুল হক কেন একজন দলীয় রাজনীতিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে বিচারপতি খায়রুল হক রুহুল কুদ্দুস বাবু এবং খসরুজ্জামানের মতো ব্যক্তিদেরকে শপথ পড়িয়ে হাইকোর্টে বিচারপতির আসন দিলেন। এ ব্যাপারে লেখক তার বইয়ের ১৭৫ পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

লিখেছেন "শুধু সুপ্রীমকোর্ট বা আদালত প্রাঙ্গণ নয়, বাংলাদেশের ১৬ কোটি লোকের এই বিশাল সমাজটি সুতীব্রভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে"..."বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং রাজনৈতিক লাইন সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। এই বিভাজনে শুধু আইনজীবিরাই নন, মাননীয় বিচারপতিরাও রয়েছেন।"

সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থায় এমনিতেই একধরনের উগ্র দলীয়করণের অস্তিত্ব বিরাজ করে। তবে এই দলীয়উগ্রতা যাতে সকল ভদ্রতা ও মানবিকতার বিপর্যয় ঘটাতে না পারে সেজন্যই থাকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কোন কোন দেশে আবার থাকে সাংবিধানিক আদালত। আমাদের দেশে কোন সাংবিধানিক আদালত নেই। এক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ আদালতই প্রকারান্তরে সাংবিধানিক আদালতের মতো কাজ করতে পারে। প্রত্যেক দেশেই সর্বোচ্চ আদালত বা প্রধান বিচারপতি সাংবিধানিক ব্যাপারগুলোতে বিতর্কে জড়ানো থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে চলে। অথচ বিচারপতি খায়রুল হকের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী অনুসৃত এই সর্বজনীন আইন শাস্ত্রীয় সত্যটিও সামান্যতম মর্যাদা পেলো না। এই দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

যে দেশের প্রধান বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবী করেন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে তার দেয়া রায়ের আলোকেই সংবিধান স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, সেই বিচারপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ছেলের বিয়ের জন্য সাহায্য গ্রহণ নিশ্চয়ই কোন নৈতিক বা আইনী অসামঞ্জস্যমূলক কাজ বলে গণ্য হবে না, এটিই স্বাভাবিক।

অবশ্য লেখক এসব ঘটনাবলীকে কিছুতেই আইনের শাসন হিসাবে মেনে নিতে পারছেন না। মেনে নিতে পারছেন না সংবিধান নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সীমাহীন হেয়ালীপনা এবং বিশেষজ্ঞ বলে কুখ্যাত একপাল বুদ্ধিজীবির বালখিল্যতাকে। চরম আশা-নিরাশার দোলাচলে তীক্ষ্মধী লেখনীর আঁচড়ে লেখক বইটি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তার এই চেষ্টা সফল হোক, দেশ প্রেমিক সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ঠায় দেশের সঠিক স্বার্থ, ঐতিহ্য-অর্জন অটুট থাকুক, সোচ্চার গণমানুষের তীব্রঐক্যতানে লেখকের সকল শংকা হতাশা দূরীভূত হয়ে আশার নবদিগন্তে নতুন সূর্য উদিত হোক সময়ের প্রেক্ষিতে কোটি কোটি মানুষের মতো আমাদেরও এটাই ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

প্রফেসর ড. মাইমুল আহসান খান
সাবেক চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক চেয়ারম্যান, আইন ও শরীয়া বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক ফুলব্রাইট ফেলো, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সাবেক আফগান বিষয়ক কান্ট্রি স্পেশালিস্ট : এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

সূচিপত্র

০১. পঞ্চম সংশোধনী রাজনৈতিক বিষয় : উচ্চ আদালতের বিষয় নয় ১৫

০২. পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে পার্লামেন্ট : সেটি বাতিল করবে কে? ১৯

০৩. উচ্চ আদালতের অবস্থান ও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩

০৪. ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে জঙ্গিবাদ উত্থানের আশঙ্কা ২৮

০৫. আপিল বিভাগের রায় : ধর্মনিরপেতার প্রবেশ : আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রস্থান ৩৩

০৬. ৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন : কতিপয় আইনী প্রশ্ন ৩৭

০৭. মার্কসের রাজনীতি থাকবে, মুহাম্মদ স.-এর রাজনীতি থাকবে না ৪১

০৮. মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ : কিন্তু এরশাদের মার্শাল ল' সম্পর্কে নীরব কেন? ৪৫

০৯. সপ্তম সংশোধনীয় রায়ে আছে অনেক রাজনৈতিক ইস্যু : আছে অনেক প্রশ্ন ৫০

১০. এরশাদের বিচার প্রশ্নে আ'লীগ গোঁফ নামিয়েছে ৫৪

১১. সপ্তম সংশোধনীর রায়ে বাংলা ভাগ : নেহরুই বাংলা ভাগের জন্য দায়ী ৫৯

১২. ইসলামী রাজনীতি এবং সেক্যুলারিজম নিয়ে ভিন্নমত ৬৪

১৩. বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা ৬৭

১৪. সংসদকে পাশ কাটিয়ে সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা কিভাবে? ৭২

১৫. পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : পরবর্তী নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান সংশোধন ৭৭

১৬. ইসলামী দল নিষিদ্ধ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম খারিজের চক্রান্ত ৮২

১৭. কোর্টের কাঁধে বন্দুক রেখে এসব অজনপ্রিয় কাজ কেন? ৮৭

১৮. ৭২-এর কোন্ কোন্ বিধান ফিরে আসবে? ৯১

১৯. রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত হয়ে উচ্চ আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে ৯৬

২০. আ'লীগ রাজনৈতিক এজেন্ডাকে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বিষয় বানাতে চাচ্ছে ১০০

২১. ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে দেশের আদর্শিক ভিত নড়ে যাবে ১০৪

২২. পৃথিবীর অন্তত ৫২টি দেশে খ্রিস্টান ধর্মের নামে একাধিক দল রয়েছে ১০৯

২৩. সংবিধানে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের কোনো স্থান নেই ১১৩

২৪. সংবিধানের ১৪টি সংশোধনের ধারাবাহিক ঘটনা এবং প্রস্তাবিত সংশোধনী কমিটি ১১৭

২৫. পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আ'লীগ ১২১

২৬. আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় এবং অনেক আইনগত প্রশ্ন ১২৭

www.pathagar.com

২৭. মার্শাল ল': পূর্ণাঙ্গ রায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা : পূর্বে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে বৈধতা প্রদান ১৩২

২৮. দৃশ্যপটে মোশতাক ও সায়েম : নেপথ্যে কর্নেল রশীদ ফারুক এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল জামিল ১৩৮

২৯. সপ্তম সংশোধনীর রায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, তাহের হত্যা, দালালদের মুক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ ১৪৪

৩০. ৩ থেকে ৭ নভেম্বর : পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী ১৫১

৩১. মৌলিক কাঠামো : সেদিনের সুপ্রিমকোর্ট এবং আজকের সুপ্রিমকোর্ট : দুই জামানার দুই রায় ১৫৮

৩২. বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র : হাইকোর্টের ঘোষণা : সংসদের আর বলার কিছু নেই ১৬৪

৩৩. স্পর্শকাতর রাজনৈতিক বিষয় এবং উচ্চ আদালত : একদিকে বার সমিতি অন্যদিকে সরকার ১৭০

৩৪. পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যাবর্তন অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনী ও রাষ্ট্রধর্ম বহাল ১৭৫

৩৫. কে সঠিক? চিফ জাস্টিস সাহাবুদ্দিন ও ফজলুল করিম? নাকি চিফ জাস্টিস খায়রুল হক? ১৮১

৩৬. উইকিলিকসে বাংলাদেশের রাজনীতি : হাইকোর্টের রায়ে রাজনৈতিক বিষয় ১৮৭

৩৭. সংবিধান পুনর্মুদ্রণ : দালাল আইনের প্রত্যাবর্তন : দণ্ডিত ব্যক্তি এমপি ও ভোটার হওয়ার অযোগ্য ১৯২

৩৮. রাজনৈতিক বিষয় থেকে হাইকোর্টের সযত্নে দূরে থাকা উচিত ১৯৭

৩৯. ইসলামী রাজনীতি, ধর্মনিরপেতা, জাতীয়তা ও পঞ্চম সংশোধনী বাতিল ২০১

৪০. সুপ্রীম কোর্টে কেয়ারটেকার ২০৫

৪১. সংবিধান সংশোধনের পূর্বাহ্নে কিছু পূর্ব কথা : কিছু প্রসঙ্গ কথা ২০৭

৪২. এবার কেয়ারটেকার সরকার : উচ্চ আদালতে আবার রাজনৈতিক বিষয় ২১৩

৪৩. বাকশাল প্রত্যাবর্তনের অশু পদধ্বনি ২১৭

৪৪. সংবিধান সংশোধন : এক দলীয় শাসন কায়েমের চক্রান্ত ২২২

৪৫. কেয়ারটেকার বাতিল, আ'লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন, সংসদে ফেরার সব পথ রুদ্ধ ২২৭

৪৬. কেয়ারটেকার রায় : প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবে ২৩১

৪৭. ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ হলে খায়রুল হকের নিয়োগ এবং সব রায় অবৈধ ২৩৩

৪৮. সংঘাতের পথে দেশ : প্রয়োজন কঠোর আন্দোলন ২৩৭

www.pathagar.com

১

পঞ্চম সংশোধনী রাজনৈতিক বিষয় : উচ্চ আদালতের বিষয় নয়

অনেকে বলেছেন যে, বাংলাদেশ এক মারাত্মক সাংবিধানিক সংকটের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অন্যরা বলছেন, শুধুমাত্র সাংবিধানিক সংকট নয়, দেশ এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ভয়ঙ্কর গভীর এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে বিচারপতি খায়রুল হক ও ফজলে কবিরের বেঞ্চ কর্তৃক সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়কে কেন্দ্র করে। ঐ রায়টির কার্যকারিতা স্থগিত করেছিল আপিল বিভাগ। কিন্তু বর্তমান সরকার আপিলটি প্রত্যাহারের অন্য আপিল বিভাগে আবেদন করলে ঐ আবেদনটি গৃহীত হয় এবং গত ৩ জানুয়ারি স্থগিতাদেশ প্রত্যাহৃত হয়। আইনমন্ত্রীসহ সরকারি শিবিরের লোকজন বলেছেন যে, স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার ফলে এই রায় বাস্তবায়নের পথে আর কোনো অন্তরায় রইলো না। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শিবিরের ঝানু আইনজীবীরা বলছেন যে, আগামী ১৮ জানুয়ারি লিভ টু আপিলের শুনানি হবে। ঐ লিভ টু আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ রায় বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই। এমন দুইটি মতামতের বাইরে আরো দুইটি মতামত পাওয়া গেছে। ঐ দুইটি মতামত আরো জোরদার এবং যুক্তিসঙ্গত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেণ।

রাজনীতির ফয়সালা আদালতে কেন?

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল এবং বর্তমান বাংলাদেশ আমলের রাজনীতি যারা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তারা বলছেন যে, ৫ম সংশোধনীর প্রশ্নটি শুধুমাত্র আইনগত বিষয় নয়। এটি মূলত একটি রাজনৈতিক বিষয়। সেই রাজনৈতিক বিষয়কে ফয়সালার জন্য আদালতে টেনে আনা উচিত হয়নি। এটি সুরাহা হওয়া উচিত ছিল রাজপথে অথবা সংসদে। রাজপথ বলতে বোঝাচ্ছি আমরা জনমত গঠনের মাধ্যম। সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং। যে ইস্যুটি আদালত ফয়সালা করতে যাচ্ছে সেই ইস্যুটি গণভোটে নিয়ে যাওয়া যেত। অথবা নির্বাচনী ইস্যু করা যেত । ৫ম সংশোধনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচার করার অবাধ স্বাধীনতা থাকত। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসতেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় মোতাবেক ইস্যুটির ফয়সালা করতেন। কিন্তু সেটা না করে বিষয়টি আদালতে গেল কেন? আমাদের জাতীয়তাবাদ কি হবে? বাঙালি জাতীয়তাবাদ নাকি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করবে কে? আদালত? নাকি জনগণ? আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি হবে? সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা? নাকি আল্লাহর প্রতি ঈমান?

www.pathagar.com

সংবিধানে সেক্যুলারিজম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। অনুরূপভাবে সেক্যুলারিজমকে বাদ দিয়ে 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' এই বাক্য প্রতিস্থাপন করেছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশের এই দুটি কালজয়ী রাজনীতিকের রাজনীতি ছিল দুইটি ধারার। সেই দুইটি ধারা আজও বাংলাদেশে রেল লাইনের মতো সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। একটি হলো সেক্যুলারিজম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। আরেকটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। এই দুইটি ধারা কোনোদিন এক মোহনায় এসে মিলবে না। মিলতে পারে না। এমন মৌলিক রাজনৈতিক ইস্যুর ফয়সালা হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগ করবে কিভাবে? আর করবেইবা কেন?

ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয় এই যুক্তিতে যে, তারা ধর্মকে নাকি রাজনীতিতে টেনে আনছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো এই যে, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে যখন নিষিদ্ধ করা হয়, তখন ধর্মদ্রোহী কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রীদেরকে রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়। মরহুম শেখ মুজিবের আমলে প্রণীত ৭২-এর সংবিধানে এই নিষেধাজ্ঞাকে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদী দলগুলো রাজনীতি করার অধিকার পায়। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এই অবিশ্বাস্য কিন্তু স্বৈরতন্ত্রী বিধানের অবসান ঘটে এবং ইসলামী দলগুলোকে রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়। অথচ হাইকোর্টের আলোচ্য রায়ের ফলে ইসলামী দলগুলোর রাজনীতি করার অধিকার পুনর্বার হরণ করা হয়েছে। এত বিশাল একটি রাজনৈতিক ইস্যুর ফয়সালা করবে কে? হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট? নাকি বাংলার ১৫ কোটি জনগণ? সেই ফয়সালার মাধ্যমটাইবা কি? হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের রায়? নাকি সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৯ কোটি বাংলাদেশী ভোটারের রায়?

পার্লামেন্টের প্রস্তাব বনাম হাইকোর্টের রায়

আলোচ্য মামলাটির রায়ের সারাংশ হলো এই যে, সংবিধানে সামরিক শাসনের কোনো বিধান নেই। সুতরাং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে সামরিক শাসনের মাধ্যমে যে সরকার পরিবর্তন করা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ অবৈধ। সেই প্রেসিডেন্ট জিয়ার সামরিক শাসনও অবৈধ। ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যতগুলো সরকার এসেছে সেই সবগুলো সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পদ্ধতি অবৈধ। এদের সমস্ত কার্যকলাপও অবৈধ। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে১৯৭৫ থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত সবগুলো সরকার এবং তাদের কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। তাই ৫ম সংশোধনীও অবৈধ, এই যুক্তিতে হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ ৫ম সংশোধনীকে বাতিল রায় দিয়েছে। এই রায়ের

www.pathagar.com

পাশাপাশি বিচারপতি (অব.) টি এইচ খানের বক্তব্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি বলেন, "পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে শুধু সামরিক শাসনামলকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এ কথা ঠিক নয়। এই সময় বহু সরকারি ফরমান, আদেশ, নিষেধ, নিয়োগ, বরখাস্ত, এমনকি উচ্চ আদালতেরও বহু রায় রয়েছে। পঞ্চম সংশোধনীকে কেন্দ্র করে অন্তত এক ডজন মামলার রায় দিয়েছে আপিল বিভাগ। এসব আদেশ-নিষেধ জাজমেন্টগুলোর কি হবে? পঞ্চম সংশোধনী একটি লেজিসলেটিভ আইন। এটি পার্লামেন্টে পাস হয়েছে। পার্লামেন্টে পাস হওয়া একটি আইন বাতিল করে দেয়ার জুরিসডিকশন হাইকোর্টের নেই। হাইকোর্টের আইন রায় বহাল থাকলে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। পঞ্চম সংশোধনীতে সেক্যুলারিজম বাদ দেয়া হয়েছে। ১৪ কোটি মুসলমানের দেশে যদি মনে করা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা হবে রাষ্ট্রের মূল পলিসি, মানুষ কি সেটা মেনে নিবে?'

তিনি বলেন, 'অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে পঞ্চম সংশোধনীর কিছু কিছু বাতিল এবং কিছু কিছু বিষয় বাঁচিয়ে রাখার এখতিয়ার হাইকোর্টকে কে দিয়েছে? ১৯৭৯ সালে যে জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল তাতে আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। এই নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদ গঠিত হয়েছিল সেই পার্লামেন্ট পঞ্চম সংশোধনীকে বৈধ করেছে। তারা (সরকার) বলছে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেয়া হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলে নাকি ভবিষ্যতে কেউ অবৈধ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না। বন্দুকের নল ওয়ালারা নাকি সমীহ করবে। তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলতে চাই, এ কথা শুধু বোকারাই বলতে পারেন। ওয়ান ইলেভেনের মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে কেউ না কেউ ক্ষমতা দখল করবেই।

আপিল বিভাগের আগের আদেশের কি হবে?

জেনারেল এইচ এম এরশাদ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনয়ন করেন। সেটি ছিল ১৯৮৮ সাল। এই সংশোধনীতেই পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ ঢাকাসহ মফস্বলের ৬টি জেলায় হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলা হয়। এই মামলায় যতদূর মনে পড়ে, অন্যতম বিচারপতি ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। তার বেঞ্চ ৫ম সংশোধনীর সপক্ষে ঐতিহাসিক রায় প্রদান করে। এ সম্পর্কিত রায়ে বলা হয় "১৯৭৫ সাল থেকে এসব মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ সেগুলো চ্যালেঞ্জ করেনি। ফলে জনগণ এসব সংশোধনী গ্রহণ করেছেন এবং এসব সংশোধনী সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।" এই ঐতিহাসিক রায় ছিল আপিল

www.pathagar.com

বিভাগের রায়। এই রায়ের পর পঞ্চম সংশোধনী বাতিল বা পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের নেই। সেদিন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতিসহ ঐ বেঞ্চ পঞ্চম সংশোধনীকে সমুন্নত রেখেছিল। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই দাঁড়ায় যে, সেইদিন সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীকে সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত বলেই মনে করেছিল। আজ সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ সেটিকে বেআইনী বলে বাতিল করে দিচ্ছে। এই বিষয়টি অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বর্তমান বেঞ্চের নিকট থেকে একটি ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করে।

গণভোটের কি কোনো মূল্য নেই?

হাইকোর্টের রায়ের একস্থানে বলা হয়েছে যে, সংবিধানে গণভোটের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যে গণভোট অনুষ্ঠান করেন সেটিও অবৈধ এবং বাতিলযোগ্য। শুধুমাত্র মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াই গণভোট করেননি, গণভোটের নজির এই উপমহাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে আছে। গণভোটে অংশগ্রহণ করেন কয়েক কোটি লোক। তাদের মতামতকে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সামারিলি অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করে দিচ্ছে। এই বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে বিসদৃশ্য মনে হয়। তবুও আমরা কোনো সরাসরি মন্তব্য করছি না। আপিল বিভাগ এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করলে জনগণ উপকৃত হবেন।

মুন সিনেমা হল থেকে সরকার পরিবর্তন

এই মামলাটি দায়ের হয়েছিল মুন সিনেমা হল ফেরত পাওয়ার জন্য। মুন সিনেমা এবং সংলগ্ন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। সামরিক বিধি নম্বর ৭ অনুযায়ী এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে দেয়া হয়েছিল। সেই ৭ নম্বর বিধি আইনসঙ্গত ছিল না বলে আলোচ্য দুই বিচারপতি মনে করেন। সেই যুক্তিতে সম্পত্তি ফেরত দিলে কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে বিচারপতি সায়েম কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর, জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ ইত্যাদি সমস্ত কাজকেই অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। দুইজন নামজাদা আইনজীবী পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একটি মন্তব্য করেছেন। সেটি হলো মুন সিনেমা হলের মামলা বিচার করতে গিয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করার এখতিয়ার তাদের ছিল কিনা?

সোনার বাংলা, ৮ জানুয়ারি ২০১০

www.pathagar.com

২

পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে পার্লামেন্ট : সেটি বাতিল করবে কে?

আজ ১০ জানুয়ারি রোববার। আগামী ১৮ জানুয়ারি সোমবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের ওপর লিভ টু আপিলের শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। কতদিন চলবে এই শুনানি, সেটা কেউ জানে না। শুনানি শেষ হওয়ার পর আপিল বিভাগ এ সম্পর্কে রায় দেবে। সেটিই হবে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সম্পর্কে মামলা-মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। আপিলকারী হলেন বিএনপি'র মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আরো ৩ জন আইনজীবী। খোন্দকার দেলোয়ারের পক্ষে আইনজীবীরা আপিল বিভাগে শুনানিকালে কোন্ যুক্তি পেশ করবেন সেটা তারাই ভাল জানেন। তবে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা এবং অনেক বিখ্যাত আইনজীবীর চেম্বারে এব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিতর্ক শোনা যায়। সেসব আলাপ-আলোচনা ও যুক্তিতর্ক একান্তভাবেই আইনী কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। সেইসব আইনী যুক্তিতর্ক আজকের আলোচনায় উত্থাপনের চেষ্টা করব। তার আগে এই মামলার উৎপত্তি থেকে শুরু করে হাইকোর্টে জনাব খায়রুল হক এবং ফজলে কবিরের বেঞ্চের রায় পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তুলে ধরছি।

১৯৭২ সালে পুরাতন ঢাকার ওয়াইজঘাটে অবস্থিত 'মুন সিনেমা' হলের জমি এবং সিনেমা হল পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং সেই সম্পত্তি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রদান করে। তখন ঐ সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য জমির মালিক মাকসুদ আলম হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। এই সম্পত্তি মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ১৯৭৭ সালে হাইকোর্ট সরকারকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে, ১৯৭৭ সালের ৭নং সামরিক আইন বিধির (মার্শাল ল' রেগুলেশন) বলে হাইকোর্টের ঐ নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে মাকসুদ আলম হাইকোর্টে পুনরায় রিট পিটিশন করেন। কিন্তু সেই রিট আবেদন পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হয়। বেশ কিছুদিন পর ২০০৩ সালে মাকসুদ আলম মার্শাল ল' বিধি নং- ৭ এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন। অবশেষে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চটি শুধুমাত্র ৭নং সামরিক বিধি নয়, সামরিক আইন জারিকেই অবৈধ ঘোষণা করে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দেন। এই ঐতিহাসিক রায়ের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে–

১. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাক কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ, দেশে সামরিক আইন জারি এবং ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট জারিকৃত ফরমান বলে মোশতাক কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল অবৈধ এবং সংবিধান লংঘন। তাই পরবর্তীতে ঐ প্রেসিডেন্টের সমস্ত কার্যকলাপ অবৈধ।

www.pathagar.com

২. রায়ে আরো বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল সংবিধান বহির্ভূত কাজ। সুতরাং সেটি অবৈধ ও বেআইনী। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হিসেবে তার নিয়োগ এবং ১৯৭৫ সালের ৮ ডিসেম্বর একজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (ডিসিএমএলএ) নিয়োগও ছিল সংবিধানের লংঘন, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। ফলে তার পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রমও অবৈধ।

৩. ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তৃতীয় ফরমানবলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটিও ছিল বেআইনী। ফলে পরবর্তীতে সম্পাদিত তাদের যাবতীয় কার্যক্রম ছিল অবৈধ।

৪. বিচারপতি সায়েম কর্তৃক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ এবং তার নিকট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।

৫. ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ যেহেতু ছিল সংবিধান বহির্ভূত এবং অবৈধ তাই পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রেসিডেন্টের সমস্ত কাজ এখতিয়ার বহির্ভূত এবং অবৈধ।

৬. সংবিধানে গণভোটের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যে গণভোট অনুষ্ঠান করেন সেটিও অবৈধ এবং বাতিলযোগ্য।

৭. সংবিধান লংঘন আইনের চোখে একটি গুরুতর অপরাধ এবং চিরদিন অপরাধ হিসেবেই গণ্য হতে থাকবে।

॥ দুই ॥

যখন এই রায় ঘোষিত হয় তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল বিএনপি ও জামায়াতের চারদলীয় জোট। হাইকোর্টের এই রায়ের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিবেচনা করে তৎকালীন সরকার তাৎক্ষণিকভাবে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করেন। সেই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মহামান্য আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ দেন। এরপর অতিক্রান্ত হয় ৩ বছর ৮ মাস। ইত্যবসরে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয় এবং একটি নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে বর্তমান সরকার ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। গত ৩ মে রোববার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত আপিল খারিজ করার জন্য বর্তমান সরকারের তরফ থেকে এটর্নী জেনারেল আবেদন করেন। সরকারের এই আবেদনের পর হাইকোর্টের রায় কার্যকর করা অর্থাৎ পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করার দৃশ্যত আর কোনো অন্তরায় থাকে না। তখন পূর্ববর্তী জোট সরকারের

www.pathagar.com

দায়েরকৃত আপীলে পক্ষ হওয়ার জন্য অর্থাৎ মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আরো তিনজন আইনজীবী আবেদন করেন। ৪ মে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এমএম রুহুল আমিনের নেতৃত্বে গঠিত ফুলবেঞ্চ আলোচ্য রায়ের বিরুদ্ধে নিয়মিত 'লিভ টু আপিল' দাখিল করার জন্য ৪ সপ্তাহের সময় দেন। সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চ আরো নির্দেশ দেন যে, এই ৪ সপ্তাহে হাইকোর্ট রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে।

হাইকোর্টের এই রায়ের ফলেই–

১. সেই সময় জারিকৃত ৭ নম্বর সামরিক আইনবিধি বাতিল হয়।

২. রায়ে বলা হয়, যদি পঞ্চম সংশোধনী বাতিল না হয় তাহলে সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী অফিসাররা ক্ষমতা দখল করার অনুপ্রেরণা পাবে এবং ভবিষ্যতে পুনরায় সামরিক আইন জারির পথ খোলা থাকবে।

৩. হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মূলনীতি অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলে ১৯৭২-এর সংবিধানে সরাসরি ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে রাষ্ট্রের ৪টি মূলনীতিসমূহ অর্থাৎ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। একই সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

॥ তিন ॥

দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কেও রুলিং আসা উচিৎ। প্রথম কথা হলো : আইন প্রণয়ন ও আইন বাতিলের ক্ষমতা কার? পার্লামেন্ট অর্থাৎ জাতীয় সংসদের? নাকি উচ্চ আদালতের? সকলেই জানেন যে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করবে এবং সেই আইনের অধীনে সুপ্রীম কোর্ট তথা বিচার বিভাগ চলবে। তবে কোনো আইনে অস্পষ্টতা বা জটিলতা থাকলে সেই আইনের ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যা দেবে সুপ্রীম কোর্ট। পঞ্চম সংশোধনীও একগুচ্ছ আইন। ১৯৭৯ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। জাতীয় সংসদ ঐ এক গুচ্ছ আইনের অনুমোদন দেয়। তখন এটি পঞ্চম সংশোধনীর নামে সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত হয়ে আছে। আইনের সাধারণ জ্ঞান মতে সংবিধানের এই অংশ অর্থাৎ পঞ্চম সংশোধনী যদি বাতিল করতে হয় তাহলে তো জাতীয় সংসদ এই আইনটিকে অনুমোদন দিয়েছে এবং সংবিধানের অংশে পরিণত করেছে সেই জাতীয় সংসদকেই এই সংশোধনী তথা সংবিধানের এই অংশটি বাতিল করতে হবে। বর্তমানে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের তিন-চতুর্থাংশ

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তারা তো চাইলেই পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করতে পারে। তারা চাইলেই ইচ্ছামত তাদের পয়েন্ট বা আদর্শ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তারা সেই কাজটি করতে যাচ্ছে কেন? পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেয়ার পূর্বে মহামান্য আপিল বিভাগকে আরেকবার ভেবে দেখতে হবে যে, যেখানে জাতীয় সংসদ পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে, সেখানে তারা অর্থাৎ মহামান্য উচ্চ আদালত সেই কাজটি করতে পারেন কিনা? এটি কি তাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? নাকি এটি তাদের এখতিয়ার বহির্ভূত?

দ্বিতীয় কথা হলো, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধুমাত্র সামরিক আইনবলেই প্রেসিডেন্ট হননি, পরবর্তীতে গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তার প্রেসিডেন্ট হওয়াকে অনুমোদন তথা বৈধতা দান করেছে। সংবিধানে গণভোটের কোনো বিধান নেই এই যুক্তিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ শহীদ জিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়াকে খারিজ করে দিয়েছেন। জিয়ার শাসনামল যদি অবৈধ হয় তাহলে বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকারের অংশীদার এরশাদের সামরিক শাসন কিভাবে বৈধ হয়? মুন সিনেমা হলের মালিকানা ফেরত দেয়ার মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ ৭ নম্বর সামরিক আইন বিধিকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সামরিক আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে গিয়ে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। মুন সিনেমা হল ফেরত দেয়ার ইস্যুকে কেন্দ্র করে মোশতাক থেকে জিয়া পর্যন্ত যদি অবৈধ হতে পারেন তাহলে ঐ রায় জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন পর্যন্ত বিস্তৃত হলো না কেন?

আরো আইনী প্রশ্ন রয়েছে। হাইকোর্টের ঐ রায়ে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯-এর ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে অনেক মন্দ কাজ হয়েছে, আবার অনেক ভাল কাজও হয়েছে। মন্দ কাজগুলো বাতিল হবে আর ভাল কাজগুলো বহাল থাকবে। ঐ ভাল কাজের আওতায় ৪র্থ সংশোধনী বাতিল রয়েছে। তাই ঐ বাতিলের কাজটি বাতিলই থাকবে। অর্থাৎ ৪র্থ সংশোধনী পুনরুজ্জীবিত হবে না। এভাবে একই আইনের কিছু অংশ ভাল আর কিছু অংশ খারাপ। এভাবে কি কোনো রায় হয়? এভাবে রায়টি বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিচারপতি টিএইচ খান।

সব কথার শেষ কথা হলো, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের বিষয়টি একান্তই রাজনৈতিক। তেমন একটি রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত দিয়ে উচ্চ আদালত নিজেদের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে ফেলছেন কিনা সেটিও ভেবে দেখা দরকার।

(১০/০১/২০১০)

www.pathagar.com

৩

উচ্চ আদালতের অবস্থান ও সংবিধানের অনুচ্ছেদ

ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদের বক্তব্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন সেটা আমি টেলিভিশনে শুনেছি। কয়েকটি পত্রিকায় তার বক্তব্য সঠিকভাবে এসেছে। আর কয়েকটি পত্রিকায় ঠিক সেইভাবে আসেনি, যেভাবে তিনি বলেছেন। ইসলামী দলসমূহ নিষিদ্ধ করা বা হওয়ার ব্যাপারে বিএনপির কোনো বক্তব্য এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। তবে ইসলামী দলগুলো এর প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছে এবং ইতোমধ্যেই কয়েকটি সভা-সমাবেশ ও মিটিং-মিছিল করেছে। তারা আরো বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। এসব কারণে এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, ইসলামী দলসমূহ বাতিল হওয়ার প্রসঙ্গটি কিভাবে এলো এবং কোত্থেকে এলো?

গত ৩ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সরকারের তরফ থেকে এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম জানান যে, সরকার পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত আপিলের মামলাটি চালাতে ইচ্ছুক নয়। ইতঃপূর্বে এই মামলায় লিভ টু আপিল মঞ্জুরের সমন আপিলকারী হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের আবেদন করেছিলেন। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট ৪ সপ্তাহের জন্য সেই স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। এখন যেহেতু সরকার মামলাটি চালাতে আদৌ আগ্রহী নয় এবং যেহেতু হাইকোর্টের রায়ে সরকারের চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটেছে, তাই সরকার ঐ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করছে। সরকারের আবেদন আপিল বিভাগ মঞ্জুর করেন এবং রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার করেন। স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ বলেন, যেহেতু আপিল বিভাগ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে তাই এখন হাইকোর্টের রায়টিই বহাল রইল। তিনি আরো বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও যদি হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন তাহলেও সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' উঠে যাবে না। এছাড়া, রাষ্ট্রধর্মও থেকে যাবে। কারণ পঞ্চম সংশোধনীর ব্যাপ্তি হল ১৯৭৫ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু যে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে সেই অষ্টম সংশোধনী জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। সেটি পঞ্চম সংশোধনীর আওতার বাইরে বলে রাষ্ট্রধর্ম থেকে যাবে। তার মতে, পঞ্চম সংশোধনীতে

www.pathagar.com

সংবিধানের যে 'প্রিয়েম্বল' বা প্রস্তাবনা রয়েছে সেই প্রস্তাবনার মূল অংশটি হাইকোর্টের রায়ে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো বাতিল করা হয়নি। ফলে ঐ শব্দগুলো থেকে যাবে। তিনি বলেন, সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের হাইকোর্টের রায় যদি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও বহাল রাখে তাহলে কি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, সংবিধান তো তাই বলে। এই হল পঞ্চম সংশোধনী এবং সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আইনমন্ত্রীর মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ। তার মন্তব্যের পর ইসলামী দলগুলো সভা-সমিতি এবং মিটিং-মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে।

॥ দুই ॥

ওপরে যে ঘটনাপঞ্জী দেয়া হল তার আলোকে প্রকৃত চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ নিজ থেকে বলেননি যে, তার সরকার ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ করবে; বরং চূড়ান্ত পরিণামে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে সংবিধান মোতাবেক ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ জন্য পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে আইন বা সংবিধানের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় সেটা এখন দেখা যাক–

১. একথা সত্য যে, সংবিধানে প্রস্তাবনার মাথার উপর লেখা আছে ৩টি শব্দ, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' এখন এই ৩টি শব্দ প্রস্তাবনার অংশ, নাকি প্রস্তাবনার বাইরে, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদি প্রস্তাবনার বডি বা অংশের বাইরে হয় তাহলে সেটি বিলুপ্ত হবে না। যদি প্রস্তাবনার অংশ হয় তাহলে বিলুপ্ত হবে।

২. একথা ঠিক যে, পঞ্চম সংশোধনী তৎকালীন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় ১৯৭৯ সালে। অষ্টম সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৮৮ সালে। অর্থাৎ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদনের ৯ বছর পর। আইনমন্ত্রী বলেছেন যে, অষ্টম সংশোধনী সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ে কিছু বলা হয়নি। তাই অষ্টম সংশোধনী অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্ম বহাল থাকবে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ খন্দকার মোশতাকের সামরিক শাসন, বিচারপতি সায়েমের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ এবং পরে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা জিয়াউর রহমানের কাছে হস্তান্তর, এগুলোর কোনোটার বিরুদ্ধেই কোনো ব্যক্তি মামলা করেননি। মামলাটি হয়েছিল 'মুন সিনেমা' হলকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি

www.pathagar.com

ঘোষণার বিরুদ্ধে এবং সেই সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার দাবিতে। হাইকোর্টের আলোচ্য বেঞ্চ সমগ্র পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেন এবং ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়, অর্থাৎ এই ৩ বছর ৭ মাস ২৩ দিন সময়ের মধ্যে যতগুলো সরকার এসেছে, তার সবগুলোই অবৈধ এবং বাতিল করেছেন।

৩. সংবিধানে সামরিক আইনের কোনো প্রভিশন নেই, তাই খন্দকার মোশতাক ও জিয়ার সামরিক সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঐ রায়ে আরো বলা হয়েছে যে, সংবিধানে গণভোটের কোনো প্রভিশন নেই। তাই গণভোটের মাধ্যমে মরহুম জিয়াউর রহমানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকে বৈধ করার প্রচেষ্টা সংবিধান বহির্ভূত বলে হাইকোর্টের ঐ রায়ে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিচারপতি টিএইচ খান বলেন যে, সংবিধানে সামরিক আইনের বিধান নেই। কিন্তু তারপরেও তো জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে অপসারণ করা হয়, জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয় এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। মরহুম জিয়ার মার্শাল ল'র সময়েও পার্লামেন্ট বাতিল এবং সংবিধান স্থগিত করা হয়। মরহুম জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পূর্বসুরি ছিলেন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় বলে তাদের শাসনামলকে অবৈধ বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাসদ, ন্যাপ, বামফ্রন্ট, সাম্যবাদী দল ও ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক লীগসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত এই জাতীয় সংসদ ২ মাস পর অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে পঞ্চম সংশোধনী র‍্যাটিফাই করে। ঐ পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমগ্র সংশোধনী বা এর কোনো অংশ বিশেষ বিচার বিভাগে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। বিচারপতি টিএইচ খানের বক্তব্য অনুযায়ী, এভাবে পঞ্চম সংশোধনী লেজিসলেটিভ আইনে পরিণত হয়েছে। তার মতে এটি বাতিলের অধিকার বা এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টের নেই।

॥ তিন ॥

সংসদীয় সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মন্তব্যের হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ, "একদিক দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান অদ্বিতীয়। কারণ এই সংবিধানে জাতীয় সংসদকে সংবিধান সংশোধনের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেটি দ্ব্যর্থহীন এবং নিরঙ্কুশ। ১৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা বাতিল

www.pathagar.com

করে পার্লামেন্টের যে কোনো প্রস্তাব বা আইনের মাধ্যমে সংবিধানের যেকোনো অনুচ্ছেদের সংশোধন করা যায়। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সংবিধান সংশোধনের কোনো প্রস্তাব অনুমোদন করলে ৭ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্টকে ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হবে। প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাভের পর সেটি আইনে পরিণত হবে।" সংবিধানের এই পদ্ধতি মেনেই পঞ্চম সংশোধনী সাংবিধানিক আইনে পরিণত হয়েছে। বিচারপতি টিএইচ খান প্রশ্ন করেছেন যে, এমন একটি সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন বা বাতিলের ক্ষমতা হাইকোর্টের রয়েছে কিনা।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী আমাকে বলেন যে, জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারি করার পর প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে দেশে পুনর্বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনি সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে বিচার করলে এরশাদের ৯ বছরের শাসন অবৈধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করে ১৯৯০ সালের শেষ ভাগ অর্থাৎ এই ১৫ বছরের শাসন উচ্চ আদালতের রায়ে অবৈধ হোক আর না হোক, বাস্তবের নিরিখে ঐ ১৫ বছরের শাসনকাল, সরকারসমূহের কার্যাবলী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত চুক্তি, সংসদে পাস করা বিল আইন ইত্যাদি কি বাতিল করা সম্ভব?

॥ চার ॥

জেনারেল এইচ এম এরশাদ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনয়ন করেন। সেটি ছিল ১৯৮৮ সাল। এই সংশোধনীতেই পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ ঢাকাসহ মফস্বলের ৬টি জেলায় হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে মামলা হয়। এই মামলার বেঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। এ সম্পর্কিত রায়ে বলা হয়, ১৯৭৫ সাল থেকে এসব মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ সেগুলো চ্যালেঞ্জ করেনি। ফলে জনগণ এসব সংশোধনী গ্রহণ করেছেন এবং এসব সংশোধনী সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক রায় ছিল আপিল বিভাগের রায়। এই রায়ের পর পঞ্চম সংশোধনী বাতিল বা পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা বা এখতিয়ার হাইকোর্ট বিভাগের রয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও রুলিং প্রয়োজন। সেদিন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতিসহ ঐ বেঞ্চ সংশোধনীকে সমুন্নত রেখেছিল। এর অর্থ নিশ্চয়ই এই দাঁড়ায় যে, সেদিন সুপ্রিম

www.pathagar.com

কোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীকে সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত বলেই মনে করেছিল। আজ সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ সেটিকে বেআইনী বলে বাতিল করে দিচ্ছে। এই বিষয়টি অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বর্তমান বেঞ্চের নিকট থেকে একটি ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করে।

বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল এবং বর্তমানে বাংলাদেশ আমলের রাজনীতি যারা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তারা বলছেন যে, ৫ম সংশোধনীর প্রশ্নটি শুধু আইনগত বিষয় নয়, এটি মূলত একটি রাজনৈতিক বিষয়। সেই রাজনৈতিক বিষয়কে ফয়সালার জন্য আদালতে টেনে আনা উচিত হয়নি। এর সুরাহা হওয়া উচিত ছিল রাজপথে বা সংসদে। রাজপথ বলতে বোঝাচ্ছি আমরা জনমত গঠনের মাধ্যম; সভা-সমিতি, মিছিল মিটিং। যে ইস্যুটি আদালত ফয়সালা করতে যাচ্ছে সেই ইস্যুটি গণভোটে নিয়ে যাওয়া যেত। অথবা নির্বাচনী ইস্যু করা যেত। ৫ম সংশোধনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচার করার অবাধ স্বাধীনতা থাকত। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসতেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রায় মোতাবেক ইস্যুটির ফয়সালা করতেন। কিন্তু সেটা না করে বিষয়টি আদালতে গেল কেন? আমাদের জাতীয়তাবাদ কি হবে? বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ? নাকি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? এই প্রশ্নের মীমাংসা করবে কে? আদালত? নাকি জনগণ? আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি হবে? সেক্যুলারিজম না ধর্মনিরপেক্ষতা? নাকি আল্লাহর প্রতি ঈমান? বাংলাদেশের দুই কালজয়ী রাজনীতিকের রাজনীতি ছিল দু'টি ধারায়। সেই দু'টি ধারা আজও বাংলাদেশে রেল লাইনের মত সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে। একটি হল সেক্যুলারিজম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। আরেকটি হল আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনীতি। এই দুইটি ধারা কোনোদিন এক মোহনায় এসে মিলবে না, মিলতে পারে না। এমন মৌলিক রাজনৈতিক ইস্যুর ফয়সালা হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগ করবে কিভাবে? আর করবেইবা কেন? (১২/০১/২০১০)

www.pathagar.com

৪

ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে জঙ্গিবাদ উত্থানের আশঙ্কা

আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদের একটি মন্তব্যের পর সারাদেশের আলেম-ওলামারা ইতোমধ্যেই মাঠে নেমেছেন। প্রতিদিনই তাদের কোনো না কোনো কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। কোনোদিন মানববন্ধন, কোনো দিন সভা সমিতি, আবার কোনো দিন মিছিল মিটিং করছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন, পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন সুপ্রিমকোর্ট যদি সেটি বহাল রাখেন তাহলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তার মতে, সংবিধানে এমন অনুচ্ছেদই রয়েছে। আইনমন্ত্রীর এই উক্তির পর দেশের ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ ইতোমধ্যেই রাজপথে নেমে এসেছে। তারা এই মর্মে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে যে, সরকার যদি সত্যিই ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করে তাহলে সেটি প্রতিহত করার জন্য এদেশের ওলামা-মাশায়েখ এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবে। বিগত এক বছর বাংলাদেশের রাজনীতি একটি শান্তিপূর্ণ ও নিস্তরঙ্গ পরিবেশে চলছিল। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়নি। কিন্তু ইসলামী দলগুলো ধীরে ধীরে মাঠে নামছে এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। উচ্চ আদালত তাদের রায়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেনি। সামরিক সরকারের কার্যাবলীকে বৈধতা দেয়ার জন্য পঞ্চম সংশোধনী পাস করা হয়েছে– এই কারণে ঐ সংশোধনীটি বাতিল করেছে। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ের পর ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, সেটি হবে সরকারের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট অবগত থাকেন না, আদালত কোনো মামলার আইনী দিক চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি রায় দেন। সেই বিচারের সাথে রাজনৈতিক ইস্যু সংশ্লিষ্ট কিনা সেটি সম্ভবত তারা ভেবে দেখেন না। কিন্তু তার রাজনৈতিক ধকল সামলাতে হয় রাজনৈতিক সরকারকে। মালয়েশিয়ার অতি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই দেশে চলতি মাসের শুরুতে মালয়েশিয়ার হাইকোর্ট ইংরেজি 'গডের' অনুবাদ হিসেবে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহারের পক্ষে রায় দেন। মালয়েশিয়ার ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের পত্রিকা 'হেরালডের' মালয় ভাষা সংস্করণে 'গডের' পরিবর্তে 'আল্লাহ' শব্দের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় এই রায়ে। মালয়েশিয়ার হাইকোর্ট তো তাদের রায় দিয়েই খালাস। এই রায়ের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার মুসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের বিক্ষোভ ভয়াবহ রূপ নেয়। সর্বশেষ খবর মোতাবেক এ পর্যন্ত ১১টি চার্চ অর্থাৎ খ্রিস্টান গীর্জায় অগ্নি বোমা নিক্ষেপ করে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ক্ষুব্ধ মুসলমানরা একাধিক গীর্জার নিচতলায় সহিংসতা চালায়। কুয়ালালামপুরের অনেকগুলো খ্রিস্টান গীর্জায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে যখন সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে তখন সরকার হাইকোর্টকে বলে, তাদের এই রায়ের ফলে মালয়েশিয়ায় জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। সরকারের এই বক্তব্যের পর হাইকোর্ট তাদের রায় স্থগিত রাখে। রায়টি স্থগিত রাখার পর মালয়েশিয়ায় সহিংসতা সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি

মালয়েশিয়ার এই ঘটনা বাংলাদেশের আইন ও নির্বাহী বিভাগের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সেই রায়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। রায়ের বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। তবে আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের ফলে এমন গুঞ্জন চারধারে শোনা যাচ্ছে যে, আপিল বিভাগও হয়তো হাইকোর্টের রায়টিই বহাল রাখতে পারে। এখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয় কোর্ট-কাছারির নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে না, এমন অভিযোগ হরহামেশাই পাওয়া যায়। তাই রাজনৈতিক পর্যায়ে অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগে বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে হবে। সেই রাস্তাও হাইকোর্টের আলোচ্য রায়েই খুলে দেয়া হয়েছে। রায়ের একস্থানে বলা হয়েছে– 'Although govt. activities between August 15, 1975 And April 9, 1979 had been declared illegal, the history cannot be altered. Many of these illegal acts were done in public interest'. From this perspective, the Court 'condones' some of these actions that could have been done in line with the constitution' অর্থাৎ "যদি আলোচ্য সময়ে সরকারের কর্মকাণ্ড ছিল অবৈধ, তৎসত্ত্বেও ইতিহাস বদলানো যাবে না। এসব অবৈধ কাজের অনেকগুলো করা হয়েছিল জনস্বার্থে। এই নিরিখে কোর্ট এসব কাজের মধ্যে সেগুলোকে ক্ষমা করে দিচ্ছে যে কাজগুলো সংবিধান অনুযায়ী করা যেত।" ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে রাজনীতি করার অধিকার প্রদান তেমনই একটি ভাল কাজ হিসেবে হাইকোর্টের রায়ের এই অংশের আওতায় আনা যেতে পারে। বর্তমানে এই বিষয়ে যে বিক্ষোভ এবং মিছিল চলছে তার টার্গেট কিন্তু কোনোক্রমেই উচ্চ আদালত নয়। বরং উচ্চ আদালতের রায়ে সরকার একটি অবাঞ্ছিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। মালয়েশিয়ায় সরকার যেভাবে সহিংসতা ও বিক্ষোভ সামাল দিয়েছে, বাংলাদেশ সরকারও সে পথে সামাল দিতে পারে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন উঠবে-সংবিধানের কোনো কোনো অনুচ্ছেদের পরিবর্তনকে ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি। সেগুলো নিয়ে উৎপত্তি হতে পারে গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাত।

www.pathagar.com

ক্ষমার আওতার বাইরে যেসব অনুচ্ছেদ

যেসব অনুচ্ছেদের পরিবর্তনকে হাইকোর্টের উক্ত রায়ে ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি, সেগুলো হলো- মূল সংবিধানের ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ (২) গণতন্ত্র (৩) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (৪) ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নের ৪টি পন্থা (৫) পররাষ্ট্রনীতির দিক-নির্দেশনা (৬) ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা এবং (৭) সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি। এসব ধারা যদি সমুন্নত থাকে তাহলে সংবিধানে 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ বাতিল হবে, ইসলামী উম্মাহর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ধারা থাকবে না, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসবে, ইসলামী দল নিষিদ্ধ হবে এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশের রাজনীতিতে বর্তমানে দু'টি ধারা বহমান। দেশের ১৫ কোটি মানুষও এই দু'টি ধারার রাজনীতিতে বিভক্ত। এখন উচ্চ আদালতের রায়ে একটি ধারার রাজনীতি যদি অবৈধ এবং নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটি কতদূর গণতান্ত্রিক হবে সেটি গভীরভাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিন বদলের রাজনীতির কথা বলছেন। তিনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের কথা বলছেন। তার এসব আহ্বানের বিরোধিতা কেউ করে না। এমনকি বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী দলগুলোও তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু আদালতের রায় অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর করতে গেলে সাংঘর্ষিক রাজনীতি ফিরে আসে। সবচেয়ে বড় আঘাত আসে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর। যদি ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়,তাহলে পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নিতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের দ্বিতীয় চিন্তা করা উচিত।

ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে

বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষ মুসলমান। সেই দেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে সেটি কল্পনাও করা যায় না। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল থাকলেই যে দেশটি সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবে এমন চিন্তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পাঠকদের সানুগ্রহ অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বর্তমানে জার্মানীর যিনি চ্যান্সেলর অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট তার নাম এঞ্জেলা মার্কেল। এই মহিলা রাজনীতিবিদ জার্মানীর যে রাজনৈতিক দলের প্রধান সেই দলটির নাম 'ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন'। বিগত ১০ বছর ধরে তিনি এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জার্মানীর আরেকটি বড় দলের নাম 'ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন'। এই দলটির সাথে শাসক দলের মোর্চা বা ঐক্যফ্রন্ট হয়েছিল। কানাডার একটি বড় রাজনৈতিক দলের নাম 'ক্রিশ্চিয়ান হেরিটেজ পার্টি অব কানাডা'। একই নামে রয়েছে 'ক্রিশ্চিয়ান হেরিটেজ পার্টি অব নিউজিল্যান্ড'। নিউজিল্যান্ডের আরো দু'টি রাজনৈতিক দলের নাম 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টি নিউজিল্যান্ড' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশন অব নিউজিল্যান্ড'। ইউরোপ এবং আমেরিকায় এ ধরনের অন্তত ৫২টি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের তালিকা আমার কাছে আছে, যেগুলো খ্রিস্টান ধর্মের নাম যুক্ত এবং খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক। এসব দেশকে বলা হয় সেক্যুলারিজমের মডেল। অথচ সেসব দেশে তো এসব ধর্মীয় নামযুক্ত এবং ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ নয়। বরং তারা দাপটের সাথে রাজনীতি করছে এবং জার্মানী ও নিউজিল্যান্ডের মত অগ্রসর দেশে ক্ষমতায়ও যাচ্ছে।

সেক্যুলার স্টেটে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের আধিক্য

অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামরিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অগ্রসর দেশ হলো আমেরিকা। দেশে দেশে তারা তথাকথিত ধর্মীয় জঙ্গীবাদকে ঠেঙ্গিয়ে বেড়ায়। অথচ সেই তথাকথিত সেক্যুলার দেশটির মুদ্রায় রয়েছে এই কয়টি শব্দ IN GOD WE TRUST অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা বা কাগজী নোটে কি লেখা আছে যে, আল্লাহর প্রতি আমাদের ঈমান আছে? ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম লাইন GOD SAVE THE QUEEN অর্থাৎ, 'ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন।' রাণী এখানে রাষ্ট্রের প্রতীক। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে কি এ কথা আছে যে 'আল্লাহ প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করুন?' অথবা 'আল্লাহ বাংলাদেশকে হেফাযত করুন'? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তার মন্ত্রীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কি কুরআন শরীফ ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেন? সেক্যুলার রাষ্ট্র হয়েও তাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম পালনের এত আধিক্য। তারপরেও ওই সব দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ নয়। তাহলে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে কেন?

ধর্মনিরপেক্ষতার রোল মডেল ভারত

ভারতের জনসংখ্যা ১১০ কোটি। এজন্য ভারতকে বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং সেক্যুলারিজমের রোল মডেল। সেই ভারতের বোম্বে অন্যতম অগ্রসর প্রদেশ বা রাজ্য এবং আধুনিক মহানগরী। অথচ সেই বোম্বের নাম বদলে রাখা হয়েছে 'মুম্বাই'। মুম্বাই হিন্দু ধর্মের এক শ্রদ্ধেয়া দেবী। এসব দেব-দেবীর নামে বিশাল ভারতে রয়েছে অসংখ্য নগর ও বন্দর। ভারতের এক বিখ্যাত বাংলা ছবির নাম 'মরুতীর্থ হিংলাজ।' 'হিংলাজ' তাদের আরেকটি দেবী। এসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করলে এই সংবাদ ভাষ্যের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। সেই ভারত নামে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও কাজে চরম সাম্প্রদায়িক। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত সেখানে ১ হাজার বারেরও বেশি মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। মুসলমানদের ঘাতক হিসেবে নরেন্দ্রমোদীর নামটি সারা উপমহাদেশে মশহুর হয়ে আছে। গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ১ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার কাহিনী কেউ ভুলে যায়নি। বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গা হয়েছিল, সেই দাঙ্গায় ১৮শ' মুসলমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। 'শিব' হিন্দুদের প্রভু। ইংরেজিতে 'লডশিব'। বাংলাদেশে রয়েছে 'আল্লাহর দল'। সেক্যুলার

www.pathagar.com

ভারতে রয়েছে 'শিব সেনা'। রয়েছে 'মুসলিম লীগ'। ধর্মভিত্তিক দল বা সাম্প্রদায়িক দল, সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এসব দলকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। অথচ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কথা শোনা যায়। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৮৮ শতাংশই মুসলমান। ধর্ম এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত। তাই রিকশা, বেবিট্যাক্সি প্রভৃতির পেছনে উৎকীর্ণ থাকে এই কথাগুলো- 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান', 'নামায কায়েম করুন' ইত্যাদি। সে দেশে যদি ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আশঙ্কা করা হয় যে, তাদের বিপুল সংখ্যক কর্মী এবং সমর্থক চলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ডে। মাথাচাড়া দেবে জঙ্গীবাদ। আলেম-ওলামাদের একটি অংশ এখনও এই সরকারকে সমর্থন করে যাচ্ছে। কিন্তু ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে তাদের কেউ আর এই সরকারের পাশে থাকবে না।

আলেম-ওলামারাই মোকাবেলা করছেন জঙ্গীবাদ

সাম্প্রতিক অতীতে দেশে যে জঙ্গীবাদী প্রবণতা দেখা দেয়, সেটি মোকাবেলা করছেন দেশের রাজনৈতিক শক্তি এবং আলেম-ওলামাগণ। ইসলামের নামে কয়েকটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছিল। এ দেশের আলেম সমাজ সেটি মোকাবেলার জন্য ছড়িয়ে পড়েন সারাদেশ। মসজিদে মসজিদে ইমাম সাহেবরা বয়ান দেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই। অস্ত্র দিয়ে জঙ্গীবাদ থামানো যায় না। তাহলে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আমেরিকা জঙ্গীবাদ দমন করতে সক্ষম হত ইরাক এবং আফগানিস্তানে। সাড়ে ৭ লাখ জনবলসমৃদ্ধ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সে দেশে নির্মূল করতে পারেনি ইসলামী জঙ্গীবাদকে। পাকিস্তান সরকার এখন পর্যন্ত আলেম-ওলামাদের সাহায্য নেয়নি বলে সেই দেশে জঙ্গী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ওদের থেকে শিক্ষা নিন

বাংলাদেশে আজ ক্ষমতায় বসে যে ২/১ জন মন্ত্রী ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে হঠকারী বক্তব্য দিচ্ছেন, তাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে মালয়েশিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে। যে কয়েকটি সাংবিধানিক অনুচ্ছেদের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর বলে যদি বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়– তাহলে তার ভয়াবহ ও বিষময় প্রতিক্রিয়া কিন্তু সামলাতে হবে সরকারকে, আদালতকে নয়। সেই গণঅসন্তোষ সামাল দিতে হবে রাজনৈতিক সরকারকেই। সুতরাং আইনী সমস্যাগুলো রাজনৈতিকভাবে কোন পথে সমাধান করা যায়, সেটি নিয়ে এখন সরকারকে ভাবতে হবে। –(দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জানুয়ারি ২০১০)

www.pathagar.com

৫

আপিল বিভাগের রায় : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবেশ আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রস্থান

অবশেষে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়ে গেল। গত মঙ্গলবার ৫ই ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ লিভ আপিল খারিজ করে দিয়েছেন। আপিল বিভাগের ৭ বিচারপতির মধ্যে ৬ জন বিচারপতি সমন্বয়ে এই বেঞ্চটি গঠিত হয়। অপর বিচারপতি এই বেঞ্চে ছিলেন না। তিনি জনাব খায়রুল হক। জনাব খায়রুল হক এবং অপর একজন বিচারপতি যখন হাইকোর্টে ছিলেন তখন তাদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে খায়রুল হককে প্রমোশন দিয়ে আপিল বিভাগে আনা হয়। যেহেতু তিনি নিজেই এই রায়টি দিয়েছিলেন তাই আপিল বিভাগের বেঞ্চে সঙ্গত কারণেই তিনি অন্তর্ভুক্ত হননি। গত মঙ্গলবার সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ যে রায়টি দিয়েছেন সেটি প্রচার মাধ্যমের বর্ণনা মতে অতি সংক্ষিপ্ত। বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং অপর ৩ জন আইনজীবী হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যে লিভ টু আপিল দায়ের করেছিলেন সেটি খারিজ হয়ে গেছে। খারিজ করার সাথে সাথে হাইকোর্টের রায়ের কিছু সংশোধনী এবং কিছু পর্যবেক্ষণও জুড়ে দেয়া হয়েছে।

রায় সম্পর্কে দুই পক্ষের দুই রকম প্রতিক্রিয়া

আপিল খারিজের সাথে সাথে সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণ ইতিমধ্যেই লেখা হয়েছে, নাকি লেখা হবে, সে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। আপিলকারীদের পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেছেন যে, শুনানির সময় তারা যে যুক্তি দিয়েছেন সেই সব যুক্তির কিছু কিছু অংশ হয়তো সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণে বিধৃত থাকবে। তাই সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে ঐ রায়ে। এটা অবশ্য মওদুদের আশাবাদ। কারণ তিনি বললেন যে, তাদের যুক্তির কিছু অংশ থাকবে বলে তিনি মনে করেন। আপিলকারী পক্ষের অপর আইনজীবী বিচারপতি (অব.) টি এইচ খান বলেন যে, যদি আপিলটি মঞ্জুর হতো তাহলে সুপ্রীম কোর্টকে সরকার বন্ধু বলে ভাবতো না। কিন্তু উচ্চ আদালত সরকারের অনুগত এবং মিত্র থাকতে চায়। সে জন্যই তারা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে নি। তবে হাইকোর্টের রায়ে সুপ্রীম কোর্ট (আপিল বিভাগ) কি কি সংশোধনী আনলেন সেটি 'আল্লাহ' জানেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে এ ব্যাপারে সরকার পক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ হাইকোর্টের রায় এবং আপিল বিভাগের খারিজ সিদ্ধান্তকে 'মাইলফলক' বলে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, সুপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে ৭২-এর শাসনতন্ত্রের

www.pathagar.com

মূলনীতিসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ৭২-এর সংবিধানের ভিত্তি হলো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা। এটর্নী জেনারেল এডভোকেট মাহবুবে আলম বলেন, আপিল বিভাগের রায়ে হাইকোর্ট বিভাগের রায় সামগ্রিকভাবে বহাল থাকলো। পর্যবেক্ষণে যেটা সন্নিবেশিত হবে সেটি হবে একটি দিকনির্দেশনা। ভবিষ্যতে দেশে যেন আর সামরিক শাসন আসতে না পারে সেই দিকনির্দেশনাই ঐ পর্যবেক্ষণে থাকবে বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে আইনমন্ত্রীর আরেকটি মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ৭২-এর মূলনীতিসমূহ কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে ব্যাপারে আইন কমিশনের সাথে পরামর্শ করা হবে। আইন কমিশনের মতামতের পর হাইকোর্ট তথা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনমন্ত্রী এবং এটর্নী জেনারেলের এসব মন্তব্যে মনে হয় যে বিচারপতি খায়রুল হকের রায়ের মূল পয়েন্টগুলো আপিল বিভাগের রায়ে অক্ষত রয়েছে। আপিল বিভাগের এই রায়ের অন্তত মাসখানেক আগে আইনমন্ত্রী এবং এটর্নী জেনারেল যেসব ইঙ্গিতময় কথা বলেন সেইসব কথা থেকে শিক্ষিত সচেতন মানুষ ধরেই নিয়েছিলেন যে, রায়টি কোন দিকে যাবে। রায়টি সেই দিকেই গিয়েছে। এখন আবার সংশোধন ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে সরকারের ঐ দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এসব হয়তো অক্ষত থাকবে। যেহেতু আপীল বিভগের সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণ এখনও প্রকাশিত হয়নি, তাই হাইকোর্টের ঐ রায়কেই এখন পর্যন্ত মানুষ আলোচনা ও মতামতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন। আমরাও হাইকোর্টের রায়কে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে দেশের রাজনীতি ও সামাজিক জীবনে সেই রায়ের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য সম্পর্কে নিজে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এটর্নী জেনারেল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, যেহেতু আপিলটি ডিসমিসড হয়েছে তাই হাইকোর্ট বিভাগের রায় সামগ্রিকভাবেই পুনর্বহাল হবে এবং সেই কারণে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসবে। তার কথার চেয়ে আরেকটু এগিয়ে গেছেন আইনমন্ত্রী। তিনি বলেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে ৭২-এর যে সংবিধানটি রচিত হয় সেই সংবিধানে কিভাবে ফিরে যাওয়া হবে সে সম্পর্কে আইন কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হবে। এটর্নী জেনারেল বলেন যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধান পুনর্মুদ্রিত হবে।

বিএনপির ২ নেতার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

মঙ্গলবার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সান্ধ্য বুলেটিনে জানা গেল যে, জনাব মওদুদ আদালতের বাইরে এসে এ সম্পর্কে আরো মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি পুরোপুরি রাজনৈতিক। তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রায়ে এমন সব বিষয় রয়েছে যেসব বিষয়ে জনগণের মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট বিভক্তি। এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে আদালত যে রায় দিলো সেটি এখন চলে যাচ্ছে জনতার আদালতে। তার মতে এই

www.pathagar.com

রায় জনগণের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে। এখন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবেন জনগণ। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কিত বিষয়ের ওপর রায় দিলেন সুপ্রীম কোর্ট। বিষয়গুলো একান্তই রাজনৈতিক। তাই রাজনৈতিকভাবে এগুলোর ফয়সালা হওয়া উচিত।

জনগণের মাঝে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

মঙ্গলবার এই রায় বের হওয়ার পর শিক্ষিত সচেতন জনগণের মাঝে ত্বরিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের মতামতের মধ্যে একটি অভিন্ন সুর লক্ষ্য করা যায়। তাদের মতে, মূল বিষয়টি হলো একান্তই রাজনৈতিক। সেই হাইলি পলিটিক্যাল একটি বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট নিজেদেরকে না জড়ালেই পারতেন। কারণ এই মামলায় রয়েছে সুস্পষ্টভাবে দুটি রাজনৈতিক ধারা। একটি ধারা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। অপরটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। উচ্চ আদালতের রায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সমুন্নত করা হয়েছে। এসব প্রশ্নে জনমত সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত। কোটি কোটি লোক যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক তেমনি কোটি কোটি লোক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদেরও সমর্থক। রাজনৈতিক দলের নিরিখে যদি সমর্থনের পাল্লা যাচাই করা হয় তাহলে খুব ভুল হবে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি জোট যেমন ২ বার ক্ষমতায় এসেছে তেমনি বিএনপিও একবার এককভাবে এবং আরেকবার জামায়াতের সাথে জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসেছে। এবার সংসদে আওয়ামী লীগের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তেমনি গতবারও বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। আগামীবার নির্বাচনী ফলাফল কি হবে সেটি কেউ বলতে পারে না। হাইকোর্টের রায়ে মরহুম জিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠান এবং পঞ্চম সংশোধনীকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' বলা হয়েছে। সামরিক শাসন জারিকেও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' বলা হয়েছে। তাহলে জেনারেল এরশাদের বেলায় কি হবে? জেনারেল জিয়া কিন্তু সামরিক শাসন জারি করেননি। তিনি তো ছিলেন বন্দী। সেনা ছাউনি থেকে সিপাহী এবং জনতা তাকে মুক্ত করে ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু জেনারেল এরশাদ নিজেই একটি নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিক শাসন জারি করেন। এ ব্যাপারে রায়ে কিছু বলা হয়নি। পঞ্চম সংশোধনীতে 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' কথাটি সংযোজিত হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান কথাগুলো সংবিধান থেকে হটিয়ে দেয়া হবে। তাহলে জেনারেল এরশাদের আমলে সংযোজিত রাষ্ট্রধর্ম বিলটির কি হবে? (আমরা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, ইসলাম অবশ্যই রাষ্ট্রধর্ম থাকবে। কিন্তু মরহুম জিয়া এবং এরশাদের ক্ষেত্রে যে ২ রকম আচরণ করা হয়েছে সে জন্যই তর্কের খাতিরে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে)। জিয়াউর রহমান আনীত সংশোধনী যদি বাতিল হয় তাহলে এরশাদ আনীত সংশোধনী অক্ষত থাকবে কিভাবে?

www.pathagar.com

যেসব প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল

আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত রায়ের পরেও দু'টি প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল। একটি হলো, ১৯৭২ সালের সংবিধান কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? যদি হয় তাহলে কি পার্লামেন্টে কোনো বিল আনতে হবে? নাকি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, যেসব সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট সংযোজন করবেন, সেগুলো কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত হবে? নাকি সেগুলোর জন্য সংসদে বিল আনতে হবে?

আল্লাহর প্রতি ঈমানের কি হবে?

সরকার পক্ষ বলছেন যে 'বিসমিল্লাহ' থাকবে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে। ইসলাম যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম থেকে যায় তাহলে ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ হয় কিভাবে? যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে ইসলাম সেই দেশে খোদাদ্রোহী রাজনৈতিক মতবাদ এবং রাজনৈতিক দল থাকে কিভাবে? একটি দলের নাম 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি'। কে না জানে যে কমিউনিজম ধর্মকে মাদকদ্রব্য 'অফিয়াম' বা 'আফিম' বলে থাকে। কমিউনিজম আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহলে সেই সব দল, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না, যারা ধর্মদ্রোহী তারা থাকবে, কিন্তু ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ হবে। যে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান তারা এই পরিস্থিতি মেনে নেবেন কেন? কিন্তু ৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে সেই ব্যবস্থাই আছে। পঞ্চম সংশোধনীর প্রস্তাবনায় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সংবিধানের মূলনীতি' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ের পর সেটি বাতিল করে 'সমাজতন্ত্র' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে প্রতিস্থাপিত হবে। পঞ্চম সংশোধনীর ২৫ অনুচ্ছেদ ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জোরদারের কথা বলা হয়েছে। উচ্চ আদালতের রায়ের পর সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি বাতিল হবে।

উচ্চ আদালতের রায়ের সারমর্ম হল এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান বাতিল হবে। আসবে ধর্মনিরপেক্ষতা। ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে আসবে সমাজতন্ত্র। মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কের অঙ্গীকার হবে বিলুপ্ত। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হবে। আসবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কের কথা থাকবে না। উচ্চ আদালতের রায়ে ভারতের সাথে সম্পর্ক জোরদারের কথা বলা হয়নি। কিন্তু রায়ের অন্যান্য সুযোগ গ্রহণ করে এই সরকার ইতিমধ্যেই ভারতকেন্দ্রিক এবং ভারত নির্ভর পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে। সেটি আরো জোরদার হবে।

(০৫/০২/২০১০)

www.pathagar.com

৬

৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন : কতিপয় আইনী প্রশ্ন

'শেষ হয়েও হইল না শেষ'। কবিতার ভাষায় আমরা অনেকবার বলেছি, অনেকবার লিখেছি, শেষ হয়েও হইল না শেষ। পঞ্চম সংশোধনী মামলার চূড়ান্ত পর্বে এসে কবিতার এই চরণটি যে এমন প্রকট সত্য হবে সেটা কে জানত? তাই দেখা গেল যে, সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ রায়টি ঘোষণা করলেন নিম্নোক্ত কয়েকটি ইংরেজি শব্দে "The petition is dismissed with modifications and observations."

অর্থাৎ "আবেদনটি কতিপয় সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণসহ খারিজ হইল।" ঐ সব সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণ কি, সেটি আজ ৭ দিন হয়ে গেল, এখনও জানা যায়নি বা প্রকাশিত হয়নি। কতদিন লাগতে পারে, এ ব্যাপারে এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম গত ৭ ফেব্রুয়ারি একটি বাংলা দৈনিকে বলেছেন, "এ ধরনের মামলায় হয়ত অনেক ক্ষেত্রে মাসখানেক লেগে যায়। অনেক সময় বেশিও লাগতে পারে। এটা যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা তাই বিচারপতিদের প্রতি অনুরোধ, যাতে তাড়াতাড়ি এর রায় বের হয়।" ৬ বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের যে বেঞ্চটি এই ৮/১০ টি শব্দের রায় ঘোষণা করেছেন সেই ফুলবেঞ্চের প্রধান অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জুল ইসলাম ইতোমধ্যে তার চাকরি জীবন থেকে অবসরও গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে বেঞ্চের অপর সদস্য বিচারপতি ফজলুল করিম প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। যদিও আলোচ্য বেঞ্চটি ছিল ফুল বেঞ্চ তবুও আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি চূড়ান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি হলেন বিচারপতি খায়রুল হক। কারণ জনাব খায়রুল হক যখন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন তিনি এবং বিচারপতি ফজলে কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায়টি ঘোষণা করেছিলেন। তাই আপিল বিভাগের বিচারিক কাজে তিনি অংশ নিতে পারেননি। বলাবাহুল্য, রায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ও মন্তব্য এখনও পাওয়া যায় নি। ফলে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় এখনও জানা গেল না। ফলে এ কথা এখন আর বলা যাচ্ছে না যে, খায়রুল হক সাহেবের বেঞ্চ যে রায়টি দিয়েছিলেন সেটি পুরোপুরি বহাল থেকে গেল, অথবা তার রায়টি ব্যাপকভাবে মাজাঘষা করা হয়েছে। এর ফলে আপিল বিভাগের রায়টি এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে গেল। অথচ কি আশ্চর্য, সেই অসম্পূর্ণ রায় নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা ও সমর্থনের তুফান ছুটেছে। এই আলোচনা ও

www.pathagar.com

সমালোচনার ঝড় ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ এই রায়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে বিপুল আগ্রহ। আইনের খুঁটিনাটি দিক সকলেই যে ভাল বোঝেন সেটি সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু শুধু উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিতদের ড্রইংরুমেই নয়, শুধু বড় সাহেবদের সুসজ্জিত অফিস কক্ষের ৪ দেয়ালের মধ্যেই এই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই, সাধারণ মানুষের মাঝেও এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ আইন-কানুন নিয়ে অতো নাড়াচাড়া না করলেও তাদের প্রশ্ন খুব সোজা এবং সরল; কি ভাই, ইসলামী দলগুলো কি থাকবে? নাকি বাতিল হয়ে যাবে? সমাজতন্ত্র কি আবার ফিরে আসছে? আল্লাহর প্রতি ঈমান নাকি বাতিল হয়ে যাবে? ধর্মনিরপেক্ষতা নাকি আবার ফিরে আসছে? এগুলোই সাধারণ মানুষের মাঝে প্রধান আলোচ্য বিষয়। বাসে, রেস্টুরেন্টে বিশেষ করে বিয়েশাদীর অনুষ্ঠানে এই ধরনের আলোচনা খুব জমে উঠছে। আপিল বিভাগের এই রায়ের আগে পর্যন্ত সকলেই ঢালাওভাবে বলছিলেন যে, ওগুলো সব বাতিল হয়ে গেছে এবং অন্যগুলো সব ফিরে আসছে। অন্যদিকে এটর্নী জেনারেল এডভোকেট মাহবুবে আলম সবসময়ই বলছেন এবং আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার সফিক আহমেদ মাঝেমধ্যে বলছেন যে, লিভ টু আপিল খারিজ হওয়ার ফলে ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আপিলকারীদের অন্যতম আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খুব জোর দিয়ে বলছেন যে, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় যাই হোক না কেন, ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আপিলকারীদের অপর আইনজীবী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এইচ খান এটর্নী জেনারেল বা মওদুদ আহমদ কারো মন্তব্যের সাথে একমত নন। জনাব মওদুদ ও টি এইচ খান উভয়েরই মতামত হল এই যে, দেশের সামগ্রিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত এমন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলায় লিভ মঞ্জুর হল না, সেটি চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। লিভ মঞ্জুর হবে, বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ তাদের যত রকম আর্গুমেন্ট আছে সব পেশ করবেন এবং তারপর বিজ্ঞ বিচারকরা তাদের রায় দেবেন, তেমনটাই নিয়ম। কিন্তু এই মামলায় লিভও দেয়া হল না এবং মাত্র ৬ দিনের শুনানির পর লিভ খারিজ করা হল। এটা অস্বাভাবিক। এমন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সংশোধন এবং পর্যবেক্ষণের কথা বলা হল, কিন্তু সেই সংশোধন এবং পর্যবেক্ষণ ছাড়াই লিভটি খারিজ করে দেয়া হল- এমন ঘটনা তিনি তার ৫০ বছরের আইন পেশাতে দেখেননি বলে বিচারপতি টি এইচ খান মন্তব্য করেছেন। যাই হোক, এই আলোচনা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে জনাব খায়রুল হকের রায়ের মধ্যেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যখন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হবে তখন এই বিষয়ে হয়ত আরো কথা বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। সেটি হল এই যে, আমাদের সংবিধান এ পর্যন্ত মোট ১৪ বার সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চম সংশোধনীর পূর্বে আরো ৪ বার সংশোধিত হয়েছে। এসব সংশোধনী সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। প্রথম সংশোধনী হল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন। দ্বিতীয় সংশোধনী হল জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন। তৃতীয় সংশোধনী হল মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অর্থাৎ বেরুবাড়ী হস্তান্তর এবং দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহলগুলো বাংলাদেশে হস্তান্তর ও তিনবিঘা করিডোর স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের নিকট ইজারা দেয়া সম্পর্কিত চুক্তি অনুমোদন। চতুর্থ সংশোধনী হল বাকশাল গঠন।

এরপর আরো ১০টি রয়েছে। সেগুলো এই মুহূর্তে আলোচনা না করলেও চলবে। এখন ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যেতে হলে ২টি পথের যেকোনো একটি অনুসরণ করতে হবে। একটি হল-যদি আপিল বিভাগের রায়ে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের কোনো বড় ধরনের সংশোধন না হয়ে থাকে তাহলে পঞ্চম সংশোধনীগুলো বাতিল করে ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত (৪ নভেম্বর তারিখে গৃহীত) সংবিধানটি ছাপিয়ে দিলেই ৭২ সালে ফিরে যাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র ফিরে আসবে এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ৭২-এর সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে ফিরে আসায় মুসলিম উম্মাহর সাথে সংহতির অনুচ্ছেদটিও বিলুপ্ত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনীর কি হবে? ঐগুলো তো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরে আসবে না। ৭২-এর মূল সংবিধানে নিরাপত্তা আইন এবং জরুরী আইন ছিল না। অনুরূপভাবে বেরুবাড়ীও ভারতকে দেয়া হয়েছে ৭২-এর সংবিধান জারির পর তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে। সেই বেরুবাড়ীরই বা কি হবে? অবশ্য অন্য একটি মত হলো এই যে, যদি শুধু পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয় তাহলে ঠিক ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া হয় না। তাই এক্ষেত্রে পরিষ্কার করা দরকার যে, যদি তারা ৭২-এর সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করেন তাহলে জরুরী অবস্থা ও বেরুবাড়ী সম্পর্কিত সংশোধনী ২টিও পুনরুজ্জীবিত হবে।

দ্বিতীয় পথ হলো এই যে, সংসদে বিল উত্থাপন করে ৭২ সালের মূল সংবিধানের বাতিলকৃত ধারাগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এটি করতে গেলে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং সংশোধন পদ্ধতিতে হাত দিতে হয়। সেগুলো করতে গেলে শুধু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই চলবে না, সেগুলো গণভোটেও পাস করাতে হবে।

আল্লাহর প্রতি আইন সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি বাতিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এই ৩টি বিষয় স্পর্শকাতর বিষয় বলে বিবেচিত। এসব বিষয় গণভোটে দিলে ফলাফল কি ইতিবাচক হবে, নাকি নেতিবাচক হবে, সেটি হলফ করে এই মুহূর্তে কে বলার দায়িত্ব নেবেন? এসব বিষয় বিবেচনা করলে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনই নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেখানে রয়ে গেছে একটি বিরাট প্রশ্ন। হাইকোর্টের রায়ে যা বলা হয়েছে আপিল বিভাগ কি তার সবগুলোই সমুন্নত রাখবে? তাহলে তো মডিফিকেশন এবং অবজারভেশনের কথা থাকত না। তাই সরকার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ, সকলেরই উচিত এই মুহূর্তে জল্পনা কল্পনার জাল না বুনে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য অপেক্ষা করা।

॥ তিন ॥

আইনী প্রশ্নের শেষ নেই। যে ৬ দিন ধরে লিভ টু আপিলের শুনানি হয় সেই শুনানিতে যারা মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজে পড়েছেন তারা 'পক্ষে-বিপক্ষে' অনেক যুক্তিতর্ক শুনেছেন। আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণে অনেক পয়েন্টই বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঃ বিষয়টি কি শুধুই আইনী? যখন ধর্মনিরপেক্ষতা, আল্লাহর প্রতি ঈমান, সমাজতন্ত্র, বাংলাদেশী/বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা, পররাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া বা না দেয়া, এগুলো বিষয় যখন এসে পড়ে তখন বিষয়টি অবধারিতভাবে হয়ে পড়ে রাজনৈতিক। বাংলাদেশের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি হল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। আরেকটি হল আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। দুই ঘরানার দু'টি রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল ফারাক। বাংলাদেশে জনগণের মাঝেও এই দু'টি রাজনৈতিক ঘরানারই রয়েছে বিশাল প্রভাব। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে ৪টি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব নির্বাচনে একবার বিএনপি আরেকবার আওয়ামী লীগ- এভাবে ২ বার বিএনপি এবং ২ বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। একবার বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে, আরেকবার আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা হল আওয়ামী ঘরানার রাজনৈতিক দর্শন। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান হল বিএনপি ঘরানার রাজনৈতিক দর্শন। আজ যদি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয় আর পরবর্তী নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা যদি ক্ষমতায় আসেন, তাহলে কি পরিস্থিতি হবে? তারা তো তখন তাদের রাজনৈতিক দর্শন সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেন। এই বিষয়টি মহামান্য আদালতের বিবেচনায় থাকলে সেটি দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তথা সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাকে সুপ্রিম কোর্ট অক্ষুণ্ন রাখবে। তাহলে উপায় কি? সামরিক ফরমান বলে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। তেমনি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমেও কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের ফয়সালা হওয়া উচিত নয়। সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক বিষয়াবলী থেকে মুক্ত রাখা উচিত। রাজনৈতিক ইস্যুসমূহ ফয়সালার মাধ্যম হবে রাজনৈতিক মঞ্চ। (দৈনিক ইনকিলাব : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

www.pathagar.com

৭

মার্কসের রাজনীতি থাকবে, মুহাম্মদ সাঃ-এর রাজনীতি থাকবে না

আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার সফিক আহমেদ প্রায় দুই সপ্তাহ আগে আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে এক শ্রেণীর বাংলাদেশীর সাথে মতবিনিময় করেছেন। ঐ মতবিনিময় সভায় তিনি বলেছেন যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এখন একটি নিষিদ্ধ দল। আমেরিকায় প্রায় চার-পাঁচটি বাংলাদেশী বার্তা সংস্থা রয়েছে। এই ধরনের একটি বার্তা সংস্থা খবর দিয়েছে যে, আইনমন্ত্রীর মন্তব্য শুনে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অধিকাংশ বাংলাদেশীর চক্ষু রীতিমতো চড়ক গাছ! তাদের কেউ কেউ আইনমন্ত্রীকে মুখের ওপর বলে ফেলেন যে, এখন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়নি। তার আগেই জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে গেলো কিভাবে? তাছাড়া জামায়াত যে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সে সম্পর্কে কোনো সরকারি ঘোষণাও তো এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি। সভায় উপস্থিত আরেকজন শ্রোতা ব্যারিস্টার শফিক আহমেদকে তার পূর্বেকার উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ইতোপূর্বে একাধিকবার বলেছেন যে, রায় ঘোষিত হওয়ার পর রায়টি আইন কমিশনে পাঠানো হবে। ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ হবে কিনা, হলে কোন প্রক্রিয়ায় সেটি হবে, সে সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত জানতে চাওয়া হবে। আইন কমিশনের সাথে পরামর্শ ও আলোচনাক্রমেই পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়টি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।

মতবিনিময় সভার ঐ দর্শক জানতে চান যে, সরকার কি আইন কমিশনের মন্তব্য গ্রহণ করেছেন? না করে থাকলে তিনি এসব আগাম সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন কিভাবে?

এছাড়া একই ব্যাপারে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা ও মন্ত্রী একই বিষয়ে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলো মাঝেমাঝে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়েছে। যেমন– এক শ্রেণীর নেতা বলেছেন যে, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত সরকার এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

আইনী অবস্থান

এ ব্যাপারে এই প্রতিনিধি একাধিক সিনিয়র আইনজীবীর সাথে কথা বলেছেন। তাদের বক্তব্য হলো এই যে, এখন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়টি চূড়ান্ত হয়নি। সেই রায়টি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই জামায়াতে ইসলামী বা শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বা না করা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার শামিল।

www.pathagar.com

গত ২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ এক লাইনের একটি রায় দিয়েছেন। রায়টির বক্তব্য হলো– "দ্য এ্যাপিল ইস ডিসমিসড উইথ মোডিফিকেশনস অ্যান্ড অবজারভেশনস।" অর্থাৎ, "সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণসহ আপিলটি খারিজ হলো।" এর অর্থ এই যে, বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায়টির স্পিরিট বহাল থাকলো। কিন্তু রায়টি অবিকল অবিকৃত থাকলো না। সেখানে কিছু পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এখন সেই সংশোধনী এবং পর্যবেক্ষণগুলো কি? সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগের যেসব বিচারপতিকে নিয়ে বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল তারাও কি এসব সংশোধনী ও পর্যবেক্ষণের সঠিক ভাষা জানেন? তাদের তো সেটি জানার কথা নয়। কারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত ১০ মার্চ পর্যন্ত সেই রায়টি লেখাই হয়নি।

এই অস্বাভাবিক বিলম্বের রহস্য কোথায়?

জানা গেছে যে, এই রিপোর্ট লেখার দিন অর্থাৎ বিগত ১৭ মার্চ পর্যন্ত রায়টি লেখা হয়নি। আর লেখা হয়ে থাকলেও সব বিচারপতি সেখানে স্বাক্ষর দেননি। এখন সেই স্বাক্ষর নিয়ে উঠেছে আইন ও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন। বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের এই বেঞ্চটি গঠিত হয়েছিল। আপিল বিভাগ রায়টি দেন ২ ফেব্রুয়ারি। প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাফাজ্জল ইসলাম অবসরে গিয়েছেন ৭ ফেব্রুয়ারি।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ মার্চ পর্যন্ত রায়টি লেখাও হয়নি এবং কোনো বিচারপতির স্বাক্ষরও গ্রহণ করা হয়নি। এই রিপোর্টটি প্রকাশ হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১৬ মার্চ পর্যন্ত রায়টি একই অবস্থাতেই পড়ে ছিল বলে জানা গেছে। অর্থাৎ সেটি লেখাও হয়নি এবং কোনো বিচারপতি সেখানে সইও করেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রায়টি ঘোষিত হওয়ার পর পুরো ১ মাস ১৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও, সেই রায়টি লেখা হয়নি এবং স্বাক্ষরিতও হয়নি। তাহলে বিষয়টি কি দাঁড়াচ্ছে?

আমি বিষয়টি কঠোরভাবে আইনের দৃষ্টিতে বিচার করছি। দেড় মাস পরে হোক, কি দুই মাস পরে হোক, কি যতোদিন পরেই হোক না কেন, যখন রায়টি লেখা সম্পন্ন হবে তখন বিচারপতিগণ তাদের দস্তখত দিবেন। তাহলে সেক্ষেত্রে মাননীয় বিচারপতিগণ কি ব্যাকডেটে সই করছেন না? ব্যাকডেটে সই-করা আইনের দৃষ্টিতে কিভাবে গ্রহণ করা হয়, আমার সঠিক জানা নেই। বিশেষভাবে নৈতিক দৃষ্টিতে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহলে কেন এই তাড়াহুড়ো করা হলো, সেটি নিয়ে ও য়াকিবহাল মহলে নানান কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না আসায় গুজব তার শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

হয়তো এখানেও তাই হচ্ছে। অথবা হয়তো একদিন দেখা যাবে যে গুজবটাই সত্যি হয়ে উঠছে। তবে এই অস্বাভাবিক বিলম্বের একটি কারণ হিসেবে অভিজ্ঞ আইনজীবীরা বলছেন যে, এটির পেছনে সাবেক প্রধান বিচারপতির হয়তো ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল। তিনিও জানতেন এবং দেশবাসীও জানতেন যে, ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি রিটায়ারমেন্টে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগেই তার আমলে অর্থাৎ তিনি বিচারপতি থাকাকালেই এমন মহাজনগুরুত্ব সম্পন্ন মামলার রায় ঘোষিত হোক, হয়তো সেই বিবেচনাতেই তিনি এমন তাড়াহুড়ো করেছেন। কারণ তিনিও তো জানতেন যে, তিনি ৭ তারিখে অবসরে যাবেন। তাই ২ তারিখেই রায়টি মৌখিকভাবে ঘোষণা করেছেন।

আবেদনকারীদের সময় দেয়া হলো না কেন?

৩ জন এডভোকেট এবং বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ছিলেন এই মামলার আপিলকারী । ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং সাবেক বিচারপতি টিএইচ খান ছিলেন এই মামলার আবেদনকারীদের উকিল। তাড়াহুড়ো না করে এই মামলার সময় চেয়েছিলেন এই দুই জাঁদরেল উকিল। তারা মাননীয় আদালতের নিকট আবেদন করেছিলেন যে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলা। দেশের রাজনীতি এবং সংবিধানের সাথে জড়িত হয়েছে এই মামলাটি। তাই তড়িঘড়ি করে মামলার বিচারিক কার্য শেষ করা উচিত হবে না। এই কারণে তারা ধীরেসুস্থে শুনানি করার আবেদন জানান। আর ধীরেসুস্থে শুনানির জন্য তারা সময় চান। দুঃখের বিষয়, মাননীয় আপিল বিভাগ তাদেরকে সেই সময় দেননি। তাই যে ৩ জন এডভোকেট এই মামলার আপিলকারী ছিলেন তাদের মধ্যে দুই জন প্রশ্ন রেখেছেন যে, সেই বিলম্ব তো হলোই, তাহলে তাদেরকে কেন সময় দেয়া হলো না?

মাননীয় বিচারপতিরা রায় লিখতে লম্বা সময় নিচ্ছেন। ফলে তারা পরোক্ষভাবে এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই মামলার রায় ঘোষণা করতে হলে ধীরেসুস্থে এগুতে হবে। কারণ এই মামলার রায়ের সাথে জড়িত রয়েছে দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা এবং দ্বিদলীয় রাজনীতি ও মতাদর্শের মধ্যে কোনো একটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের বিষয়টি। এখন দেখা যাচ্ছে যে, সেই দেরি তো হলো। বরং শুনানির জন্য যদি আরো সময় দেয়া হতো তাহলে তাদের আইনজীবীরা সাংবিধানিক আইন শাস্ত্র সম্পর্কে দেশ বিদেশের অনেক রেফারেন্সের উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। ফলে আদালতও সমৃদ্ধ হতো এবং রায়টি ধীরস্থির বিবেচনা থেকে উৎসারিত হতো।

অন্য একটি ধারণা এই যে, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। হুট করে কোনো রায় দেয়া সরকারের পক্ষে ঠিক হবে না। সাধারণত দেখা যায় যে, এই ধরনের গুরুতর সাংবিধানিক প্রশ্নে বিচারপতিরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই রায় দেন। অথচ এই ক্ষেত্রে, যেখানে রায়টি ঘোষিত হচ্ছে ওপেন কোর্টে, সেখানে কাউকে কোনো কিছু বুঝবার বা ভাববার সময় না দিয়েই রায়টি ঘোষণা করা হলো। বিচারপতি টিএইচ খান বলেন, তারা এ বিষয়টি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন যে, তাদেরকে খুব কম

www.pathagar.com

সময় দেয়া হলেও এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেও তারা যেসব যুক্তিতর্ক পেশ করেছেন, সেগুলো কিভাবে খণ্ডন করা হলো সেটা তাদের জানা দরকার।

মার্কসের রাজনীতি থাকছে, কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর রাজনীতি থাকছে না

বিচারপতিরা কি কি পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনী দিলেন, সেগুলো কি তারা লেখার আগে-ভাগেই আইনমন্ত্রীকে বলে দিয়েছেন? তা না হলে এমন আগাম কথা আইনমন্ত্রী কিভাবে বলেন?

ভার্জিনিয়ায় তিনি বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার কথা। আর এখানে অর্থাৎ ঢাকায় আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা বলছেন যে, আপিল বিভাগের রায়ের ফলে দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাবে। বিষয়টি কি আসলেই তাই?

তাহলে আইন কমিশনের কি হলো? একদিকে থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতা, অন্যদিকে থাকবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এই দুটোর মধ্যেইবা সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে কিভাবে? এই দুটো কি সহাবস্থান করতে পারে? যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম থাকবে ইসলাম সেই দেশে ইসলামী দলগুলো রাজনীতি করতে পারবে না। কিন্তু যারা কমিউনিজমে বিশ্বাস করে সেই কমিউনিস্ট পার্টি রাজনীতি করতে পারবে। এটি কোন ধরনের বিচার?

কমিউনিজমের মূল সুর হলো, ধর্ম হচ্ছে আফিম। তাই কমিউনিস্টরা ধর্মদ্রোহী, খোদাদ্রোহী। তারা আল্লায় বিশ্বাস করে না। তারা নাস্তিক। আর এই নাস্তিক্যবাদের জনক হলেন, কার্ল মার্কস এবং তার দক্ষিণ হস্ত ফ্রেডারিক এ্যাঙ্গেলস। ভারতের জনসংখ্যা ১১০ কোটি, তার মধ্যে ৮৪ শতাংশ অর্থাৎ ৯২ কোটি ৪০ লাখ মানুষ সেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সেখানেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ নয়। মুসলিম লীগসহ আরো ধর্মভিত্তিক দল ভারতে রয়েছে। জার্মানীতে ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ খ্রিস্টান। জার্মানীর বর্তমান নারী প্রেসিডেন্টের নাম এ্যাঞ্জেলা মার্কেল। তিনি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান। হিন্দু প্রধান ভারত এবং খ্রিস্টান প্রধান জার্মানীতে ধর্মভিত্তিক দল যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। সেই মুসলমানের দেশে ইসলামী দল থাকবে না, এটা মেনে নেয়া যায় না। আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই ধর্মভিত্তিক দল রয়েছে। নেই শুধু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে। ছিলো না সোভিয়েট ইউনিয়নে। নেই গণচীনে। নেই কিউবাতে। কারণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আছে এক দলীয় শাসন। এই বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার নয়। এখতিয়ার থাকতে পারে না। সুতরাং এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিষয়টি প্রথমে পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হোক। তারপর ৯০ শতাংশ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না, তার ওপর গণভোট নেয়া হোক। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগকে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামী রাজনীতিকে যেন কতল করা না হয়। বাংলাদেশে মার্কসের রাজনীতি থাকবে, আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর রাজনীতি থাকবে না, সেটি কোন ক্রমেই মানা যাবে না।

www.pathagar.com

৮

মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ কিন্তু এরশাদের মার্শাল ল' সম্পর্কে নীরব কেন?

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর গত কয়েকদিনে রাজনীতিবিদ এবং আইনজ্ঞদের বিভিন্ন মতামত পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। এই কলামটি লিখছি শুক্রবার। তাই শুক্রবার পর্যন্ত প্রকাশিত মতামত এই কলামে স্থান পাচ্ছে। এই লেখাটি প্রকাশিত হলো আজ রোববার। বিগত দুই দিনে আরো অনেক মতামতই হয়তো প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো বোধগম্য কারণেই প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। যাই হোক, শুক্রবার পর্যন্ত প্রকাশিত মতামতের ভিত্তিতেই আমি আজকের এই কলামটি লিখছি।

যে কয়টি মতামত আমি পেয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সারগর্ভ মনে হয়েছে এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেনের মতামত। তিনি সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি। তিনি বলেছেন যে, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহ' রাখা হয়েছে। আবার ইসলামকেও রাষ্ট্রধর্ম রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ফেরত আনা হয়েছে এবং 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থার' বিধানটি বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি এ রকম দাঁড়াচ্ছে- 'বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করবো, আর শেষ করার সময় বলবো যে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা যাবে না।' তার মতে এটি শুধু স্ববিরোধিতায় পূর্ণই নয়, এটি রীতিমত হাস্যকর। পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে প্রথমে রায় দিয়েছে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। এই বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবির। তাদের রায়ে ২১টি পর্যবেক্ষণকেই অনুমোদন দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ বহাল রাখা হয়েছে। যে ৩টিতে ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় সেগুলো আলোচনার দ্বিতীয় সারিতে আসে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যাপারটি একান্তভাবেই উচ্চ আদালতের, অথবা সেখানে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি বা আইনজীবীদের। কিন্তু আপিল বিভাগ হাইকোর্টের যেসব রায় সমুন্নত রেখেছে সেগুলো মূলত রাজনৈতিক বিষয়। এ সব জ্বলন্ত রাজনৈতিক ইস্যুতে হাইকোর্ট অথবা আপিল বিভাগ যেসব মতামত দিলেন সেগুলো রাজনৈতিক দলের বিষয়, হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের বিষয় নয়। আমি উচ্চ আদালতে গিয়েছিলাম। সেখানে ক্যান্টিনে চা খেতে বসে অসংখ্য আইনজীবীর সাথে কথা হলো। তারা সকলেই একবাক্যে বলছেন যে, হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগ দেশের

www.pathagar.com

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জ্বলন্ত রাজনৈতিক ইস্যুতে যেসব রায় দিলেন তার ফলে রাজনৈতিক দল বা পার্লামেন্টের আর কিছু করার থাকলো না। তাহলে আর রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন কি? পার্লামেন্টইবা করবে কি? এ ব্যাপারে ড. কামাল হোসেনের মন্তব্য আরো হাস্যকর। তিনি বলেছেন যে, আপিল বিভাগের এই পূর্ণাঙ্গ রায় ঘোষণার সাথে সাথেই নাকি সংবিধানের সংশোধন হয়ে গেল। এই জন্য জাতীয় সংসদে আর কোন বিল উত্থাপনের প্রয়োজন নেই। তিনি আরো বলেছেন যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ সদস্যের যে সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন তারাও আপিল বিভাগের রায়ের ক্ষেত্রে কিছু করতে পারবে না। যেসব বিষয়ে আপিল বিভাগ চূড়ান্ত রায় দিয়েছে সেসব বিষয়ে এই সংসদীয় কমিটি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যেসব বিষয়ে আপিল বিভাগ কোন রায় দেয়নি সেই সব বিষয়ে ইচ্ছে করলে সংসদীয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে। সুতরাং আইনজীবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা বলছেন ড. কামাল হোসেন ঘুরিয়ে বললেও পরোক্ষভাবে সে কথাটিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। সেটি হলো, জ্বলন্ত রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর ফয়সালা সুপ্রিম কোর্টই করে দিয়েছে, রাজনৈতিক দল বা পার্লামেন্টের প্রয়োজন হয়নি। উচ্চ আদালত যদি তাদের এই ভূমিকা অব্যাহত রাখে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এ দেশে হয়তো আর কোন রাজনৈতিক দল তথা কারো কোন রাজনীতি দরকার পড়বে না।

কিন্তু হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের এই ভূমিকার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক বিপদের বীজ রোপিত হলো। সেটি হলো সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বা ঘরানার মতামতই হুবহু প্রতিফলিত হলো। সেই কথাটিই বলেছেন প্রবীণ আইনজ্ঞ সাবেক বিচারপতি জনাব টিএইচ খান। তিনি বলেছেন যে, এই রায়ের ফলে সরকারের জন্য একটি বিরাট মওকা সৃষ্টি হলো। এখন তারা যেভাবে চাইবে সেভাবেই সংবিধানে তাদের চিন্তাধারা বা রাজনৈতিক দর্শন অন্তর্ভুক্ত করবে। একটি রাজনৈতিক দল বা ঘরানার রাজনৈতিক আদর্শ সমুন্নত করে যে রায় ঘোষিত হলো তার ফলে অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বা ঘরানার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা দর্শনকে বাতিল করা হলো। এই রাজনৈতিক ঘরানা অতীতে তিন বার সংসদীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। এমনকি এবারেও মোট ভোটের ৩৭ শতাংশ তারা পেয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। জনগণ একবার আওয়ামী ঘরানাকে ক্ষমতায় আনছে, আরেকবার বিএনপি ঘরানাকে ক্ষমতায় আনছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়ে বলা যায় যে, জনগণের ভোটে একবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতায় আসছে, আরেকবার 'আল্লাহর ওপরে আস্থা স্থাপনকারী'

www.pathagar.com

ঘরানা ক্ষমতায় আসছে। এখন হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপনে দর্শনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক মতবাদকে বাতিল করেছে। আগামীতে যদি সেই দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটে আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের কি হবে? সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের বিপক্ষে কি সেই রায়টি চলে যাবে না? তাইতো বলছিলাম যে হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের নিক্তি দিয়ে রাজনীতি মাপা ঠিক হয়নি। এ কারণেই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে উচ্চ আদালত রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে অথবা যেসব ইস্যুতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে সেই সব ইস্যুতে তারা নিজেদেরকে জড়িত করে না। উচ্চ আদালত সঠিক কাজ করলেন কিনা সেটি অনাগত ভবিষ্যতই বলবে।

॥ দুই ॥

এই রায়টি নিয়ে উচ্চ আদালত যে ইতোমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে গেছে তার প্রমাণ তো ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। খন্দকার মাহবুব হোসেন সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি। সুপ্রিম কোর্টের হাজার হাজার আইনজীবীর তিনি নির্বাচিত সভাপতি। তার মন্তব্যকে হালকাভাবে গ্রহণ করা যাবে না। তিনি বলেছেন যে, যখন কোন শাসন বা বিধান অবৈধ হয় তখন তার পুরোটাই অবৈধ হবে। কিছুটা অবৈধ, আর কিছুটা বৈধ, এমন একটি রায় আসলে আপোষ এবং জোড়াতালির বিষয়। তার মতে উচ্চ আদালতের রায়ে বিষয়টি নিয়ে জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে, অর্থাৎ ওই চার বছরের পুরো শাসনকালটিই অবৈধ। এই সময় যারা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ছিলেন তারা অর্থাৎ খন্দকার মোশতাক আহমেদ, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এবং জিয়াউর রহমান- এই তিন নেতার সমগ্র শাসনকালটি অবৈধ। তাদের অনেকগুলো অ্যাকশনকে সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছে আবার অনেকগুলো অ্যাকশনকে বৈধতা দিয়েছে। এখানেই উচ্চ আদালত তার অবস্থানে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেনের ভাষায় সুপ্রিম কোর্ট এখানে 'পিক এন্ড চুজ' নীতি অবলম্বন করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত 'পিক এন্ড চুজ' নীতি গ্রহণ করবে, এটি মোটেই অভিপ্রেত নয়। ফলে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টিও দারুণভাবে বিতর্কিত হয়ে গেল।

শুধুমাত্র খন্দকার মাহবুব নন, আরো অন্যান্য খ্যাতিমান আইনজীবীও উচ্চ আদালতের রায়ে এই ধরনের 'পিক এন্ড চুজ' নীতি দেখতে পেয়েছেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, বিচারপতি টিএইচ খান, ড. জহিরসহ অনেকেই এই কথাটি বলেছেন। কেউ বলেছেন সরাসরি, আবার কেউ বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারা বলেছেন যে, সামরিক

www.pathagar.com

শাসন অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং যারা এই কাজটি করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। ভাল কথা। সামরিক শাসন যদি খারাপই হয়ে থাকে তাহলে সব সামরিক শাসনই তো খারাপ হওয়া উচিত ছিল। তাহলে ওই ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়টি বেছে নেয়া হলো কেন? লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিন্তু সামরিক শাসন জারি করেননি। সামরিক শাসন জারি করেছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তারপর সামরিক শাসন পুনরায় জারি করেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, যিনি পরবর্তীকালে নিজেই নিজেকে মেজর জেনারেল হিসেবে প্রমোশন দিয়েছিলেন। সেই সামরিক আইনের জন্য বিচারপতি সায়েমকে দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু তারা কি জানেন না যে, বিচারপতি সায়েম স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্ট হননি এবং হেঁটে হেঁটে যেয়ে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসেননি। তাকেও বন্দুকের নলের মুখে ওই চেয়ারে বসানো হয়েছিল এবং তাকে দিয়ে সামরিক আইন জারী করানো হয়েছিল। তাহলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ এবং তার প্রধান স্তম্ভ কর্নেল শাফায়াৎ জামিলকে আড়ালে রাখা হয়েছে কেন?

আরো কথা আছে। দেশের সব মানুষই জানেন যে, ৭ নভেম্বর যখন সামরিক আইন জারি হয় তখন জেনারেল জিয়া ছিলেন খালেদ মোশারফের বন্দি। জিয়া তো নিজে সামরিক শাসন জারি করেননি। শত শত সিপাহী খালেদ মোশারফের জিন্দাখানার তালা ভেঙ্গে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করেন। ৭ নভেম্বর বিকেলে তিন বাহিনীর প্রধানকে উপ-সামরিক আইন প্রশাসক বা ডিসিএমএলএ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এই তিনজন উপ-শাসক হলেন সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান এবং বিমানবাহিনী-প্রধান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তিনজন উপ-শাসকের একজন ছিলেন শহীদ জিয়াউর রহমান। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট এবং সিএমএলএ হিসেবে বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করলে তিন বাহিনীর প্রধান মিলে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল জিয়াকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অর্থাৎ সিএমএলের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। এভাবেই সিএমএল হিসেবে তার উত্তরণ ঘটে। তারপরেও যদি সামরিক শাসক হিসেবে তার বিচারের দাবি ওঠে তাহলে জেনারেল এরশাদ বিচারের আওতা থেকে বাদ যান কিভাবে? এসব প্রশ্ন তুলেছেন ওই সব আইনজীবী যাদের নাম কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭ নভেম্বরে যেটি ঘটেছিল সেটি সামরিক শাসন নয়, বরং সেটি ছিল হাজার হাজার সিপাহী জনতার বিপ্লব। কিন্তু জেনারেল এরশাদ যখন ক্ষমতা কবজা করেন তখন দেশে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মাত্র ৪ মাস ৯ দিন আগে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (১৫ নভেম্বর, ১৯৮১)। বিচারপতি সাত্তার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই এরশাদ ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকেন কিভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারকে উৎখাত

www.pathagar.com

করা যায়। এভাবে ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পিতভাবে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টসহ সকলেই এতো কঠোর ভাষায় কথা বলছেন। অথচ সবচেয়ে বড় ক্ষমতা দখলকারী এরশাদের কোন নাম নেই। এটা কি সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুবের বাসায় উৎকট 'পিক এন্ড চুজ' নয়?

॥ তিন ॥

সামরিক আইন জারির জন্য যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয় এবং কারো বিচার করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে এইচএম এরশাদের। মোশতাকের সামরিক শাসন জারিরও একটি পটভূমি ছিলো। সেটি হলো, সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল শাসন কায়েম। সবগুলো সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে মাত্র চারটি সংবাদপত্র রাখা হয়। সেইগুলোর মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করে সরকার। সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে এসেছিল সামরিক শাসন। এটি হলো ইতিহাস। ৭ নভেম্বরে যেটি ঘটেছিল সেটি সামরিক শাসন নয়, বরং সেটি ছিল হাজার হাজার সিপাহী জনতার বিপ্লব। কিন্তু জেনারেল এরশাদ যখন ক্ষমতা কবজা করেন তখন দেশে ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মাত্র ৪ মাস ৯ দিন আগে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (১৫ নভেম্বর, ১৯৮১)। বিচারপতি সাত্তার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই এরশাদ ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকেন কিভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারকে উৎখাত করা যায়। এভাবে ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পিতভাবে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টসহ সকলেই এতো কঠোর ভাষায় কথা বলছেন। অথচ সবচেয়ে বড় ক্ষমতা দখলকারী এরশাদের কোন নাম নেই। এটা কি সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুবের বাসায় উৎকট 'পিক এন্ড চুজ' নয়? এই প্রশ্ন করলে আওয়ামী ঘরানার লোকজন বলেন যে, জিয়া বা মোশতাকের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। কিন্তু এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তো কেউ মামলা করেননি। তাহলে এরশাদের কথা আসবে কি করে? যারা এই ধরনের যুক্তি দেন তারা তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন। তাদের এগুলো হলো কুযুক্তি বা কুতর্ক। যদি হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এরশাদের সামরিক শাসনকেও অবৈধ বলা হতো তাহলে কেউ কিছু বলতো না। সেই কাজটি না করা সঠিক হয় নি।

প্রিয় পাঠক, সংশোধনী বাতিলের মামলা নিয়ে লিখতে গেলে এক কিস্তিতে সেটি শেষ হবে না। একাধিক কিস্তিতে সেই লেখাটি লিখতে হবে। সেই একাধিক কিস্তি লেখার চিন্তা-ভাবনা করে আজকের মত ইতি টানছি। (দৈনিক সংগ্রাম : ০১/০৮/২০১০)

www.pathagar.com

৯

সপ্তম সংশোধনীর রায়ে আছে অনেক রাজনৈতিক ইস্যু : আছে অনেক প্রশ্ন

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের রেশ কাটতে না কাটতেই গত বৃহস্পতিবার বাতিল হয়েছে সপ্তম সংশোধনী। বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গত বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করেন। প্রচার মাধ্যমে গত শুক্রবার এই রায়টির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছে। তাই সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করবো না। পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হতে অথবা তার কপি পেতে সময় লাগবে। ততোদিন তো আর আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। তাই আজকের কলামে এই রায় সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে কিছুটা আলোচনা করবো। যখন রায়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যাবে তখন ইনশাআল্লাহ, বিস্তারিত আলোচনা করবো। প্রথমেই বলে রাখছি যে, আজকে যে আলোচনা করবো সেটির ভিত্তি হচ্ছে শুক্রবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রায়ের সংক্ষিপ্ত সার।

পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক রায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. '৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে '৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জারি করা সমস্ত সামরিক ফরমান ও বিধি বিধান অবৈধ ঘোষণা।
২. জেনারেল এরশাদ অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী।
৩. তার শাস্তি হওয়া উচিৎ। এরশাদের অবৈধ কার্যক্রমকে মার্জনা করার কোন সুযোগ নেই।
৪. ধারাবাহিকতার জন্য যেসব পদক্ষেপ ওই সময় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে মার্জনা করা হলো।
৫. এরশাদ এবং জিয়াউর রহমান দালাল এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুনর্বাসিত করেছেন।
৬. ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে জিয়া সংবিধান ধ্বংস করেছেন।
৭. জিয়া ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু করেছেন।
৮. জিয়া ক্যাঙ্গারু কোর্টের মাধ্যমে অনেককে ফাঁসি দিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবারের রায়ে বলা হয়, "জিয়া ক্ষমতায় আসার পর ক্যাঙ্গারু কোর্টের রায়ে কর্নেল তাহেরসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল। এসব কর্মকাণ্ডকে কোনভাবেই মার্জনা করা যায় না।" আমি প্রথমেই বলেছি যে, এই রায়ের আইনগত এবং সাংবিধানিক দিক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো পরবর্তী কোন এক সময়, যখন পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি আমাদের হাতে আসবে। আজ এই রায়ের দু'টি অংশ নিয়ে আলোচনা করবো। একটি হলো রাজনৈতিক দিক। আরেকটি হলো সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। প্রথমে এই রায়ের রাজনৈতিক অংশ নিয়ে আলোচনা করছি।

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

খবরের কাগজের পাতায় যতোটুকু ছাপা হয়েছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই রায়টি মোটামুটি একটি রাজনীতি বিষয়ক রায়। বলা হয়, "মোশতাক ও জিয়া সামরিক ফরমানবলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসংবলিত সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করেন। এতে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভের মৃত্যু হয়। মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান 'জয় বাংলা' মুছে ফেলা হয়। বাংলাদেশ বেতারকে করা হয় 'রেডিও বাংলাদেশ'। স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন করেন জিয়াউর রহমান। চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়। কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানকে করা হয় মন্ত্রী। পাকিস্তানের সহযোগীদের ছেড়ে দেয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ধ্বংস করে দেন জিয়া। এমনকি বঙ্গবন্ধুর স্বীকৃত খুনিদের পুনর্বাসন করেন। খুনিদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেন।

রায়ের শুরুতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়। আদালত বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এ অঞ্চলের মানুষ এ বিভক্তি মেনে নেয়নি। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের দূরত্ব ছিল এক হাজার মাইল। খুব কম ব্যাপারেই দুই অংশের মানুষের মধ্যে মিল ছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। জাতির জন্য একাত্তরের ২৫ মার্চ কালরাত্রি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম পাঠ করেন এম এ হান্নান। ওই ঘোষণা ২৭ মার্চ কালুরঘাট থেকে দ্বিতীয়বার পাঠ করেন জিয়াউর রহমান।

২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার পক্ষে এম এ হান্নান প্রথম এই ঘোষণা পাঠ করেন। ২৭ মার্চ দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। আদালত বলেছেন, ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী এ দেশের মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশ্ব নেতাদের চাপে পাকিস্তান তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এরপর বঙ্গবন্ধু প্রথমে রাষ্ট্রপতি তারপর প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি তৈরি করেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে চার মূলনীতির মৃত্যু ঘটান খন্দকার মোশতাক এবং তাকে জিয়াউর রহমান সহযোগিতা করেন। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস করতে 'জয় বাংলা' শ্লোগান বাতিল করা হয়। তখন বাংলাদেশ বেতারকে 'রেডিও বাংলাদেশ' করা হয়।

www.pathagar.com

আদালতের রায়ে আরও বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী পাকিস্তান সমর্থনকারী শাহ আজিজুর রহমান, কর্নেল এ এস এম সোলায়মানসহ অনেককে জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করে মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ করে দেন। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরুর জন্য '৭৯ সালে রেফারেন্ডাম দেয়া হয়।

॥ তিন ॥

আলোচনার প্রথমেই বলতে চাই যে, আইনগত বিষয়ে উচ্চ আদালত যখন কোন সিদ্ধান্ত দেয় তখন অন্যান্য মানুষ সেসব প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করলেও তারা সেই রায় মেনে নিতে বাধ্য হন। কারণ, মেনে নেয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। কিন্তু আদালত যদি আইন এবং সংবিধানের বাইরে গিয়ে দেশের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা নিয়ে কোন মন্তব্য করেন তাহলে সে সম্পর্কে মন্তব্য করা দেশপ্রেমিক জনগণের একটি কর্তব্য দাঁড়ায়। এই মামলায় বাদী চট্টগ্রামের সিদ্দিক আহমেদকে ১৯৮৬ সালে একটি হত্যা মামলায় সামরিক আদালত দণ্ড দেয়। বাদীর আর্জিতে সামরিক আদালতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। বাদীর আর্জি হাইকোর্ট গ্রহণ করবেন কিনা সেটি একান্তই তাদের বিষয়। তার শাস্তি বৈধ কি অবৈধ ছিল, সেটিও আদালতের ব্যাপার। যে আদালত তাকে শাস্তি দিয়েছে সেই আদালত যদি অবৈধ বলে বিবেচিত হয় তাহলেও কারো কিছু বলার থাকে না। এভাবে টানতে টানতে এরশাদের সামরিক আইন জারিকে অবৈধ বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা এই মুহূর্তে কোন মন্তব্য করছি না। কিন্তু যে কাজটি বিগত ৬৩ বছরে কেউ কোন দিন করেনি এবং বলেনি সেটিই বলা হয়েছে এবারের রায়ে। রায়ে বলা হয়েছে, "ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এ অঞ্চলের মানুষ এই বিভক্তি মেনে নেয়নি।" হাইকোর্টের এই দুই মহামান্য বিচারপতি এ ব্যাপারে যা বলেছেন সেটি অতীতে বিচার বিভাগের কারো মুখ থেকে বের হয়নি। কে বলেছে যে, এ অঞ্চলের জনগণ ভারত বিভক্তি তথা পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নেয়নি? বরং ইতিহাস বলে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সেদিনের পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) মানুষই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানই পাকিস্তানের দাবিতে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম সিপাহসালার। শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের একশ্রেণীর সামরিক ও

www.pathagar.com

বেসামরিক নেতার অবিচার, বঞ্চনা ও জুলুমের প্রতিবাদে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়। সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরং তাদের ওপর নেমে আসে মিলিটারি ক্র্যাকডাউন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে স্বাধীন হয়।

এটিই হলো সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। মুজিবনগরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়ার সময় অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এই কথাগুলোই বলেছিলেন।

এখন যদি বলা হয় যে, ভারত বিভক্তি সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মেনে নেয়নি তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ায়? তাহলে ৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার জনগণ কি অবিভক্ত ভারতেই থাকতে চেয়েছিলেন? জনগণ না চাইলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তি, বিশেষ করে বাংলার বিভক্তি কার্যকর হলো কিভাবে? বাংলার মানুষ সেই বিভক্তি মেনে না নিলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বা পণ্ডিত নেহেরু তো পূর্ব বাংলাকে ভারতেরই অংশ রাখতেন। সেটি হলো না কেন? (দৈনিক সংগ্রাম : ২৯/০৮/২০১০)

॥ চার ॥

হলো না এই জন্য যে, ৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সেদিনের পূর্ব বাংলার ৯৮ শতাংশ মানুষ মনেপ্রাণে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। আজ যেটি সিলেট সেটি ছিল আসামের একটি অংশ। মওলানা ভাসানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পাকিস্তানের অংশ হয়। এসব জ্বলন্ত সত্য আজ যদি উচ্চ আদালতের দুই মান্যবর বিচারপতি অস্বীকার করেন তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের উত্তরসুরি হিসেবে পৃথক পূর্ববাংলার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। শিক্ষিত সচেতন মানুষ ভেবে অবাক হচ্ছেন যে, একটি খুনের মামলায় এসব প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

এসব কথাতো স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান বলেননি, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনসহ সেই সময়কার আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্বশীল কেউ বলেননি।

শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগ কেউই তো ৭ই মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলেননি। তাহলে এই রায়ে ৭ই মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলা হয় কিভাবে? আরো আছে- রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ, রাষ্ট্রীয় মৌলিক কাঠামো ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান বিচারকরা যা বলছেন তার সাথে সাবেক প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজল বা জাস্টিস সাহাবুদ্দীনের ঐতিহাসিক রায়সমূহের কোনো মিল নেই। বরং সেগুলো সাংঘর্ষিক। এসব প্রশ্ন এবং আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বারান্তরে সেগুলো আলোচনার ইচ্ছে রইল।

www.pathagar.com

১০

এরশাদের বিচার প্রশ্নে আ'লীগ গোঁফ নামিয়েছে

পঞ্চম সংশোধনীর বিরুদ্ধে যখন চূড়ান্ত রায় প্রকাশিত হয় তখন সেক্যুলার, বাম ও আওয়ামী ঘরানার লোকরা সামরিক শাসন জারিকে 'মহাপাপ' বলে গণ্য করেন এবং সামরিক শাসককে 'অবৈধ ক্ষমতা দখলদারী' এবং 'মহাপাপী' বলে ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বিচারের দাবিতেও বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট কাঁপিয়ে তোলেন। কারণ পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে 'মহা অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত হন খন্দকার মোশতাক আহমেদ, বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান। এই তিনজনই তো মারা গেছেন। অতএব এরা এতো দূরও দাবি করলেন যে ওদের মরণোত্তর বিচার করতে হবে। পারলে কবর থেকে তাদের হাড্ডিগুড্ডি খুঁড়ে বের করে বিচার করতে হবে। এরা এতো এ্যাগ্রেসিভ হলেন কেন? ওদের টার্গেট কি তিনজনই ছিল? নাকি দুইজন? সকলেই জানেন যে ওদের টার্গেট ছিল খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান। ওদের ভাষায় এরা তো ক্রিমিনাল(?)। কিন্তু ওরা কি সেদিন জানতেন যে ওদের মধ্যে আরেকজন 'ক্রিমিনাল' (ওদের ভাষায়) লুকিয়ে আছেন? ওদের এই হম্বিতম্বি দেখে অন্তর্যামী আড়ালে মুখ টিপে হাসছিলেন। তিনি ঠিকই জানতেন যে, থলের চতুর্থ বিড়ালটি বের হলে বিচার দাবি করে ওরা যে লম্ফঝম্ফ করছেন সেগুলো ফিউজড হয়ে যাবে। কে তখন জানতো যে চট্টগ্রামের পটিয়ার এক অজপাড়াগাঁয় নীরবে নিভৃতে বাস করছে এক ব্যক্তি। তার নাম সিদ্দিক আহমেদ। এরশাদের সামরিক বিধিতে খুনের মামলায় ওই সিদ্দিক আহমেদের গুরুদণ্ড হয়েছিল। গুরুদণ্ড মাথায় নিয়ে সিদ্দিক পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

সিদ্দিকের কথায় একটু পরে আসছি। পঞ্চম সংশোধনীর রায়ের পর আওয়ামী লীগাররা যখন জিয়া ও মোশতাকের বিচার দাবিতে উচ্চকণ্ঠ, তখন সাংবাদিকরা আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদকে প্রশ্ন করেন যে, যে তিনজন সামরিক শাসকের বিচারের দাবি উঠেছে, ওই তিনজন তো মৃত। আরেক ব্যক্তি তো জিন্দা আছেন, তিনি হলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনিও তো সামরিক শাসন জারি করেছিলেন। এখন তার কি হবে? চালাকির সাথে আইনমন্ত্রী প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। বলেন যে, এরশাদের সামরিক শাসন নিয়ে তো কোনো মামলা হয়নি। তাই সে ব্যাপারে তো এখন করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু কে সেদিন জানতো যে, হঠাৎ করে দৃশ্যপটে আসবে সিদ্দিক মিয়া? এই সিদ্দিক মিয়া কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী, সপ্তম সংশোধনী, অবৈধ ক্ষমতা দখল ইত্যাদি কিছুই

www.pathagar.com

বুঝতেন না। কে বা কারা তাকে বুদ্ধি দিয়েছে যে, মামলা করলে তার শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। সুতরাং শাস্তি মওকুফ করার জন্য সিদ্দিক আহমেদ একটি মামলা ঠুকে দেন। সেটিই এখন গড়াতে গড়াতে সপ্তম সংশোধনী বাতিলে পর্যবসিত হয় এবং এরশাদ একজন অবৈধ ক্ষমতা দখলদারী হিসেবে চিহ্নিত হন। আগে তিনজনের বিচার নিয়ে এতো লম্ফঝম্ফ! স্বাভাবিকভাবেই দাবি উঠলো, এরশাদেরও বিচার করতে হবে। দেখা গেলো যে এবার অনেকেরই সুর নরম। একযাত্রায় দুইরকম ফল। শুধু তাই নয়, জিয়া এবং এরশাদের মধ্যে কে বড় অপরাধী সেটি মাপার জন্যও আওয়ামীওয়ালারা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসে গেছেন। ঠিক এরই মধ্যে অর্থাৎ রায় বের হওয়ার মাত্র তিন দিনের মাথায় এরশাদ গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরবারে একেবারে তার 'ভগ্নি' বনে গেলেন। আধা ঘণ্টা ধরে তারা একান্ত বৈঠক করেন। বৈঠকের ফলাফল কি? সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে অথবা বেসরকারিভাবে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড থেকে একেবারে স্পিকটি নট। ওদিকে বাজার কিন্তু গুজবে সরগরম। এর মধ্যে এরশাদ ফাটালেন একটি তথ্য বোমা। তাও সেটা ঢাকায় নয়, সুদূর রংপুরে। সেখানে গিয়ে তিনি বললেন, শেখ হাসিনার রাজত্বকালে তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না। গত পহেলা সেপ্টেম্বর দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র প্রধান সংবাদ হিসেবে এই খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরের শিরোনাম, "মহাজোট আমলে মামলা হবে না" প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের কথা ফাঁস করেন এরশাদ। রংপুর থেকে প্রেরিত ওই খবরে বলা হয়েছে, "মহাজোট সরকারের শরিক জাতীয় পার্টির (এ) চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার দলের ঘনিষ্ট নেতাদের কাছে বলেছেন, সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে সরকারিভাবে কোনো মামলা করা হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী তাকে আশ্বস্ত করেছেন। একাধিক সূত্র এ কথা নিশ্চিত করেছে।"

ওই সূত্র জানায়, সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার তিন দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এইচ এম এরশাদের একান্ত বৈঠকে এরশাদ আবেগতাড়িত হয়ে বলেছেন, আমি মহাজোটকে সমর্থন দিয়েছি দল ও নিজের স্বার্থে। সপ্তম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ এবং মহাজোটের শীর্ষ নেতারা আমার বিরুদ্ধে অবৈধ ক্ষমতা দখলের মামলা দায়েরের কথা বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। তারা আর মহাজোটে থাকতে আগ্রহী নয়। বিরোধীদলের আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করে সরকারের পতন হলে জাতীয় পার্টিকে সরকারের প্রধান মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে সমান

www.pathagar.com

সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ওই সূত্র জানায়, এইচ এম এরশাদ প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, "মহাজোট নেত্রী হিসেবে আপনার হস্তক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমি আপনার দফতরে ছুটে এসেছি।" এ সময় প্রধানমন্ত্রী এরশাদকে আশ্বস্ত করেন যে, সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা নিয়ে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে সরকারিভাবে আপনার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে এরশাদ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন।

ওই সূত্র জানায়, তাদের কাছে এরশাদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সারাদেশে বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ও তোলপাড় না করার জন্য এরশাদকে আহ্বান জানালে তিনি এতে সায় দেন। এ কারণে এরশাদ ঢাকা ও রংপুরে মিডিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে রংপুরে তার ঘনিষ্ঠ নেতাদের কাছে বৈঠকের বিষয়বস্তু তিনি তুলে ধরেন।"

॥ দুই ॥

শুধু এইটুকু বলেই এরশাদ ক্ষান্ত হননি। কয়েকদিন আগে এক টেলিভিশন চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "যারা আমার ফাঁসি চায় তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। প্রচলিত আইনে আমার বিচার করা যাবে না। কারণ হাইকোর্ট তার রায়ে বলেছে যে, আমার বিচার করার জন্য সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে। বিচারের জন্য যদি জাতীয় সংসদ নতুন আইন প্রণয়ন করে তাহলে সেই নতুন আইন দিয়ে আমার বিচার করা যাবে না। কারণ আইন বলে যে, যেসময় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই সময়ের আইন দিয়ে বিচার করা যাবে। এরশাদ আরো বলেছেন যে, অপরাধ সংগঘটিত হওয়ার অনেক পরে আইন তৈরি করে সেই আইন দিয়ে অতীতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করা যাবে না। আইনের পরিভাষায় এটিকে Retrospective Effect' অর্থাৎ ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা দেয়া যাবে না। এরশাদ কিন্তু মারত্মক কথা বলেছেন। আইনের যে ব্যাখ্যা এরশাদ দিয়েছেন সেটি সঠিক না বেঠিক তার বিচার করবেন আইনবেত্তারা, বিশেষ করে উচ্চ আদালত। এখানে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। এরশাদের কথা যদি আইনগতভাবে সঠিক হয় তাহলে ১৯৭৩ সালে প্রণীত আইন দিয়ে ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা যাবে না। কারণ সেটি করতে গেলেও তো 'Retrospective Effect' 'ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা' দিতে হবে। যেহেতু এরশাদের ভাষায় সেই কাজটি হবে বেআইনী তাহলে সেই বেআইনী আইন দিয়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিচার হচ্ছে বিভাবে? তাহলে

www.pathagar.com

তাদের বিচার তো বেআইনী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সরকার এখন কি বলবে? আইনমন্ত্রী গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে তারস্বরে জিয়া ও মোশতাকের বিচার চাচ্ছিলেন। বলছিলেন যে, যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা রয়েছে, তাই তাদের বিচার করতে অসুবিধা নেই। এখন সেই একই আইনমন্ত্রী এরশাদের বেলায় সুর পাল্টে ফেলেছেন। এখন তিনি বলছেন যে, যেহেতু এরশাদের বিচার করার জন্য হাইকোর্ট নতুন করে আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদকে বলেছে, তাই সেই আইন প্রণয়ন করার আগে এরশাদের বিচার করা সম্ভব নয়। সেই আইন প্রণয়ন করলে তার 'Retrospective Effect' দেয়া যাবে কি না, সেটিও আইনগতভাবে বিবেচনা করতে হবে।

॥ তিন ॥

কিন্তু একশ্রেণীর নামকরা আইনবিদ বলেছেন যে, দেশের বিদ্যমান আইনে এরশাদের বিচার করা সম্ভব। কারণ তিনি হাইকোর্টের রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সেই রায়টিকে তিনি মেনে নিয়েছেন। যে উদ্দেশ্য এবং যে কৌশল নিয়েই এরশাদ এই রায়কে অভিনন্দন জানিয়ে থাকুন না কেন, তিনি তো এই রায়কে মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি যে একজন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সেটা তিনি নিজেই নিজের মুখে কবুল করেছেন। এরপরে আর দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার করতে বাধা কোথায়? বাধা যে কোথায় সেটা দেশের সচেতন মানুষের কাছে আর অস্পষ্ট থাকেনি। আওয়ামী লীগ আর এরশাদের সখ্যতা তো নতুন কিছু নয়। '৮২ সালে এরশাদের সামরিক শাসন জারিকে শেখ হাসিনা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলো বিএনপি। সেই বিএনপিকে এরশাদ চরম বেআইনীভাবে বন্দুকের জোরে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়। তাই এই ফর্মুলায় সেদিন থেকে আওয়ামী লীগের বন্ধু হয়ে গেছেন এরশাদ। এই শেখ হাসিনাই ১৯৮৬ সালে বলেছিলেন যে, এরশাদের অধীনে যারা নির্বাচন করবে তারা হবে 'জাতীয় বেঈমান'। সেই হাসিনাই এই ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজের কথা গিলে ফেলেন এবং নির্বাচনে যান। সুতরাং তারই দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী অতঃপর জাতীয় বেঈমান কে হতে পারে, সেটা বুঝতে আর জনগণের কোনো অসুবিধা হয় না। সেই থেকে এই সখ্যতা চলে আসছে।

এখন কপালের ফের যে অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের তালিকায় এরশাদের নামও এসে গেলো। এভাবে যে এরশাদের নাম এসে যাবে সেটা তো শেখ হাসিনা ভাবতেও পারেননি। কিন্তু এসে যখন গেছেই তখন তাকে তো বাঁচাতে হবে। সে জন্যই এখন

www.pathagar.com

সামরিক একনায়কদের বিচারের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ গোঁফ নামিয়েছে। ওই দিকে এই রায়ের পরেও এরশাদ সমানে কথা বলে যাচ্ছেন। বলছেন যে, তিনি জোর করে ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। বিচারপতি প্রেসিডেন্ট সাত্তার স্বেচ্ছায় তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাই যদি হয় তাহলে তিনি ক্ষমতার অবৈধ দখলদার হিসেবে হাইকোর্ট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন কিভাবে? আর তার এসব উক্তি আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না কেন? এভাবে যদি এরশাদ নিজের সাফাই গাইতে চান তাহলে তার সবচেয়ে বড় এবং যথাযোগ্য ফোরাম হলো আপিল বিভাগ। তিনি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করে সেখানে শুনানির সময় এসব কথা বলতে পারেন। সামরিক শাসনের পক্ষে এরশাদ যদি এসব কথা বলতে পারেন তাহলে খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের তো আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক কথা বলার থাকতে পারে। আফসোস, ওরা তিনজনই আজ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এরশাদ এখনও বেঁচে আছেন। তারপরেও যদি বাধাহীনভাবে তিনি এসব কথা বলে যেতে থাকেন তাহলে ওই তিনজনের পক্ষে অন্যেরা যদি কথা বলেন তাহলে কি সেটা দোষের হবে? তাহলে কি সেটা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়বে?

বিচারপতি সাত্তার স্বেচ্ছায় এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেননি। এরশাদ ধীরে ধীরে চক্রান্তের জাল বুনেছেন এবং যখন তিনি সময়কে তার অনুকূল মনে করেছেন ঠিক তখন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। ক্ষমতা দখলে এরশাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রেখে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

www.pathagar.com

(১১)

সপ্তম সংশোধনীর রায়ে বাংলা ভাগ : নেহরুই বাংলা ভাগের জন্য দায়ী

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ কমন্স সভায় প্রাইম মিনিস্টার এবং লর্ডসভার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্তির পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেসব প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেই সব এলাকা নিয়ে গঠিত হবে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান। হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলো নিয়ে গঠিত হবে ভারত। অবশ্য এর সাথে আবার ভৌগোলিক সংলগ্নতার একটি শর্তও জুড়ে দেয়া হয়। তখন পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলা অবিভক্ত ছিলো। বাংলা এবং পাঞ্জাব উভয় প্রদেশেই ছিলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সুতরাং সমগ্র অবিভক্ত পাঞ্জাব এবং সমগ্র অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেটি হয়নি। পাঞ্জাব ভাগ হয়ে হলো-পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাব এবং বাংলা ভাগ হয়ে হলো পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা। পাঞ্জাবের আলোচনা আজ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তাই আমরা বাংলা বিভক্তির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। সেদিন যদি বাংলা অবিভক্ত থাকতো তাহলে ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম তার মধ্যে আজকের ভারতীয় বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেরও অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা ছিলো। কিন্তু সেটি হলো না। কেন হলো না? সেটি এখন অতীত দিনের কথা। সেই কথাটি নিয়ে জাবর কেটে লাভ নেই। কারণ পশ্চিম বাংলা তো আর বাংলাদেশে যোগদান করে বৃহত্তর বাংলা গঠন করবে না। কিন্তু তারপরেও এই কথাটি আর কেউ তোলেনি, তুলেছেন মান্যবর হাইকোর্ট। তুলেছেন সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায় দেয়ার সময়। রায়ে ৭০ বছর আগের ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তাই তখনকার ইতিহাসকে তার সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসা জাতির দায়িত্ব। প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। এটি ৭০ বছর আগের ইতিহাস। সেই ইতিহাস যারা অবলোকন করেছেন তারা যদি ইতিহাসের সাক্ষী হতে চান, তাহলে তাদের সেই সময় অন্তত ৩০ বছর বয়সী হতে হবে। সুতরাং ওই সময় যার বয়স হয়েছিলো ৩০ বছর আজ তার বয়স হবে ১০০ বছর। ১০০ বছর বয়সী অর্থাৎ শতায়ু কোনো ব্যক্তি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। আর বেঁচে থাকলেও ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার মতো অবস্থা তার নেই। তাই আমাদেরকে পুরাতন দলিলপত্রের ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

॥ দুই ॥

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় মুসলিম লীগ। এর আগে ভারতের কেন্দ্রীয় সংসদ অর্থাৎ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয়। এখানে মুসলমানদের

www.pathagar.com

জন্য সংরক্ষিত ছিলো ৩০টি আসন। এই ৩০টি আসনেই জয়লাভ করে মুসলিম লীগ। তারা মুসলমানদের মোট ভোটের ৮৬ শতাংশ ভোট লাভ করেন। প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিলো ৪৯৫টি আসন। এখানে মুসলিম লীগ লাভ করে ৪২৩টি আসন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশেও মুসলিম লীগ বিপুল বিজয় লাভ করে। ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দু প্রধান প্রদেশে কংগ্রেস বিপুল বিজয় লাভ করে। এই দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ছিলো ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতকে অখণ্ড রাখা। পক্ষান্তরে, মুসলিম লীগের প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ছিলো মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা, যার নাম হবে পাকিস্তান। এই নির্বাচনের মাধ্যমে এই বিষয়টি শুধুমাত্র প্রমাণিত নয়, রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে, সারা ভারতে হিন্দুদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হলো কংগ্রেস এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন হলো মুসলিম লীগ। মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সেই দলের নেতা। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সেই রাজনৈতিক দলের অবিসংবাদিত নেতা।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনটি ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সপক্ষে জনগণের রায়। পূর্বাঞ্চলে বাংলা ছিলো অখণ্ড। অখণ্ড বাংলায় মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মুসলিম লীগ নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বিরোধী দলে বসে কংগ্রেস। প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন বাবু কিরণ শংকর রায়। সংসদের বাইরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আপন ভাই শরৎ চন্দ্র বসু। অন্যদিকে শাসক দল মুসলিম লীগের প্রাদেশিক শাখা অর্থাৎ বেঙ্গল মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন জনাব আবুল হাশিম। সেই সময় অবিভক্ত বাংলায় মোট জনসংখ্যার ৫৫.২৯ শতাংশ ছিলেন মুসলমান। অবশিষ্ট ৪৪.৭১ শতাংশ ছিলেন হিন্দু। সুতরাং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং মুসলিম লীগ নেতা জনাব আবুল হাশিম লাহোর প্রস্তাবের আলোকে স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তবাংলা বা অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। তার এই আন্দোলনে তাকে সক্রিয় সমর্থন দান করেন কংগ্রেস নেতা শরৎ চন্দ্র বসু এবং সংসদের অভ্যন্তরে বিরোধী দলীয় নেতা বাবু কিরণ শংকর রায়। সোহরাওয়ার্দী তার স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য তার নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিকট থেকে অনুমোদন চান। সমগ্র মুসলিম লীগের তরফ থেকে নেতা মিঃ জিন্নাহ তৎক্ষণাৎ

www.pathagar.com

স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধীন সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অনুমতি প্রদান করেন। মিঃ জিন্নাহর এই অনুমোদনের ফলে বাংলার মানুষের মাঝে এই মর্মে বিপুল আশাবাদের সঞ্চার হয় যে, ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হয়তো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

॥ তিন ॥

সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কংগ্রেসেরও অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। সেই অনুযায়ী প্রাদেশিক অর্থাৎ বঙ্গীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে দিল্লীতে কংগ্রেস হাই কমান্ডের কাছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমর্থনদানের জন্য কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহেরুকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু জনগণের নেতা বলে পরিচিত কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কিরণ শংকরের কাছে যে পত্র দেন সেই পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার মানুষের, বিশেষ করে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ দিল্লী ও কলিকাতা থেকে যুগপৎ প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'স্টেটসম্যানে' ওই পত্রটির ফটোকপি ছাপা হয়। বাংলাদেশে একই বছরের ১১ আগস্ট অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক 'বাংলাদেশ টাইমসে' ওই পত্রটি ছাপা হয়েছিল। নিম্নে পত্রটি হুবহু তুলে দেয়া হলো–

New Delhi, 17.5.47

My dear Kiran,

We are gradually or rather rapidly approaching the state of final decision in regard to our immediate future and we should be quite clear in our minds as to what our attitude should be. I am certain that the various proposals put forward by Suhrawardy for a limited, independent Bengal plus joint electorates plus fifty fifty are dangerous from the point of view of both Bengal and India. Those or similar proposals can only be accepted on the basis they will lead to infinite troubles and for greater difficulties in the way of future union with India. You will remember the talk we had at Maulanas place sometime back. I hold to that and I am more convinced than ever that we must stick to our guns. If there is no union of Bengal as a whole into India. then there must be a partition of Bengal and Western Bengal must join the union; This will surely lead to East Bengal also joining the Union before long.

In the crucial days to come I hope Congressmen in Bengal will hold fast together and stand for this position.

I am entirely opposed to the stand of Calcutta being a so-called free city.

Yours sincerely

Jawaharlal Nehru

চিঠির বাংলা অনুবাদ

নয়াদিল্লী, ১৭ই মে ১৯৪৭

www.pathagar.com

প্রিয় কিরণ,

আমাদের আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে আমরা ধীরে ধীরে, বরং বলা যায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের মনে এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে। আমি এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী যে সমস্ত প্রস্তাব ইতোমধ্যে উত্থাপন করেছেন সেগুলো ভারত এবং বাংলার ভবিষ্যতের জন্য খুবই বিপজ্জনক। জনাব সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে রয়েছে স্বাধীন বাংলা, যুক্ত নির্বাচন এবং ৫০:৫০ অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা সাম্য। জনাব সোহরাওয়ার্দীর এসব প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে যদি বাংলা ভারতের সাথে যোগ দেয়। ভারতের সাথে যোগ না দিয়ে অন্য যে কোন ভিত্তিতে এসব প্রস্তাব যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে বাংলা কর্তৃক ভবিষ্যতে ভারতভুক্তির পথে আরো বড় ধরনের অসুবিধা এবং অনন্ত সমস্যার সৃষ্টি হবে। মওলানা সাহেবের বাসভবনে কিছুদিন আগে আপনার সাথে আমার যে কথা হয়েছিল সেসব কথা হয়তো আপনার মনে আছে। আমি এখনও আমার ওই মতের প্রতি অবিচল। এখন আগের চেয়েও আমার আরো বেশি করে বিশ্বাস হচ্ছে যে, আমাদের দাবির প্রতি আমাদের অনড় থাকতে হবে। যদি সমগ্র বাংলা ভারতের সাথে যোগ না দেয় তাহলে বাংলাকে ভাগ করতেই হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই ভারতে যোগ দিতে হবে। যদি এটা ঘটে অর্থাৎ বাংলা ভাগ হয় এবং পশ্চিম বাংলা ভারতে যোগ দেয় তাহলে আর বেশি দিন লাগবে না যেদিন পূর্ববঙ্গও ভারতে যোগ দেবে।

আমি আশা করি আগামী দিনের সংকট সন্ধিক্ষণের মুহূর্তগুলোতে বাংলার কংগ্রেস সদস্যরা আরো বেশি করে ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং এই দাবির প্রতি অবিচল থাকবেন।

কলকাতাকে তথাকথিত ফ্রি সিটি বা মুক্ত নগরী করার দাবির আমি সম্পূর্ণ বিরোধী।

আপনার-

জওহরলাল নেহেরু

যদি সেদিন সোহরাওয়ার্দী বর্ণিত বৃহত্তর বাংলা গঠিত হতো তাহলে আজকের বাংলাদেশও গঠিত হতো ওই অখণ্ড বাংলা নিয়েই। কেন হল না? মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বনগাঁও, বশিরহাট, বারাসাত, পার্বত্য ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, সিলেটের করিমগঞ্জ এবং আসামের কাছাড়, হাইলকান্দি ও ধুবড়ি ছাড়া পোকায় খাওয়া পূর্ব বাংলা আমরা পেলাম কেন? পেলাম এ জন্য যে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজেদেরকে প্রথমে বাঙ্গালী হিসেবে গণ্য করেনি। প্রথম বিবেচনায় এনেছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অর্থাৎ তারা হিন্দু এবং সেই হিন্দুত্ব বিশাল ভারতের অবশিষ্টাংশের সাথে অধিকতর একাত্মতা বোধ করেছে। করেছে বলেই বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে অর্থাৎ হিন্দু হওয়ার কারণে তারা বৃহত্তর বাংলায় শামিল হয়নি। বরং

www.pathagar.com

যশোর, দিনাজপুরসহ অনেক জেলাকে কর্তন করেছে। ৪৭ সালে খণ্ডিত বাংলার একাংশ যোগ দিল পাকিস্তানে, অপর অংশ ভারতে।

॥ চার ॥

পণ্ডিত নেহেরুর এই পত্রের পর আর নতুন করে কিছু বলার থাকে না। কংগ্রেস হাইকমান্ডের এই নির্দেশ আসার পর সারা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায় সভা সমিতি করে যুক্তবাংলার বিরুদ্ধে এবং বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে অসংখ্য মিছিল করেন এবং কয়েকশত জনসভা করেন। আজকের এই লেখাটি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে ওই সব তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা সম্ভব হলো না। তবে শেষ করার আগে শুধু একটি কথা বলতে চাই-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলো যদি পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা হয় তাহলে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া বাংলাদেশে যুক্ত হলো না কেন? ব্রিটিশ সরকারের ৩রা জুনের ভারত বিভক্তি প্ল্যান অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের যেসব এলাকা নিয়ে সেদিনের পূর্ব বাংলা বা আজকের বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার কথা ছিল সেগুলো হলো- ১. চট্টগ্রাম, ২. বরিশাল, ৩. নোয়াখালী, ৪. ফরিদপুর, ৫. ঢাকা, ৬. পাবনা, ৭. বগুড়া, ৮. রাজশাহী, ৯. রংপুর, ১০. ময়মনসিংহ (টাঙ্গাইলসহ), ১১. দিনাজপুর (ভারতীয় দিনাজপুরসহ), ১২. মালদহ, ১৩. মুর্শিদাবাদ, ১৪. নদীয়া, ১৫. যশোর (বনগাঁওসহ), ১৬. কুমিল্লা (ত্রিপুরা জেলা), ১৭, সিলেট (করিমগঞ্জসহ), ১৮. আসামের কাছাড়, ধুবড়ী ও হাইলাকান্দি। কিন্তু আমরা বনগাঁ, বশিরহাট, বারাসাত, করিমগঞ্জ, কাছাড়, ধুবড়ী, হাইলাকান্দি প্রভৃতি মহকুমা/অঞ্চল পাইনি। কেন পাইনি? সেটি একটি লম্বা কাহিনী। আজ শুধু এটুকু বলা যায় যে, এগুলো ছিলো আমাদের ন্যায্য পাওনা। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন, স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ এবং নেহেরু প্যাটেল চক্রের ষড়যন্ত্রে আমাদেরকে সেই সব এলাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

ওপরে যতোগুলো কথা বলা হয় তার সবগুলোর সপক্ষে আমাদের কাছে গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক দলিলপত্র রয়েছে। আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের একটি মন্তব্য দিয়ে শেষ করছি। তিনি বলেছেন, সরকারের সব কাজে উচ্চ আদালত নাক গলাবে কিনা সেটি তাদেরকে আরেকবার ভেবে দেখতে হবে। নীতি নির্ধারণী কাজ হলো সরকারের, উচ্চ আদালতের নয়। বাংলাদেশেও ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি হলো গবেষক, ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিবিদদের, উচ্চ আদালতের নয়।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০)

www.pathagar.com

(১২)

ইসলামী রাজনীতি এবং সেক্যুলারিজম নিয়ে ভিন্নমত

২০০৫ সালে হাইকোর্ট পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষণা করে। অতঃপর তৎকালীন সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করে। আপিলটি ৪ বছর ঝুলে ছিল। গত ৩ মে আপিল বিভাগে সরকার পক্ষ জানায় যে, তারা এই মামলাটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। ঐদিকে পূর্ববর্তী সরকারের আপিলের কারণে হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা আপিল বিভাগ স্থগিত রাখে। এখন সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে গত ৩ জানুয়ারি হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার করেছে আপিল বিভাগ। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী সরকারের আপিলটি প্রত্যাহার করায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং আরো ৩ জন আইনজীবী। খন্দকার দেলোয়ারের লিভ টু আপিলের শুনানি গ্রহণ করা হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি। এই পটভূমিতে প্রশ্ন উঠেছে যে, এখন কি হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করা যাবে? নাকি লিভ টু আপিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করা যাবে না?

আইনমন্ত্রীর ব্যাখ্যা

গত সোমবার এ সম্পর্কে আইনমন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে ব্যাখ্যা পড়ার পর ধারণা করা যায় যে, আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় সমুন্নত রাখবেন বলে আইনমন্ত্রী আশাবাদী। এছাড়া হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশটি আপিল বিভাগ তুলে নিয়েছেন। এই কাজটি ইঙ্গিতময় বলে অনেকেই মনে করেন। যাই হোক, সুপ্রীম কোর্ট যদি আপিল বিভাগের রায়টি বহাল রাখেন তাহলে আগামী দিনের চালচিত্র কি হতে পারে, সে সম্পর্কে এখন থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছে। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে আগামী দিনের চালচিত্রটি নিম্নরূপ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে–

১. পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ফিরে আসবে না, কিংবা একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থাও ফিরে আসবে না। কারণ, পঞ্চম সংশোধনীতে এই উভয় ব্যবস্থা বাতিল হলেও ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতি পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৯১ সালে গঠিত পার্লামেন্টে সর্বদলীয়ভাবে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুতরাং পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলেও সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর কারণে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ও বাকশাল ফিরে আসছে না।

২. 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর অংশ নয়। তাই সেটিও বহাল থাকবে।

www.pathagar.com

৩. ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে অক্ষত থাকবে। কারণ পঞ্চম সংশোধনীর অধীনে যে সময়টাকে আনা হয়েছে সেটি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে '৮০ দশকে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে। ঐ সময়টি পঞ্চম সংশোধনী কাভার করে না। তাই পবিত্র ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে থেকে যাবে।

যেগুলো বাতিল হবে :

১. পঞ্চম সংশোধনীতে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আমূল পরিবর্তন করা হয়। আদি সংবিধানের অষ্টম, নবম ও দশম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– এই নীতিসমূহকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে। দশম অনুচ্ছেদে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। ১২ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য চারটি পদক্ষেপের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে উল্লেখিত অনুচ্ছেদসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এবং সমাজতন্ত্র বলতে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' বলা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা শীর্ষক ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়েছে।

ধর্মীয় দল নিষিদ্ধকরণ

১৯৭২-এর সংবিধানে বলা হয়েছে, 'ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার কোনো ব্যক্তির থাকিবে না।' পঞ্চম সংশোধনীতে ৩৮ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকে বর্ণিত এই অংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধর্মীয় নামযুক্ত দলগুলো রাজনীতি করার অধিকার লাভ করেছে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে ৩৮ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় স্তবকে বর্ণিত এই অংশটি আবার ফিরে আসবে। ফলে ধর্মভিত্তিক দলগুলো রাজনীতির অধিকার হারাবে, অর্থাৎ, ধর্মভিত্তিক দলগুলো নিষিদ্ধ হবে।

উপরের এই আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আপিল বিভাগ যদি হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে তাহলে–

১. 'বিসমিল্লাহ' বাদ যাবে না, ২. রাষ্ট্রধর্ম অক্ষত থাকবে, ৩. সমাজতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হবে, ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসবে এবং ৫. ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া

আইনমন্ত্রীর উপরিউক্ত মন্তব্যের পর বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনোরকম মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তাদের মত হলো এই যে, আগামী ১৮ জানুয়ারি লিভ টু আপীলের শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। শুনানি শেষ হওয়ার পর আপিল বিভাগে রায়

www.pathagar.com

ঘোষিত হবে। যতক্ষণ না সেই রায়টি ঘোষিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি সাব জুডিস বা বিচারাধীন রয়েছে। বিচারাধীন কোনো বিষয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন যে, তাদের যা বলার সেটা শুনানির সময়েই বলবেন। বিচারপতি টি এইচ খান বলেন যে, ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যে পার্লামেন্ট গঠিত হয়, সেই পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে। ফলে এটি সংবিধানের অংশে পরিণত হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগ পার্লামেন্টের অনুমোদিত আইন বা সংশোধনী বাতিল করতে পারে কিনা সেটি আগে স্থির করা উচিত। এছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ সারাদেশে অনুষ্ঠিত গণভোটে অনুমোদিত হয়েছে। সংবিধানে গণভোটের ব্যবস্থা নেই– এই যুক্তিতে গণভোটের রায় হাইকোর্ট বাতিল করতে পারে কিনা সেটিও আগে স্থির করা উচিত।

ইসলামী দলসমূহের প্রচণ্ড বিরোধিতা

আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর দেশের প্রত্যেকটি ইসলামী দল তার মন্তব্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে। নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, জামায়াতে ইসলামীসহ সমস্ত দল কঠোর ভূমিকা গ্রহণের অঙ্গীকার করেছে। তারা বলেছেন যে, ইসলামী দলগুলো যদি নিষিদ্ধ হয় তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সেটি প্রতিহত করবেন।

জাতীয় পার্টির শর্তসাপেক্ষ সমর্থন

গত বুধবার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ বলেছেন যে, সংবিধানে যদি 'বিসমিল্লাহ' ও রাষ্ট্রধর্ম অক্ষুন্ন থাকে তাহলে ১৯৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে তার কোনো আপত্তি নেই। এই দু'টি বিষয় শর্তসাপেক্ষ করায় তিনি এক শ্রেণীর মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। কিন্তু যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম 'ইসলাম' সেদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা কিভাবে রাষ্ট্রের মূলনীতি হতে পারে? সেটি অনেকেরই বোধগম্য নয়। যখন রাষ্ট্রধর্ম বিলটি জাতীয় সংসদে আলোচিত হচ্ছিল তখন এরশাদ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ জাতীয় পার্টির অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেদিন তিনি রাষ্ট্রধর্মের পক্ষে বলতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে 'সমাজতন্ত্র' এবং 'গণতন্ত্র' কিভাবে সহাবস্থান করতে পারে সেটিও অনেকের কাছে একটি বিরাট প্রশ্ন রয়ে গেছে। এ সমস্ত জ্বলন্ত প্রশ্নের সুরাহা না করে ইসলামী দলসমূহকে নিষিদ্ধ করলে অথবা শর্তহীনভাবে ১৯৭২-এর সংবিধানে ফিরে গেলে গুরুতর সাংবিধানিক সংকটের সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। (ইনকিলাব– ০৮/০১/২০১০)

www.pathagar.com

(১৩)

বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা

দেশের দুইটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকার তার রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই দুইটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের একটি হল সুপ্রীম কোর্ট এবং অপরটি হলো নির্বাচন কমিশন। সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে সংবিধানের খোল-নলচা পাল্টে ফেলা হয়েছে। এমনভাবে পাল্টানো হয়েছে যাতে করে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দলগুলোর রাজনৈতিক আদর্শ নস্যাৎ হয়ে যায়। ৫ম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে দেশে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শকে সমুন্নত করা হয়েছে। এসব আদর্শ হলো (১) ধর্মনিরপেক্ষতা, (২) সমাজতন্ত্র এবং (৩) বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী। ইসলামী ও আধিপত্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ঘরানার আদর্শকে নির্মূল করা হয়েছে। এসব আদর্শ হলো (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান, (২) ইনসাফের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং (৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এই সব কাজ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় সংসদের র‍্যাটিফিকেশন অথবা মতামতের জন্য সুপ্রীম কোর্ট বসে থাকেননি। দায়িত্বভার গ্রহণ ও সাংবাদিক সম্মেলন করার মাধ্যমে নতুন প্রধান বিচারপতি যে মতামত দিয়েছেন মাত্র চার দিনের মাথায় হাইকোর্ট সেটি কার্যকর করেছে। ১লা অক্টোবর প্রধান বিচারপতি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং ৪ঠা অক্টোবর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে' রূপান্তরিত হয়েছে। আর তাদের সেই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে বোরখা ও টুপি পরা সম্পর্কে দেশের লক্ষ লক্ষ ওলামা মাশায়েখ এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লির চিন্তা-চেতনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক রায় দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগে গৃহবিবাদ

রাজনৈতিক বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে দেশের জাতীয় সংসদ সব বিষয়ে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। প্রায় তিন মাস আগে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সামনে রেখে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য যে বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটিরও এখন বলতে গেলে কোনই কাজ থাকলো না। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সংবিধান বদলে গেলো। সেই বদলে যাওয়া সংবিধান মুদ্রণ করছে আইন মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের আর কিইবা করার রইলো? তাই জনাব তোফায়েল আহমেদ, আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্তরা বলছেন যে, সংবিধান সংশোধন করবে পার্লামেন্ট। সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা এখানে হলো পরামর্শকের।

www.pathagar.com

ঐ দিকে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে দেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে চাচ্ছে হাসিনা সরকার। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সরকারের এই দূরভিসন্ধিমূলক কাজের হাতিয়ার হতে প্রস্তুত নয়। তাই অন্যতম নির্বাচন কমিশনার জনাব সাখাওয়াত হোসেন সাফ জবাব দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব হলো সরকারের। নির্বাচন কমিশনের কাজ হলো রাজনৈতিক দলগুলোকে নিবন্ধন দেয়া। এই নিবন্ধন জড়িত নির্বাচনের সাথে। কারণ যেসব দলকে নিবন্ধন দেয়া হবে না তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। তিনি আরো বলেছেন যে, নতুন করে মুদ্রিত সংবিধান তাদের হাতে এলে শুধুমাত্র ইসলামী দলসমূহ কেন, সব রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করা হবে। পর্যালোচনার পর যদি দেখা যায় যে, কোন গঠনতন্ত্র সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তাহলে সেইসব দলকে তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে বলা হবে।

সংসদ এবং সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকায় মতদ্বৈধতার সুর

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সংবিধান সংশোধন এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্ট ও জাতীয় সংসদের অবস্থানে মতপার্থক্য রয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের মতে এটি হলো ক্ষমতার বিভাজনের প্রশ্ন। একটি রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে দুটি অঙ্গের এমন প্রকাশ্য মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটেছে ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় থেকে। সেই রায়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন হাইকোর্ট বিভাগের তৎকালীন বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক। প্রধান বিচারপতি জনাব এবিএম খায়রুল হক রিটায়ার করবেন আগামী বছরের ১৬ মে তারিখে। সবকিছু ঠিক থাকলে দেশের পরবর্তী নির্বাচনের জন্য ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হবে। দুইজন বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে জনাব খায়রুল হককে প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আমি সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলার' গত সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টিকে যত সোজা মনে করছে, বিষয়টি তত সোজা নয়। এবার জনাব খায়রুল হক সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে জ্যেষ্ঠতার তালিকায় তৃতীয় স্থানে ছিলেন। তার ওপরে ছিলেন বিচারপতি এমএ মতিন এবং বিচারপতি শাহ আবু নাইম মোহাম্মদ মমিনুর রহমান। জনাব মতিন আগামী ডিসেম্বরে অবসরে যাচ্ছেন। জনাব শাহ আবু নাইম আগামী বছর অর্থাৎ ২০১১ সালের ১৪ই নভেম্বর রিটায়ার করবেন। এর অর্থ হলো এই যে, আগামী ১৬ই মে প্রধান বিচারপতি হিসেবে জনাব খায়রুল হক অবসরে গেলে জনাব শাহ আবু নাইম জ্যেষ্ঠতার তালিকায় এক নম্বরে থাকবেন। শেখ হাসিনার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান কি এই সিনিয়রমোস্ট বিচারপতিকে দ্বিতীয়বার টপকিয়ে জনাব মোজাম্মেল হোসেনকে প্রধান বিচারপতি বানাবেন? তাহলে কিন্তু জনাব মমিনুর

www.pathagar.com

রহমানকে দ্বিতীয়বার সুপারসীড করা হবে। হাসিনার সরকার কি তেমন নগ্নভাবে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের মাননীয় বিচারপতিদের জ্যেষ্ঠতা লংঘন করবেন? যদি সেই কাজটি তিনি করেন তাহলে তার সেই অ্যাকশনের জন্য দলীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবেন জনাব খায়রুল হক। এমনটিই ঘটেছিল প্রধান বিচারপতি (অব.) কে এম হাসানের বেলায়। সকলেই বলতেন যে, তিনি সৎ এবং দক্ষ। কিন্তু বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭-তে কেন বৃদ্ধি করা হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আওয়ামী লীগ। সেদিন তারা বলেছিল যে, যেহেতু জনাব হাসান বিএনপি পন্থী এবং আওয়ামী বিরোধী তাই বয়স বাড়িয়ে তাকে প্রধান উপদেষ্টা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন আওয়ামী লীগ এই ইস্যুটিকে রাজপথে নিয়ে এসেছিল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত এবং নিজে দারুণভাবে বিতর্কিত হয়ে যাচ্ছেন দেখে বিচারপতি কেএম হাসান সেদিন প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন। এখন যদি জনাব মমিনুর রহমানকে দ্বিতীয়বার সুপারসীড করা হয় এবং জনাব খায়রুল হককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করার ঘোষণা দেয়া হয় তাহলে ২০১২ সালের শেষে বিএনপি এবং অন্যান্য আওয়ামী বিরোধী শক্তিও যে ২০০৬ সালের আওয়ামী লীগ স্টাইলে রাজপথে নামবে না, সেই গ্যারান্টি কে দিতে পারে? আগামী বছরের ১৬ই মে'র পর থেকে জনাব খায়রুল হক কিন্তু অবসরে গিয়ে দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের মত জীবন যাপন করবেন। তখন কিন্তু তার সম্পর্কে কথা বলার সময় মানুষ আর আদালত অবমাননার ভয় করবে না। এই পথ তো দেখিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ। জনাব এমএ আজিজ যখন আপিল বিভাগের বিচারপতি থাকা অবস্থাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ তাকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। এখন বাংলাদেশে কতগুলো ঘটনা এমন দ্রুতগতিতে ঘটছে যে, সেগুলোর পরিণতিতে ২০১২ সালের শেষ দিকে হয়তো ২০০৬ সালের শেষ প্রান্তিকের সহিংস ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। প্রধান বিচারপতি জনাব এবিএম খায়রুল হকের সামনে আগামীতে একটি অগ্নিপরীক্ষা হলো, ঐ দুই বিচারপতিকে শপথ গ্রহণ করানো বা না করানো। যে দুই ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম শপথ বাক্য পাঠ করাননি, এখন জনাব খায়রুল হক যদি ঐ দুই বিতর্কিত ব্যক্তিকে শপথ বাক্য পাঠ করান তাহলে আইনজীবীরা রাজপথে নামবেন বলে সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন হুমকি দিয়েছেন।

ঐদিকে আপিল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা এখন মাত্র ৫ জন। এরা হলেন–

১. প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক
২. বিচারপতি আব্দুল মতিন

www.pathagar.com

৩. বিচারপতি শাহ আবু নাইম ম. মমিনুর রহমান
৪. বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন
৫. বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা।

দুই বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ফলে বিচারপতি মতিন এবং বিচারপতি নাইম লম্বা ছুটিতে গেছেন। ফলে এখন আপিল বিভাগে সক্রিয় রয়েছেন মাত্র ৩ জন বিচারপতি। এই মুহূর্তে আপিল বিভাগের প্রশাসনিক অরগানোগ্রাম অনুযায়ী মোট বিচারপতির সংখ্যা ১১ জন। অর্থাৎ এখন কম করে হলেও ৭ জন এবং উর্ধ্বে ৮ জন বিচারপতি নিয়োগের সুযোগ রয়েছে। বলাবাহুল্য, এরা সকলেই হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রমোশন পেয়ে আসবেন। এই ৭ জন বা ৮ জন নতুন বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকার যদি জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে দলীয় লোকদেরকে আপিল বিভাগের বিচারপতি পদে বসায় তাহলেও সেই বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে বার সমিতি আন্দোলন করবেন বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

সংসদ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কর্তৃত্বের লড়াই

সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে দেশের জাতীয় সংসদ এবং বিচার বিভাগ বিশেষ করে সর্বোচ্চ আদালতের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ অথবা প্রকাশ্য মতদ্বৈধতার সব রকম আলামত পাওয়া যাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ ৫ম সংশোধনী সম্পর্কে কয়েকটি ছোটখাট সংশোধনসহ হাইকোর্ট বিভাগের রায়কে সমুন্নত করেছেন। ৫ম সংশোধনী বাতিলের ঐ রায়টি ঘোষণা করেছিলেন সেই সময় অর্থাৎ ২০০৫ সালে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি জনাব এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি জনাব ফজলে কবীর। ২ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগের রায় প্রকাশিত হওয়ার পর পরই প্রবীণ আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এই মর্মে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, আপিল বিভাগের রায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সেই রায়টি কার্যকর বা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। এখন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারকে ঐ রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান মুদ্রণ করতে হবে। তার এই মত সমর্থন করেছেন ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম এবং আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। অথচ দেখা গেলো যে, সরকার বেগম সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারম্যান এবং বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে সংবিধানের সংশোধন বা পরিমার্জন করার জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে। আইন বিষয়ে যারা কিছুটা সচেতন তারা এই সংসদীয় কমিটি গঠনকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের এই ভিন্নতার উৎপত্তি হয় সুরঞ্জিত বাবুর কয়েকটি মন্তব্য থেকে। সুরঞ্জিত বাবু বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের কাজ সুপ্রীম কোর্ট করেছে। কিন্তু দেশের আইন প্রণয়ন এবং সংবিধান সংশোধন করার ব্যাপারে জাতীয় সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তারা সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করবেন। তিনি আরো বলেন, সংবিধানকে যুগোপযোগী করার জন্য তারা যা যা করা দরকার তার সবই করবে।

www.pathagar.com

একটি বিষয়ে দুই মহাসচিবের অভিন্ন সুর

সপ্রীম কোর্টের রায় এবং সংবিধান সংশোধন প্রশ্নে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি পয়েন্টে বিরল ঐকমত্য লক্ষ্য করা গেছে। আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের একক ক্ষমতা রয়েছে জাতীয় সংসদের। সুপ্রীম কোর্ট সেই এখতিয়ারে প্রবেশ করতে পারে না। এই বিষয়টি নিয়ে যখন শিক্ষিত সচেতন মানুষের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখন গত ৩ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পর জনাব খায়রুল হক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, সরকার গেজেট প্রকাশ করুক আর না করুক, নতুন করে সংবিধান মুদ্রণ করুক আর না করুক, ৫ম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায় সেই ঘোষণার দিন থেকেই কার্যকর হয়ে গেছে। তিনি ঐ রায় সম্বলিত সংশোধিত সংবিধান ছাপানোর জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

হাইকোর্টের সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর রায়

প্রধান বিচারপতির উপরোক্ত মন্তব্যের মাত্র চারদিন পর গত ৪ অক্টোবর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ একটি চাঞ্চল্যকর রায় দিয়েছে। বিচারপতি এএইচএম শামছুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি শেখ জাকির হোসেন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, ৫ম সংশোধনী সংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায়ের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ৭২-এর সংবিধান পুনঃস্থাপিত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সংবিধানে বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে ৭২ সালের সংবিধান পুনঃস্থাপিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ এখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ঠিক একই দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন যে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে দেশের সংবিধান শীঘ্রই মুদ্রণ করা হচ্ছে। হাইকোর্টের আলোচ্য রায়ে আরো বলা হয়েছে যে, যেহেতু বাংলাদেশ এখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাই সেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তিকে পর্দা বা টুপির মত ধর্মীয় পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করা যাবে না। বিচার বিভাগ এখন সব বিষয়েই রায় দিচ্ছে। বিশেষ বিশেষ দিনকে শোক দিবস ঘোষণা, বিশেষ দিবসের ছুটি বাতিল, স্বাধীনতার ঘোষণা, রেসকোর্স ময়দানে শিশুপার্ক নির্মাণ করা ঠিক না বেঠিক, পর্দা পরিধান করা বা না করা, ইসলামী জাহানের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা বা না করা থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি সঠিক না বেঠিক ছিল ইত্যাদি সব বিষয়েই রায় দেয়া হচ্ছে। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর নাম করে আগামী দিনগুলোতে সংবিধানের ওপর 'অপরিবর্তনের' সীলমোহর মেরে দেওয়া হচ্ছে।

(সাপ্তাহিক সোনার বাংলা : ০৮/১০/২০১০)

www.pathagar.com

(১৪)

সংসদকে পাশ কাটিয়ে সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা কিভাবে?

পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর রায় নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবারের বিতর্কটি একটু ভিন্ন জাতের। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এবারের বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছে মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের একটি উক্তি থেকে। দেশে নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। একই দিন তিনি সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে গমন করেন এবং সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। একাধিক জাতীয় দৈনিক মন্তব্য করেছে যে, দেশের ৪০ বছরের জীবনে কোনো প্রধান বিচারপতির জাতীয় স্মৃতিসৌধে গমন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের ঘটনা এবারই সর্বপ্রথম। ঐ সব জাতীয় দৈনিকে আরো বলা হয়েছে যে, কোন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলন করার ঘটনাও এবারই প্রথম। যাই হোক, সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ যেদিন রায় দিয়েছে, সেদিন থেকেই অর্থাৎ চলতি সালের ২রা ফেব্রুয়ারি থেকেই সেই রায় কার্যকর হয়ে গেছে। একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন যে, তাহলে তো বাংলাদেশ গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে গেছে। সেক্ষেত্রে ইসলামী রাজনীতিও কি দেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি? উত্তরে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'You can draw your own conclusion' অর্থাৎ 'আপনি নিজেই নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন'। প্রধান বিচারপতি আরো বলেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর সুপ্রীম কোর্ট যে চূড়ান্ত রায় দিয়েছে, সেই রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন প্রতিস্থাপিত অংশগুলো সন্নিবেশ করে জনগণের কাছে সার্কুলেট করা। এ জন্য সংবিধান নতুন করে মুদ্রণ করার জন্য তিনি আইন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেন।

প্রধান বিচারপতির এই বক্তব্যের মাত্র চারদিন পর বিচারপতি শামছুদ্দিন এবং জনাব জাকির হোসেন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বোরখা পরিধান সম্পর্কে একটি রায় দেয়। ঐ রায়ে বলা হয় যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে কোনো মানুষকে বোরখা বা টুপি পরতে বাধ্য করা যাবে না।

প্রধান বিচারপতির আলোচ্য বক্তব্য এবং হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চের আলোচ্য রায়ের পর সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার এবং কর্তৃত্ব নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতির বক্তব্য সমর্থন করেছেন আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ। এর আগে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন ড. কামাল হোসেন। গতকাল একটি জাতীয় বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত নিবন্ধে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ঐ মতের প্রতিধ্বনি করেছেন। জাতীয় সংসদ সদস্য বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রধান বিচারপতির ঐ মন্তব্যের আগে নিয়মিত বলে যাচ্ছিলেন যে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র জাতীয় সংসদের, অন্য কারো নয়। তবে প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের পর তিনি সুর পাল্টিয়েছেন। এখনও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় কিভাবে বাস্তবায়িত হবে। সেটি কি পার্লামেন্টে একটি বিল পাসের মাধ্যমে হবে, নাকি সুপ্রীম কোর্টের রায়টি সংবিধানে প্রতিস্থাপিত করলেই হয়ে যাবে। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং এলজিআরডি মন্ত্রী আশরাফুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে যা কিছুই করা হোক না কেন, সেটি পার্লামেন্টের মাধ্যমে করতে হবে। নৌকার টিকিটে নির্বাচিত ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেছেন যে, সংবিধান সংশোধনের একক ক্ষমতা শুধুমাত্র পার্লামেন্টের রয়েছে। এই প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝে একটি বিরাট ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। বিএনপি'র মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারি আজহারুল ইসলাম, এরশাদপন্থী জাতীয় পার্টির মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার এমপি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার রয়েছে কেবলমাত্র পার্লামেন্টের। এখানে আদালতের কোন এখতিয়ার, নেই। একই মতের প্রতিধ্বনি করেছেন আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এবং সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রউফ, সুশীল সমাজের ড. মোজাফফর আহমেদ, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন প্রমুখ।

॥ দুই ॥

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিতর্কে এখন পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছেন। এখন পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট কোন মন্তব্য করেননি। তিনি কোন স্পষ্ট মন্তব্য না করলেও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত ১৫ সদস্যের বিশেষ কমিটি তিনি কেন গঠন করেছেন? বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের লক্ষ্যেই ঐ কমিটি করা হয়েছে। এখন সুপ্রীম কোর্টের রায় সংবিধানে ছাপার অক্ষরে প্রতিস্থাপিত করলেই যদি সব কাজ হয়ে যায় তাহলে ঐ বিশেষ কমিটির জন্য করণীয় আর কিইবা থাকলো? এর বেশ কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে কিনা, সেটি ইলেকশন কমিশনের ব্যাপার। তার সরকার কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

কয়েকদিন আগে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদও একই কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বা আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্য প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের রায়ের আলোকে এবং প্রধান বিচারপতির বক্তব্য মোতাবেক ইসলামী রাজনীতি ইতোমধ্যে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ঐ দিকে প্রধানমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে একমত নন নির্বাচন কমিশন। কমিশন সদস্য সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন যে, কোন দলকে নিষিদ্ধ করা না করা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। তাদের কাজ হলো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেয়া। তাদের হাতে রয়েছে আরপিও। কোন দলের গঠনতন্ত্র যদি দেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে তারা সেই দলকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে বলবেন এবং দেশের সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে বলবেন। এ ব্যাপারে ইসলামী দল বা অন্য কোন দল বলে তাদের কাছে কোন কথা নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়, সংবিধান সংশোধন এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশন এবং উচ্চ আদালতের মাঝে রয়েছে বেশ বড় দূরত্ব। অনুরূপভাবে একই প্রশ্নে দেশের পলিটিশিয়ান এবং সুপ্রীম কোর্টের মাঝে রয়েছে বড় ব্যবধান। সম্ভবত এসব বিষয় টের পেয়ে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং সাবেক বিচারপতি গোলাম রব্বানীরা একটি কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তারা বলছেন যে, সুপ্রীমকোর্ট আসলে সংবিধান সংশোধন করেনি, বরং অতীতের অবৈধ পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করেছে। এসব কথা বলে তারা সমগ্র বিষয়টিকে শুধুমাত্র তালগোলই পাকিয়ে ফেলছেন না বরং নিত্যনতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন এবং 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিচ্ছেন। তারা বলতে চাচ্ছেন যে, মার্শাল ল' বলে সংবিধানে কোন আইন নেই। সামরিক শাসকরা নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। তাই সামরিক বিধি বেআইনী। সামরিক শাসনের বলে যারা ক্ষমতায় এসেছেন তারাও বেআইনী। পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ সামরিক বিধি এবং বেআইনী সামরিক শাসকের সৃষ্টি। তাই সেটি বেআইনী। বলা হয়েছিল যে, পঞ্চম সংশোধনী প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন করেছে পার্লামেন্ট। অতঃপর সেটি গণভোটে পাস হয়েছে। এই যুক্তির জবাবে বিচারপতি খায়রুল হক রায় দিয়েছেন যে, ঐ পার্লামেন্ট সৃষ্টি হয়েছিল অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশবলে। জিয়াউর রহমান ছিলেন অবৈধ শাসক। তাই তার যে নির্দেশবলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, পার্লামেন্ট গঠিত হয় সেই নির্দেশও ছিল অবৈধ। সুতরাং সেই পার্লামেন্টও ছিল অবৈধ। এছাড়া ৭২-এর সংবিধানে গণভোটের কোন বিধান ছিল না। এটি যুক্ত করা হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম সংবিধান সংশোধনীতে সেটি অনুমোদন করা হয়।

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

ঠিক এখানে এসেই "প্যান্ডোরার বাক্স" খুলে যায়। যেসব যুক্তিতে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে তার একটি হলো এই যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হয়নি, শাসিত হয়েছে ডিকটেটর এবং ক্ষমতা দখলকারীদের দ্বারা। ফলে বাংলাদেশ তার সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী চরিত্র হারিয়েছিল। আরো বলা হয়েছে যে, পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত ফরমানে সংবিধানের মৌলিক চরিত্র ধ্বংস করা হয়েছিল। এসব মৌলিক চরিত্রের মধ্যে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আদালতকে বাইরে রাখা ইত্যাদি। ঐ রায়ে আরো বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সেটি হতে হবে সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে পঞ্চম সংশোধনীর খোল-নলিচাকে অবৈধ ঘোষণা করেও ধারাবাহিকতার স্বার্থে এবং বিশৃঙ্খলা এড়ানোর উদ্দেশ্যে পঞ্চম সংশোধনীর কতিপয় ব্যবস্থাকে Condone বা মার্জনা করা হয়েছে। এখানে উঠে আসে অনেকগুলো প্রশ্ন।

সেই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন। গত ৭ অক্টোবর 'দৈনিক সংগ্রামকে' প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমি একটু পেছনে ফিরে দেখতে চাই। আমাদের সংবিধান সংশোধন নিয়ে সর্বত্রই যে আলোচনার ঝড় উঠেছে তার পেছনের খবর কিন্তু অনেকে জেনেও না জানার ভান করছেন। কারণ, ১৯৭০ সালের নির্বাচন কিন্তু এদেশে হয়েছে সামরিক ফরমানের ভিত্তিতেই। আর তারপরে আমাদের সংবিধানও রচনা হয়েছে সেই সামরিক ফরমানের ভিত্তিতেই। সব সামরিক ফরমান যদি অবৈধ হয়ে যায় তাহলে খোদ আওয়ামী লীগই তো রাজনীতি করার কোন সুযোগ পায় না। তাদেরকে আজো বাকশালেই থাকতে হতো।" খন্দকার মাহবুব হোসেন কোন কিছু বাড়িয়ে বলেননি। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেন এবং সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়। অথচ তার আগের দিনও পাকিস্তান শাসিত হয়েছে ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানের অধীনে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস হামুদুর রহমান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরকে অবৈধ ঘোষণা করেন। জাস্টিস হামুদুর রহমান একজন বাঙালি। তিনি ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তার রায়ে তিনি

www.pathagar.com

বলেন, "যেহেতু তখন পাকিস্তানে ছিল সাংবিধানিক শাসন, তাই সংবিধান মোতাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের উচিত ছিল পাকিস্তান পার্লামেন্টের স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।" এটি অনেকটা বাংলাদেশের ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের ঘটনার মত। সেদিনও দেশে সংবিধান চালু ছিল। সংবিধান মোতাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের অবর্তমানে স্পিকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়া উচিত ছিল।

যাই হোক, পাকিস্তানের অবৈধ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ 'লীগাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার' বা এলএফও জারি করেন। এই এলএফও ছিল একটি নির্দেশনামূলক আইন। তাতে ছিল ২৭টি অনুচ্ছেদ এবং ৩টি তফসিল। এই এলএফও'র অধীনেই ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ঐ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদই বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন করে। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের ফরমানে গঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যদি অবৈধ হয় তাহলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের ফরমানবলে গঠিত জাতীয় সংসদও কি অবৈধ হয়ে যায় না? বলা হয় যে, পঞ্চম সংশোধনীর রায় মোতাবেক কঠোরভাবে আইনের দৃষ্টিতে বিচার করলে এলএফও'র অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বৈধ হয় কিভাবে?

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আরো আছে চতুর্থ সংশোধনী বাতিলকে জায়েজ করা। আরো বলা হয়েছে যে, সংবিধানের মূল চরিত্রের বাইরে হলে পার্লামেন্টও কোন সংশোধন করতে পারবে না। তাহলে চতুর্থ সংশোধনীর ব্যাপারে ঐ রায় বিস্ময়করভাবে নীরব কেন? এসব প্রশ্ন এবং আরো অন্যসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল বারান্তরে।

(দৈনিক সংগ্রাম : ১০/১০/২০১০)

www.pathagar.com

(১৫)

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : পরবর্তী নির্বাচন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান সংশোধন

পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ যে রায় দিয়েছে, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সেই রায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা অবশ্য উল্লসিত হতেই পারেন। কারণ আপাতত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে, উচ্চ আদালতের এই রায় বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী তথা জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক আদর্শের গোড়ায় আঘাত হেনেছে। আজকে কি ঘটেছে, যারা শুধুমাত্র সেটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আগামীকাল বা পরশু অর্থাৎ অনাগত বা দূরাগত ভবিষ্যতে এই রায়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কি হতে পারে সেটি নিয়ে ভাবছেন, তারা কিন্তু এই রায়ের মধ্যদিয়ে আরো বেশি কিছু দেখতে পারছেন। তারা সময় থেকে সময়ান্তরে যাচ্ছেন। পঞ্চম সংশোধনী পাস হয়েছিল ৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেটি উচ্চ আদালতের রায়ে অবৈধ হয়ে গেলো ৩৩ বছর পর। যেহেতু এটি উচ্চ আদালতের রায় তাই এটিকে তাৎক্ষণিকভাবে মানতেই হবে। কিন্তু যারা রায়ের গভীরে গেছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, এই রায় পেছনে রেখে গেছে অনেক প্রশ্ন। যারা কিছুটা লেখাপড়া জানেন তারা বলছেন যে, এই রায় 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছে। একটু আগে বলেছি যে, সপ্রিমকোর্ট এই সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করলো ৩৩ বছর পর। আজ থেকে ৩৩ বছর পরেও কি এই রায় বা এই সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ন থাকবে? পঞ্চম সংশোধনীর পেছনে আদিগন্ত বিস্তৃত যে পলিটিক্যাল ডাইমেনশন রয়েছে সেই ডাইমেনশন বা পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ সম্ভবত বিবেচনায় আনা হয়নি। সে জন্যই বলছি যে, আগামী দিনে এই রায় কি অপরিবর্তনীয় থাকবে? বিশেষ করে রায়ের রাজনৈতিক দিকগুলো?

এই রায়ে রয়েছে কতগুলো অন্তর্নিহিত কনট্রাডিকশন। রায় বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঐ সব ইনহারেন্ট কনট্রাডিকশন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠেছিল যে সুপ্রিমকোর্ট যেভাবে রায় দিয়েছে তার ফলে সংবিধানের যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছে সেই পরিবর্তনটি কি সংসদকে পাশ কাটিয়ে বাস্তবায়িত হবে? নাকি সংসদে সেই পরিবর্তনগুলো পাস করিয়ে অতঃপর সেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে? কথাটিকে বলা হয়েছে এভাবেঃ "সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে রায় দিয়েছে ঠিক সেভাবেই সংবিধান ছাপা

www.pathagar.com

হবে। অর্থাৎ পঞ্চম সংশোধনীর যেসব বিষয় অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো সংবিধান থেকে বাদ যাবে। ৭২ সালের সংবিধানের যে সব ধারা পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল সেগুলো ফেরত আসবে"। এই দু'টি কাজ করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং অনেক রাজনৈতিক আদর্শ সমুন্নত করা হয়েছে। এসব নিয়ে বিগত ৪/৫ মাস হলো পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে এবং টেলিভিশনে বিস্তর আলোচনা চলছে। সেগুলোর অন্ত র্নিহিত স্ববিরোধিতা হাইলাইট করার জন্য এই রায়ের মোখতাছার কথাগুলো বলতেই হচ্ছে। রায়ের সারমর্ম নিম্নরূপ :

১. **আল্লাহর প্রতি ঈমান**-পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি অবৈধ ঘোষিত হলো। সে জায়গায় ফিরে আসবে এখন ৭২-এর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা।

২. **সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা**-পঞ্চম সংশোধনীর এই অনুচ্ছেদটি অবৈধ হয়ে গেলো। সে জায়গায় ফিরে আসবে সমাজতন্ত্র।

৩. নৃতাত্ত্বিকভাবে আমরা বাঙালি হলেও জাতি হিসেবে আমরা বাংলাদেশী- পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি বাতিল হয়ে গেলো। সে জায়গায় **ফিরে এলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ**।

৪. ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে **মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব** জোরদার করা হবে- পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি বাতিল হলো।

৫. ৭২-এর সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অর্থাৎ ইসলামী রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। পঞ্চম সংশোধনীতে এই দু'টি ধারা বিলোপ করা হয়। ফলে ইসলামী রাজনীতি করার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে পঞ্চম সংশোধনী বিলোপ করার ফলে ৭২-এর সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদ ফিরে এসেছে। ফলে ইসলামী রাজনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

৬. পঞ্চম সংশোধনীতে ৮, ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনীর জন্য শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়নি। এই তিনটি অনুচ্ছেদের সংশোধনীর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের পরেও গণভোটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর ৭২ এর সংবিধানে ফিরে আসায় গণভোটের ঐ ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেলো। ফলে ৮, ৪৮ এবং ৫৬সহ সংবিধানের যেকোনো অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য এখন থেকে শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হলেই চলবে।

www.pathagar.com

৭. ৭২ এর সংবিধান বা পঞ্চম সংশোধনী কোনোটাতেই সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (Basic structure) বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Basic Features) বলে কিছু চিহ্নিত ছিল না । কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, এসব মৌলিক কাঠামো কোনোদিন সংশোধন করা যাবে না।

৮. পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণার মূল সুর হলো একটি। আর সেটি হলো এই যে সংবিধানে মার্শাল ল'র কোনো স্থান নেই। সামরিক শাসনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই মোশতাক, জেনারেল জিয়া ও জাস্টিস সায়েম হলেন ক্ষমতার অবৈধ দখলদার। সেই হিসাবে সামরিক শাসক বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারা অবৈধ, তাদের শাসনকাল বেআইনী এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ বেআইনী। এমনকি তাদের সিদ্ধান্তের কারণে যে গণভোট হয়েছে, জাতীয় সংসদ গঠনের জন্য যে নির্বাচন হয়েছে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদ গঠিত হয়েছে তার সবই বেআইনী। যেহেতু গণভোট বেআইনী তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনারেল জিয়ার সমর্থনে গণভোটের মাধ্যমে প্রদত্ত গণরায়ও বেআইনী। তেমনি জেনারেল জিয়ার আমলে গঠিত জাতীয় সংসদ বেআইনী। সেই 'বেআইনী' জাতীয় সংসদ পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে। সেই অনুমোদনের কাজটি বেআইনী। সুতরাং পঞ্চম সংশোধনী বেআইনী হওয়ায় সেটিকে বাতিল ঘোষণা করা হলো।

৯. হাইকোর্ট তথা আপিল বিভাগের রায়ের মূল সুর হলো বৈধভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টই কেবল সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রাখে। ঐ রায় অনুযায়ী ৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক ৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে তাদের সব কাজই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

১০. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ অর্থাৎ ৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিলোপ করা হয় এবং একদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল বাকশাল পদ্ধতি কায়েম করা হয়। তাহলে ৪র্থ সংশোধনীও কি বৈধ?

॥ দুই ॥

এখন আমি বলব সেই অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতার কথা, যেটি আগামী দিনে প্যান্ডোরার বাক্স উন্মোচন করতে পারে। শুরু করছি ওপরে উল্লেখিত ১০ টি পয়েন্ট দিয়ে–

www.pathagar.com

১. ওপরে উল্লেখিত পয়েন্টগুলোর মধ্যে ১০ নম্বর পয়েন্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ সংশোধনী অর্থাৎ একদলীয় বাকশাল কায়েম করা হয়েছে ৭২ এর সংবিধান মোতাবেক গঠিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে। পঞ্চম সংশোধনীতে বাকশাল পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের রায়ে পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। তাহলে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায় মোতাবেক বাকশাল বাতিলের কাজটিও অবৈধ। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলো, কিন্তু বাকশাল ফিরে এলো না কেন?

২. এর রেডিমেড উত্তর হলো এই যে, হাইকোর্ট বিভাগ তথা আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কৃত কতগুলো কাজকে Condone বা মার্জনা করেছেন। প্রশ্ন হলো, সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ সংশোধনের মতো গুরুতর কাজকে মার্জনা করা, বহাল রাখা বা বাতিলের ক্ষমতা তো উচ্চ আদালতকে সংবিধান দেয়নি। তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ বা আপিল বিভাগ Pick and choose এর মাধ্যমে সংসদের যে ক্ষমতা নিজেদের কাছে Arrogate করলেন সেই ক্ষমতা তারা পেলেন কোত্থেকে?

৩. আপিল বিভাগের রায় মূলত নির্ভর করেছে ২০০৫ সালে প্রদত্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের ওপর। হাইকোর্ট বিভাগ বলছেন যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা যেতে যারে। কিন্তু তাই বলে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না। চতুর্থ সংশোধনী প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পাস হলেও সেটি ৭২-এর সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করেছিল। কারণ বহুদলীয় সংসদীয় পণতন্ত্র থেকে সেটি কমিউনিস্ট প্যাটার্ন ফলো করে একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিল। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে সংবিধান লংঘনের এত বড় একটি গর্হিত কাজ সম্পর্কে এমন পূর্ণ নীরবতা পালন করা হলো কেন?

বিচার বিভাগের মান্যবর বিচারপতিবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর সমস্ত অফিসার ও জওয়ান বাংলাদেশের নাগরিক। জাতীয় নির্বাচনের সময় তারা নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি বা অন্য যেকোনো দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার তারা সংরক্ষণ করেন। তবে সেনাবাহিনী ও বিচার বিভাগের সদস্য হওয়ায় তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ তারা প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেন না। বিচার বিভাগে সমস্ত বিচারকই যে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করেন সে কথা যেমন সত্যি নয়, তেমনি একথাও সত্যি নয় যে, তারা সকলেই বিএনপি বা জামায়াতের রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র

www.pathagar.com

ইত্যাদি প্রশ্নে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী সুতীব্রভাবে দু'ভাগে বিভক্ত। কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান, মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সমর্থক। আবার কেউ ধর্মনিরপেক্ষতা, ভারতকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক। সেই জন্যই ১৯৭৫ সালের পর জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তির বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে এবং তারা তিনবার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। আবার দেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিও দুইবার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়েছে। এই তীব্র রাজনৈতিক ও আদর্শিক বিভাজনই হলো বাংলাদেশের রাজনীতির কঠোর বাস্তবতা। সেখানে হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ যদি বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা সেটা মানবে কেন? আগামীতে তারা যদি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতীয় সংসদে আসে এবং তাদের রাজনৈতিক আদর্শ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তখন হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের রায় কি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে? যদি দাঁড়াতে পারে তাহলে সেটি হবে বিশাল জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং মতামতের সাথে উচ্চ আদালতের বিচারকদের রায়ের সংঘর্ষ বা কনফ্লিক্ট। যেহেতু উচ্চ আদালতে ১৪২ অনুচ্ছেদ বাতিল হয়েছে, তাই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংশোধন করা সম্ভব হবে। সেই সংশোধনটি করবে জাতীয় সংসদ, মার্শাল ল' নয়। তার পরেও কি আদালত বলবেন যে, সংসদ হোক আর যেই হোক, সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটানো যাবে না? তাহলে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী যদি নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিবর্তন করতে চান তাহলে উচ্চ আদালতের রায় দিয়ে কি সেই গণরায়ের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে? এই অন্তর্নিহিত কনফ্লিক্টের কথা উচ্চ আদালত কোনো সময় বিবেচনায় এনেছেন বলে মনে হয় না। তারা ইতোমধ্যেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা নিয়ে হাসিনার সরকার দারুণ এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। সেই বিব্রতকর পরিস্থিতিটি সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে। রায়ের আলোকে সংবিধান মুদ্রিত হয়ে গেলে ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেটি কি ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষে মানা সম্ভব? মানলে তো তাদের রাজনৈতিক আত্মহনন ঘটে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে আগামী দিনগুলো ঊর্মীমুখর হবে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা। (দৈনিক সংগ্রাম : ২৪ অক্টোবর ২০১০)

৬—

www.pathagar.com

(১৬)

ইসলামী দল নিষিদ্ধ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম খারিজের চক্রান্ত

এই সরকার তার গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে তারা যেসব ওয়াদা করেছে সেইসব এজেন্ডায় এসব হিডেন এজেন্ডার প্রকাশ ইচ্ছা করেই ঘটানো হয়নি। তারা জানতেন যে, তাদের মতলব যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে জনগণ তাদেরকে ভোট দেবে না। তাই জনগণের চোখে ধূলা দেয়ার জন্য তারা দুর্নীতির মত চটকদার কথা বলেছেন। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভের জন্য তাদের বিদেশী প্রভুদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। কারণ ঐ সব গোপন এজেন্ডায় ছিল বিদেশীদের স্বার্থ। তাই ইলেকশনের আগেই ফরেন মেন্টরদের কাছে ওরা কথা দিয়েছিলেন যে, ইলেকশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ ক্ষমতায় বসালে ওরা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। বলাবাহুল্য, বিদেশী বিশেষ করে আমেরিকা, ভারত এবং ইসরাইলের অভিন্ন স্বার্থ ছিল বাংলাদেশে ইসলামী চিন্তা-চেতনার বিকাশ রুদ্ধ করা। শুধু রুদ্ধ করাই নয়, 'জঙ্গীবাদ', 'মৌলবাদ' ইত্যাদি জুজু তুলে খোদ ইসলামকেই জনগণের চোখে হেয় করা। এটা আশু লক্ষ্য। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মত একটি ইস্যু খাঁড়া করে দেশের ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা। এই বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ এখন মাঠে নামিয়েছে তাদের অনির্বাচিত আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদকে।

আইনমন্ত্রীর পূর্ব পরিকল্পিত নীল নকশা

একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন আওয়ামী লীগের এমপি বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। তার প্রশ্ন ছিল- ২৩০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে আইনমন্ত্রী বানানোর মতো একজন সংসদ সদস্যও কি খুঁজে পাওয়া গেল না? এতই কি যোগ্য লোকের অভাব যে একজন অনির্বাচিত ব্যক্তিকে আইনমন্ত্রী করতে হলো? সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের প্রশ্ন ছিল অনেকেরই মনের কথা। আওয়ামী লীগে তো উকিল মোক্তার কম নেই। তাহলে বেছে বেছে এই শফিক আহমেদকে পিকআপ করা হলো কেন? প্রথম প্রথম অনেকে ভেবেছিলেন যে এটি একটি চমক সৃষ্টির মন্ত্রিসভা। কিন্তু এতদিনে তারা বুঝে গেছেন যে শুধু চমক নয়, বিশেষ কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগের পেছনে বিশেষ কিছু কারণ ছিল। তাদের একজন হলেন আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ। বামপন্থী চিন্তা ধারায় লালিত এবং বর্ধিত জনাব শফিক আহমেদ। বামপন্থীরা বিশেষ করে মস্কোপন্থীদেরও একটি চিহ্নিত

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য হলো এই যে ওরা নিজ থেকে বন্দুকের ট্রিগার টিপতে পারে না। ট্রিগার টিপতে হলে ওদেরকে আরেকজনের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে হয়। শেখ মুজিবের আমলে ওরা গঠন করে ত্রিদলীয় ঐক্য জোট। আওয়ামী লীগ ছাড়া এই ঐক্যজোটের শরীক দল ছিল মস্কোপন্থী মোজাফফর ন্যাপ এবং মস্কোপন্থী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। এরা শেখ মুজিবের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলী ছুঁড়তে চেয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিব ওদেরকে ঘাড় থেকে ফেলে দেন। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী মস্কোপন্থীদের প্রজাতি। এরা ইসলামবিরোধী, কিন্তু ইসলামের বিরোধিতার জন্য এরা আওয়ামী লীগের প্ল্যাটফর্ম বেছে নেয়। শফিক আহমেদও ইসলামকে টার্গেট করে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করেছেন। এবার মন্ত্রী হয়ে সেই সুযোগটাকেই সম্পূর্ণ কাজে লাগাচ্ছেন। আজ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে আইন মন্ত্রীর বিষোদগার এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য তার অপতৎপরতা নতুন কিছু নয়। গত ৪ এপ্রিল একটি সেমিনারে কওমী মাদরাসা এবং ইসলাম বিদ্বেষের যে ভূমিকা রেখেছেন আইনমন্ত্রী, সেটা তার তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য নয়। তিনি মন্ত্রী হয়েছেন ৬ জানুয়ারি। পরের দিন অর্থাৎ ৭ জানুয়ারিতে তিনি ৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার 'খায়েশ' প্রকাশ করেছেন। ৭ জানুয়ারি ইংরেজি 'ডেইলী স্টারে' প্রদত্ত আইনমন্ত্রীর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার পরের দিন ৮ জানুয়ারি একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঐ দিন ইন্দিরা রোডে অবস্থিত তার নিজস্ব বাসভবনে ডেইলী স্টারকে প্রদত্ত তার সাক্ষাৎকারে তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্ট মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, তার মন্ত্রণালয় ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর উদ্দেশ্য হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তিযুদ্ধ, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, "একজন আইনজীবী এবং মানবাধিকার কর্মী হিসেবে জনগণের প্রতি আমার কিছু অঙ্গীকার রয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করার ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারলে সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ এবং সন্ত্রাসের যে পুনরুত্থান ঘটেছে সেটি নির্মূল করা সম্ভব হবে। মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর পরই তার বাসভবনে দেয়া এই সাক্ষাৎকারে আইনমন্ত্রী বলেন, তার মন্ত্রণালয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কারণ যুদ্ধাপরাধীরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের জনগণের ওপর গণহত্যা, ধর্ষণ এবং অন্যান্য জুলুম চালিয়েছিল। শপথ গ্রহণ করার পর পরই তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ক্রাইমস (ট্রাইবুনাল), ১৯৭৩ আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে।

www.pathagar.com

এটা কার কথা? আইনমন্ত্রীর? নাকি প্রধানমন্ত্রীর?

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এটা আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের ব্যক্তিগত মত। প্রথমে আমিও তাই মনে করেছিলাম। তাকে একটি বেনিফিট অব ডাউট দেয়ার ছিল। কারণ এর আগে তিনি এমপিও হননি, মন্ত্রীও হননি। মন্ত্রী হলেই ব্যক্তিগত মতামত মিডিয়াতে দেয়া যায় না। সেটা হয়তো তিনি জানতেন না। কিন্তু ৩ মাস পর প্রেসক্লাবের একটি গোলটেবিল বৈঠকে আইন মন্ত্রী যখন অনেক বিদগ্ধজনের সামনে বক্তৃতা করলেন এবং মিডিয়ার সামনে বক্তব্য রাখলেন তখনতো আর সেটাকে ব্যক্তিগত মতামত বলার কোনো সুযোগ থাকে না। ওটা তখন আইনমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য হয়ে পড়ে। এই গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফারুক সোবহান। ইনি রেহমান সোবহানের ভাই। তিনি সরকারের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। ঐ গোলটেবিল বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) মঈনুল হোসেন চৌধুরী। তিনি এর আগে কেয়ারটেকার সরকারের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, "১৯৭২ সালের সংবিধান থাকলে ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সৃষ্টি হতো না। ৭৪ পরবর্তী সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন সংশোধনী এনে ৭২-এর সংবিধানে বিধৃত ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে নস্যাৎ এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ফলেই ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।" আইনমন্ত্রী আরো বলেন, "৭২-এর সংবিধানে ফিরে গেলে দেশে কোনো ধর্মীয় রাজনীতি থাকবে না। ঐ সংবিধান হচ্ছে দেশের মূল সংবিধান। এখন ৭২ সংবিধানে ফিরে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।" তিনি আরো বলেন, "৭২-এর সংবিধানের আমূল সংশোধনের ফলেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ঘটেছে এবং জঙ্গীবাদের উত্থানের পথ খুলে দিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ ধারার যদি পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয় তাহলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে।" প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত ছাড়া আইনমন্ত্রী এ ধরনের নীতি নির্ধারণী বক্তব্য দিতে পারেন না।

রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার

এ সেমিনারে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ আরো বলেন, 'সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করে এরশাদ অন্যায় করেছেন। একজন জেনারেল সংবিধানে ধর্মকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক।' তাহলে সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে বাদ দেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে জানতে চাইলে জনাব শফিক আহমেদ কায়দা করে প্রশ্নটির জবাব দেন। তিনি বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম থেকে বাদ দিতে হলে সংবিধান আবার সংশোধন করতে হবে। তারা কেবল আড়াই মাস হলো ক্ষমতায় এসেছেন। তবে ভবিষ্যতে সেই সংশোধন করা হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'ওয়েট এন্ড সি' অর্থাৎ অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।

www.pathagar.com

কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে উদ্ভট অভিযোগ

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ শুধুমাত্র ইসলামী জঙ্গীবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি কওমী মাদরাসাসমূহের বিরুদ্ধেও বল্গাহীন প্রচারণায় লিপ্ত হন। তিনি বলেন, দেশের কওমী মাদ্‌রাসাগুলো এখন জঙ্গীবাদের প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসব কওমী মাদরাসায় যে শিক্ষা দেয়া হয় তা কূপমন্ডুকতার সৃষ্টি করছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মসজিদের ইমাম সাহেবরা কেবল বেহেশতে যাওয়ার শিক্ষা দেন। কত তাড়াতাড়ি বেহেশতে যাওয়া যায় মসজিদ, মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এসব শিক্ষাই দেয়া হচ্ছে। সত্যকথা বলতে হবে। অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা যাবে ন। এসব শিক্ষা সেখানে দেয়া হয় না। কওমী মাদরাসাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিস্তার লাভ করেছে। কোথাও ১ মাইল হাঁটলেই একটি মাদরাসা পাবেন। শুধু পুরুষদের মাদরাসাই নয়, মহিলাদের মাদরাসাও হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ১২ ও ৩৮-এর পুনরুজ্জীবন

আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ ৭২ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ ও ৩৮ পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই দুটি ধারা সংবিধানে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হলে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে এবং বর্তমানে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিলুপ্ত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৭ সালের এক নম্বর প্রোক্লামেশন অর্ডারবলে ৭২ সালের সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ বিলোপ করা হয়। অনুচ্ছেদটির শিরোনাম ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।' অনুরূপভাবে ৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের শর্তাংশটি দ্বিতীয় প্রোক্লামেশনের মাধ্যমে বিলোপ করা হয়। ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর পরে সংবিধান ২(ক) অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হয়। এই সংযোজনের ফলে পবিত্র ইসলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষিত হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, সরকার সংসদে তার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এটা সরকার তথা শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত। একজন অনির্বাচিত আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের মাধ্যমে শেখ হাসিনা এই ধরনের গণবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের পথ প্রশস্ত করছেন। সে জন্যই দেশি বিদেশী চক্রান্তের মাধ্যমে অন্তত ১০০টি আসনের ৯৫ শতাংশ ভোট কাস্ট করিয়ে আওয়ামী লীগকে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন দেয়া হয়েছে। বিডিআর হত্যাকাণ্ড, ভয়াবহ বিদ্যুৎ ও পানি সংকট, প্রশাসনের নজিরবিহীন দলীয়করণ প্রভৃতি কারণে মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই

www.pathagar.com

সরকার ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা নির্বাচনকালের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ছাত্রলীগের রক্তক্ষয়ী অন্তর্বিরোধ আওয়ামী লীগকে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সাথে আপোষ করতে বাধ্য করেছে। এক বছর পর এই সরকারের জনপ্রিয়তায় বিরাট ধস নামবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তখন এসব অপ্রীতিকর ও গণবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাবে না। সেটি না করা গেলে বিদেশী মুরব্বী এবং দেশের অভ্যন্তরে মহল বিশেষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। জঙ্গীবাদ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত প্রচার সরকারের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। সে জন্য সাময়িকভাবে ঐ প্রচার সংগ্রাম থেকে কিছুটা নামিয়ে আনা হয়েছে। এখন আওয়ামী প্রচারণার ফোকাল পয়েন্ট হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ৭২ সালের সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন।

কিন্তু পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে সংবিধানের এমন মৌলিক পরিবর্তন করা সঠিক হবে না। কারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ বলেনি যে, তারা ক্ষমতায় গেলে এসব কাজ করবে। এখন তারা যদি মাদরাসা বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ও ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে খারিজ করতে চায় তাহলে তাদেরকে রেফারেন্ডাম বা গণভোটে যেতে হবে। সেটি না করে তারা যদি সংসদের অভ্যন্তরে গায়ের জোরে এসব ইসলামবিরোধী পদক্ষেপ নেয় তাহলে রাজপথে নামা ছাড়া জনগণের আর কোন পথ খোলা থাকবে না।

(সোনার বাংলা : ১০ এপ্রিল ২০০৯)

www.pathagar.com

(১৭)

কোর্টের কাঁধে বন্দুক রেখে এসব অজনপ্রিয় কাজ কেন?

আওয়ামী লীগ আইন-কানুনের ধার ধারে বলে মনে হয় না। সব কিছুকেই তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে চায়। মানুষ এতোদিন শুনে এসেছে যে, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ আইনকে তার নিজ গতিতে নয় বরং তাদের দলীয় গতিতে চালাতে চায়। তা না হলে সংবিধানের ৫ নম্বর সংশোধনী বাতিল হলে কি হবে আর কি হবে না, সেটা নিয়ে তারা মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে কেন? এটার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেবে তো সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ। সেই ব্যাখ্যা পাওয়ার আগে এতো কাইট ফ্লায়িং করে লাভ কি? তার আগে জানা দরকার যে, এই মুহূর্তে পঞ্চম সংশোধনীর প্রকৃত অবস্থান বা লোকাস স্ট্যান্ডি কি? মনে হয় এ ব্যাপারে অনেক বোদ্ধা ব্যক্তিও বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। তাই সেই বিষয়টি আগে পরিষ্কার করা দরকার। প্রকৃত অবস্থা হলো এই যে, পঞ্চম সংশোধনী এই মুহূর্তে সংবিধানের অংশ হিসাবে এখনও বাতিল হয়নি। ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট হাইকোর্টের এক রায়ে পঞ্চম সংশোধনী বিলোপ করা হয়। রায়টি দেন বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবির। কিন্তু রায়টি ঘোষিত হওয়ার পরপরই সরকার সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে এর বিরুদ্ধে আপিল করে। তখন সুপ্রীম কোর্ট সরকারের প্রতি 'লিভ টু আপিল' মঞ্জুর করে এবং হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট।

তারপর ৩ বছর ৮ মাস গত হয়ে গেছে। বিএনপি'র পর ক্ষমতায় এসেছে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ফখরুদ্দীনের ইন্টারিম সরকার। তারা ২ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা অনেক উল্টাপাল্টা কাজ করেছে। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত এই মামলাটিতে তারা হাত দেয়নি। ফখরুদ্দীনের 'প্রক্সি গভর্নমেন্ট' সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর একটি নির্বাচন করে এবং ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনে। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার সময় তারা একটি বিষয় সুনিশ্চিত করে। সেটি হলো এই যে, আওয়ামী লীগকে এমন মেজরিটি দিতে হবে যাতে তারা ইচ্ছামতো সংবিধানের অদল-বদল করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ এককভাবে তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আর যদি জাতীয় পার্টির আসনগুলো যোগ করা হয় তাহলে তারা চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। এখন আর আওয়ামী লীগকে পায় কে? কোন একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, সংসদীয় পদ্ধতিতে কম করে হলেও কোন দলের যদি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

www.pathagar.com

থাকে তাহলে তারা এই পৃথিবীতে তিনটি কাজ ছাড়া বাকি সমস্ত অসাধ্য সাধন করতে পারে। এই তিনটি কাজ হলো- পুরুষকে নারী বানানো এবং নারীকে পুরুষ বানানো। আজকাল অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে কোন কোন পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অন্যতম বিশাল প্রজেক্ট বগুড়া জেলার ঠ্যাঙ্গামারা গ্রামে টিএমসি প্রজেক্টের কর্ণধার হোসনে আরা বেগম কৈশোরে পুরুষ ছিলেন। অতঃপর তার লিঙ্গান্তর ঘটে এবং তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। এখন তিনি হোসনে আরা বেগম এবং বাংলাদেশের বহুস্থানে বিস্তৃত টিএমসি প্রজেক্টের কর্ণধার হিসেবে পরিচিত। পার্লামেন্ট আর যে দু'টি কাজ পারে না সেগুলো হলো- সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করা এবং পূর্বদিকে অস্তগামী করা। অন্যটি হলো দিনকে রাত বানানো এবং রাতকে দিন বানানো।

॥ দুই ॥

রূপক অর্থে এই তিনটি কাজ ছাড়া দেশে হেন কাজ নেই যে কাজটি সংসদীয় ব্যবস্থায় ব্রুট মেজরিটি দিয়ে করা যায় না। আওয়ামী লীগও তার ব্রুট মেজরিটি দিয়ে সেইসব কাজই করা শুরু করেছে। যে ব্যক্তি সেদিনও জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ছিলেন তাকে একটি থানার ওসির সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তিন মাস কারাবরণ করার পর গত ৬ মে হাইকোর্টের নির্দেশে ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ খান কারাগার থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করেছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিল যে, তারা এখন ক্ষমতার মালিক-মোক্তার। তারা যা খুশি তাই করতে পারে। এই কাণ্ডই তারা করেছে পঞ্চম সংশোধনীর বেলায়। জনাব খায়রুল হকের ঐ রায়ের পরও বিএনপি আরও এক বছর দুই মাস ক্ষমতায় ছিল। তারপর এলো ফখরুদ্দীনের মিলিটারী কন্ট্রোল্ড প্রক্সি সরকার। তারা ২ বছর থাকলো। তারাও এ ব্যাপারে হাত দেয়নি। তারপর ক্ষমতায় আনা হলো আওয়ামী লীগকে। এই দলটিকে ব্রুট মেজরিটি দেয়ার জন্য অন্তত ১০০টি নির্বাচনী এলাকায় ৯৫ শতাংশ ভোট কাস্ট করানো হয়েছে। শুধু বাংলাদেশ ও ভারত নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন। সাম্প্রতিককালে দুনিয়ার কোথাও এমন নজির দেখা যায়নি। ক্ষমতায় আসার পর ৪ মাসও পার হয়নি। গত তিন তারিখে তারা সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে একটি পিটিশন নিয়ে হাজির। তারা আর আপিল মামলা চালাবে না। হাইকোর্টের রায় তারা মেনে নিচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের এই আবেদনের ফলে তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়াচ্ছে? মামলার বাদী তো এক পায়ে খাঁড়া। সরকার মামলা না চালালে তাদের দাবি পূরণ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা মুন সিনেমা হল ফেরত পায়। এখন সরকারও যদি মামলা তুলে নেয় তাহলে আর কিছুই থাকলো না। আর মামলা না

www.pathagar.com

থাকলে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল। যদি পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয় তাহলে চতুর্থ সংশোধনী তাৎক্ষণিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। আর সেই সূত্র ধরে পেছনে গেলে ১৯৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এসব কিছুর অর্থ হলো ব্যাক টু স্কয়ার ওয়ান। সুতরাং দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে বিএনপির মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন পক্ষভুক্ত হওয়ার অর্থাৎ এই মামলার বিবাদী হওয়ার আবেদন জানান। খোন্দকার দেলোয়ারের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে আদালতে দাঁড়ান প্রাক্তন বিচারপতি টিএইচ খান। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তিনজন আইনজীবী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলার বিবাদী হন। তাদের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে দাঁড়ান ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। ঐ তিনজন আইনজীবী এবং খোন্দকার দেলোয়ারের দরখাস্তের পর ৪ সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে নিয়মিত লিভ-টু-আপিল করতে বলেন। আগামী ৪ সপ্তাহ পর তাদের লিভ-টু-আপীলের শুনানি হবে। ততোদিন অর্থাৎ এই ৪ সপ্তাহ হাইকোর্ট রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। ৪ সপ্তাহ পরে যে শুনানি হবে সেই শুনানির পর সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দেবে যে বিচারের জন্য ঐসব লিভ-টু-আপিল গৃহীত হবে কি না। যদি গৃহীত না হয় তাহলে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি গৃহীত হয় তাহলে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলার বিচার শুরু হবে। যতদিন বিচার চলবে ততোদিন স্বাভাবিকভাবেই হাইকোর্ট রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, সামরিক আইন আদেশ সামরিক আইনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন সংযোজন, পরিবর্তন, বিলোপসাধন প্রভৃতি কাজকর্ম অনুমোদিত ও সমর্থিত হয় এবং এগুলো বৈধভাবে প্রণীত হয়েছে বলে ঘোষিত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে যে ৪টি বিষয়কে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেগুলো হলো- ১. গণতন্ত্র ২. সমাজতন্ত্র ৩. ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ৪. জাতীয়তাবাদ। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আলাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংবিধানের

প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। চতুর্থ সংশোধনীতে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনীতে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অর্থাৎ বাকশাল বিলোপ করে বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করা হয়। এখন যদি পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয় তাহলে এই সংশোধনীর মাধ্যমে যা কিছুই করা হয়েছিল তার সবকিছুই বাতিল হবে। অর্থাৎ বাকশাল

www.pathagar.com

পুনরুজ্জীবিত হবে। সমাজতন্ত্র ফিরে আসবে। ধর্মভিত্তিক দলগুলো নিষিদ্ধ হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ এভাবেই আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এখানে আইনমন্ত্রীর মুখের কথায় কিছু হবে না। তিনি যখন বলেন, এটা হবে ওটা হবে না, অথবা ওটা হবে এটা হবে না, তখন তিনি তার মনগড়া কথা বলেন, আইনের কথা বলেন না। এখন যদি একদলীয় শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে হয় অথবা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু রাখতে হয় অথবা আল্লাহর প্রতি ঈমান অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে সংবিধানের আরেকটি সংশোধনী আনতে হবে। এনে এসব বিষয়কে প্রোটেকশন দিতে হবে। তাই যদি করতে হয় তাহলে সুপ্রীম কোর্টের কাঁধে বন্দুক রেখে পঞ্চম সংশোধনীকে বধ করার প্রচেষ্টা কেন? কেন মহামান্য উচ্চ আদালতকে দিয়ে এই অপ্রীতিকর কাজ করিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা? এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সরকারকে সুপরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের রয়েছে তিন-চতুর্থাংশ মেজরিটি। তারা এ বিশাল মেজরিটি দিয়ে সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী বিল পাস করিয়ে নিতে পারে। এই বিলে তারা বলতে পারে যে, তারা 'আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস' এই অংশটি বাতিল করতে চায়। তারা ৭২ থেকে ৭৫-এর মতো সমাজতন্ত্র চালু করতে চায়। তারা এদেশে ইসলামী রাজনীতি চালু রাখতে চায় না। তারা ঐ বিলে বলুক যে তারা বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে, আর সেটিও একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে। তাদের বিলে যদি তারা এসব কথা বলে তাহলে বিরোধী দল থেকে সেগুলোর তীব্র বিরোধিতা করা হবে। বিরোধী দল থেকে বলা হবে যে তারা তো এসব কথা ইলেকশনের সময় জনগণকে বলেনি। এখন তারা যদি এসব কাজ করতে চায় তাহলে এসব ইস্যুর ভিত্তিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন দিক। দেখা যাক জনগণ কোনদিকে ভোট দেয়। একথা একশত ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় যে, জনগণ ধর্মহীন সেক্যুলারিজম এবং বাকশালী মহাস্বৈরাচার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।

(দৈনিক সংগ্রাম : ১০/০৫/২০০৯)

www.pathagar.com

(১৮)

৭২-এর কোন্ কোন্ বিধান ফিরে আসবে?

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হবে নাকি বহাল থাকবে, এই নিয়ে সারাদেশে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বাতিল করার পক্ষে যেমন শক্ত যুক্তি রয়েছে তেমনি বহাল রাখার পক্ষেও অকাট্য যুক্তি রয়েছে। বিষয়টি দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করব না। ২০০৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দেয়। তখন ক্ষমতায় ছিলো ৪ দলীয় জোট সরকার। রায় ঘোষণার পর সরকার আপিল বিভাগে এর বিরুদ্ধে আপিল করে। আপিল বিভাগ লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন এবং হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। বিগত ৪ বছর এভাবেই চলছিল। এর মধ্যে সরকার বদল হয় এবং গত ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। চলতি মাসের গোড়ার দিকে সরকারের তরফ থেকে এটর্নী জেনারেল আপিল বিভাগকে জানান যে, বর্তমান সরকার এই মামলা চালাতে আগ্রহী নয়। সুতরাং হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী সরকারের দায়ের করা যে আপিলটি পেন্ডিং রয়েছে সেই আপিলটি বর্তমান সরকার প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। সরকার আপিল প্রত্যাহার করায় স্বাভাবিকভাবেই আইনগতভাবে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়ে যায়। ইতিপূর্বে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন আইনজীবী এই মামলার বিবাদী অর্থাৎ সরকারের পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছিলেন। আবার যেদিন বর্তমান সরকার মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন জানান, সেদিন বিএনপির মহাসচিবও এই মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন জানান। বিষয়টি আদ্যপান্ত বিবেচনা করে আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ ঐ তিনজন আইনজীবী এবং খন্দকার দেলোয়ার, ৪ জনকেই নিয়মিত লিভ টু আপিল করার আহ্বান জানান। এবং এজন্য তাদের ৪ সপ্তাহ সময় দেন। ঐ লিভ টু আপিলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে। এই পটভূমিতে পঞ্চম সংশোধনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে রাজনৈতিক দল, আইনজীবী এবং বুদ্ধিজীবীরা টেলিভিশন টক শোতে মন্তব্য এবং পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। আমি এ ব্যাপারে কোনো পক্ষাবলম্বন করব না। আমি লক্ষ্য করেছি যে, পরস্পরবিরোধী বক্তব্য শুনে এবং বিবৃতি পাঠ করে সাধারণ মানুষ চরম বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। সেজন্য প্রথমে আমি চেষ্টা করব এ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকতে। আমরা দেখব যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়াবে। এই জন্য আমি সর্বাগ্রে দেখাতে চেষ্টা করব যে, পঞ্চম সংশোধনী পাস হওয়ার আগের অবস্থা কি ছিলো এবং

www.pathagar.com

পরের অবস্থা কি দাঁড়ালো। এখন যদি হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্ট বহাল রাখে তাহলে সাংবিধানিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়াবে? সেটা করতে হলে হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণা পাওয়া প্রয়োজন।

॥ দুই ॥

২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এবিএম ফজলে কবিরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এই রায়ের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ :

১. হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাক কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ, দেশে সামরিক আইন জারি এবং ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট জারিকৃত ফরমানবলে মোশতাক কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল অবৈধ এবং সংবিধানের লংঘন। তাই পরবর্তীতে ঐ প্রেসিডেন্টের সমস্ত কার্যকলাপ অবৈধ।

২. রায়ে আরো বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল সংবিধান বহির্ভূত কাজ। সুতরাং সেটি ছিলো অবৈধ ও বেআইনী। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হিসেবে তার নিয়োগ এবং ১৯৭৫ সালের ৮ ডিসেম্বর একজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (ডিসিএমএলএ) নিয়োগও ছিল সংবিধানের লঙ্ঘন, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। ফলে তার পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রমও অবৈধ।

৩. ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তৃতীয় ফরমানবলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটিও ছিল বেআইনী। ফলে পরবর্তীতে সম্পাদিত তাদের যাবতীয় কার্যক্রমও ছিল অবৈধ।

৪. বিচারপতি সায়েম কর্তৃক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ এবং তার নিকট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।

৫. ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ যেহেতু ছিল সংবিধান বহির্ভূত এবং অবৈধ। তাই পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রেসিডেন্টের সমস্ত কাজ এখতিয়ার বহির্ভূত এবং অবৈধ।

৬. সংবিধানে গণভোটের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান যে গণভোট অনুষ্ঠান করেন সেটিও অবৈধ এবং বাতিলযোগ্য।

৭. সংবিধান লংঘন আইনের চোখে একটি গুরুতর অপরাধ এবং চিরদিন অপরাধ হিসেবেই গণ্য হতে থাকবে।

৮. ১৯৭৭ সালের ৭নং মার্শাল ল' রেগুলেশন অবৈধ এবং আইনের শাসন লঙ্ঘন।

এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে হলে এই মামলার উৎস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে পুরাতন ঢাকার ওয়াইজঘাটে অবস্থিত 'মুন সিনেমা' হল সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে এবং সেই সম্পত্তি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রদান করে। তখন ঐ সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য জমির মালিক জনাব মাকসুদ আলম হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। এই সম্পত্তি মালিককে দেয়ার জন্য ১৯৭৭ সালে হাইকোর্ট সরকারকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে, ১৯৭৭ সালের ৭নং সামরিক আইন বিধির (মার্শাল ল' রেগুলেশন)-বলে হাইকোর্টের ঐ নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৯৪ সালে জনাব মাকসুদ আলম হাইকোর্টে পুনরায় রিট পিটিশন করেন। কিন্তু সেই রিট আবেদন পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হয়। বেশ কিছুদিন পর ২০০০ সালে জনাব মাকসুদ আলম মার্শাল ল' বিধি নং ৭-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন। অবশেষে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চটি শুধু ৭নং সামরিক বিধিই নয়, সামরিক আইন জারিকে অবৈধ ঘোষণা করে এক ঐতিহাসিক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দেয়।

॥ তিন ॥

কিছুক্ষণ আগে এই রায়ের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। এখন এই রায়ের সাংবিধানিক তাৎপর্য তুলে ধরছি। বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবির তাদের রায়ে কতগুলো বিষয়কে 'কনডোন' করেছেন, অর্থাৎ মার্জনা করেছেন। কিন্তু যেসব বিষয়কে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। অন্য কথায়, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ঐসব বিষয় বা অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বাতিল অথবা সংশোধন করা হয়েছিলো। হাইকোর্টের আলোচ্য রায়ে ঐসব অনুচ্ছেদ সংবিধানে আবার ফিরে আসবে বা পুনরুজ্জীবিত হবে। এগুলোর ক্ষেত্রে মার্জনার কোনো অবকাশ নেই। এগুলো হলো ঃ

(১) প্রস্তাবনা (২) সংবিধানের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহ ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ ও ১৪২। বিষয়গুলোর কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

১. **প্রস্তাবনা** : ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় একস্থানে বলা আছে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" পক্ষান্তরে পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে ঐ সংশোধনীর উপরে উল্লেখিত প্রস্তাবনাটিও বাতিল হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

২. ৭২-এর সংবিধানের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে : বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" পক্ষান্তরে পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি অর্থাৎ 'বাংলাদেশের নাগরিক' শব্দটি বাতিল হয়ে বাঙালি হবে।

৩. ৭২-এর সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।" পক্ষান্তরে পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।" পঞ্চম সংশোধনীর আলোচ্য অনুচ্ছেদের ১(ক) উপ-অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।" পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা' সংক্রান্ত এই দু'টি উপ-অনুচ্ছেদ বাতিল হবে।

৪. ৭২-এর সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" ১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।" পঞ্চম সংশোধনীতে এই দু'টি অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে এই দুটি অনুচ্ছেদ সংবিধানে আবার ফিরে আসবে।

৫. ৭২-এর সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য–

ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা

খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান

গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার

ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।"

পঞ্চম সংশোধনীতে এই অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়েছিল। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে এই অংশটি আবার সংবিধানে ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

৬. পঞ্চম সংশোধনীর ২৫ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।" ৭২-এর সংবিধানে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক জোরদার করা সম্পর্কে কোনো অনুচ্ছেদ নেই। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে এই উপ-অনুচ্ছেদটিও বাতিল হবে।

৭. ৭২-এর সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকবে না।" পঞ্চম সংশোধনীতে এই অনুচ্ছেদটি বিলোপ করা হয়। এখন পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে ৭২-এর সংবিধানের এই অংশটি আবার ফিরে আসবে।

৮. পঞ্চম সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের প্রস্তাবনা ৮, ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদে বিল পাস হলে ৭ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সেই বিলে সম্মতি দেবেন কিনা, সেই প্রশ্নটি গণভোটে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। যাইহোক, প্রস্তাবনা ও ওপরে উল্লেখিত ৮, ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার জন্য পঞ্চম সংশোধনীতে গণভোটের বিধান রাখা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে গণভোটের এই বিধানটি বাতিল হবে।

॥ চার ॥

প্রিয় পাঠক, আমি প্রথমে বলেছি যে, আমরা এই মুহূর্তে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মন্তব্য করবো না। ঐ সংশোধনী বাতিলের রায় সমন্বয় হলে সংশোধিত সংবিধানের কোন্ কোন্ অনুচ্ছেদ বাতিল হবে এবং ৭২-এর সংবিধানের কোন্ কোন্ অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে সে সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও মন্তব্যবিহীন অবস্থা তুলে ধরলাম। এর ফলে সংবিধান ও আইন-কানুনে তার কি প্রভাব পড়বে এবং রাজনীতি কোন্ ধরনের রূপ নেবে, সেটি সম্মানিত ও বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ নিজগুণে বুঝে নেবেন বলে আশা করি।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ফিরে আসবে অর্থাৎ ৪র্থ সংশোধনী পুনরুজ্জীবিত হবে বলে অনেকে মনে করেন। আমার সেটা মনে হয় না। ৪র্থ সংশোধনী বাতিল মার্জনার মধ্যে পড়বে বলে আমার মনে হয়।

(দৈনিক ইনকিলাব : ১৯/০৫/২০০৯)

www.pathagar.com

(১৯)

রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত হয়ে উচ্চ আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে

হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ যদি দেশের জ্বলন্ত রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের গুরুদায়িত্ব নেয় তাহলে দেশে আর রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থাকার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা ঐ উচ্চ আসনে বসে যদি রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর ওপর সিদ্ধান্ত দেয়া শুরু করেন তাহলে শুধুমাত্র ঐসব বিচারপতিই বিতর্কিত হন না, সেই সাথে তারা উচ্চ আদালতের একটি অঙ্গ হাইকোর্টকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। একটি দেশের এমন কতগুলো বিষয় থাকে এবং এমন কতগুলো প্রতিষ্ঠান থাকে যারা সব সময় সযত্নে নিজেদের রাজনীতির উর্ধ্বে রাখেন। এসব বিষয় হলো– (১) পবিত্র ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ, (২) রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব (৩) সশস্ত্র বাহিনী (৪) বিচারবিভাগ। কেউ কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে পারবে না। মুসলমানরা তাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফ ও হাদিস শরিফের বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি বা অবমাননা বরদাশ্‌ত করে না।

আল্লাহপাক এবং রাসূল সম্পর্কে কোনো তির্যক মন্তব্য তারা সহ্য করে না। হিন্দুরাও তেমনি তাদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ গীতা সম্পর্কে কোনো অবমাননা সহ্য করে না। তেমনি তারা ভগবান এবং দেব-দেবীদের সম্পর্কেও কোনো তির্যক মন্তব্য সহ্য করে না। তেমনি ছোট হোক আর বড় হোক, ধনী হোক আর দরিদ্র হোক, যার যে দেশ সেই দেশটি তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমাদের কাছে বাংলাদেশ তেমনি প্রিয়।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো বাঁকা কথা বরদাশত করা হবে না। সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রকাশ্যে তাদের সমালোচনা করা যাবে না। তাদের সম্পর্কে যদি কোনো কথা থাকে তাহলে সেটাকে রাজনীতির খোরাক না বানিয়ে, মাঠে-ঘাটে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি না করে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা উচিত। এই ৪টি বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র বলেই রাষ্ট্র এদেরকে প্রোটেক্ট করে।

স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ

এসব বিষয়ের অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার তাদেরকে বিশেষ করে সামরিক বাহিনী এবং বিচার বিভাগকে, সর্বোচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি দিয়েছে। তবে এই স্বাধীনতা পেয়ে যদি কেউ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন এবং সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন তাহলে দেখা দেয় বিপদ। সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল যদি অন্যায় করেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে রাষ্ট্রের বা জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশের ক্ষতি হতে পারে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে কোনো রাষ্ট্রের উচ্চ আদালতের কোনো বিচারপতি যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হন অথবা বিশেষ রাজনৈতিক মতাবলম্বী হন তাহলে অনেক বড় বিপদের আংশকা থাকে। কারণ, দুর্নীতির প্রভাবে অথবা দল বিশেষের সাথে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাবে উচ্চ আদালত যদি কোনো মামলার রায় দেন তাহলে সেটা সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েরই ক্ষতি করে। যদি কোনো মিলিটারী জেনারেল অথবা হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে বা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বা রায় দেন তাহলে সেটার প্রতিকার খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রতিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীতে সেকেন্ড ইন কমান্ড যদি কোনো অন্যায় করেন তাহলে সেনাপ্রধানের কাছে তার প্রতিবিধানের একটি রাস্তা খোলা থাকে। তেমনি হাইকোর্ট যদি একটি খারাপ রায় দেয় তাহলে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করার সুযোগ থাকে। কিন্তু সেনাপ্রধান নিজেই যদি কোনো অন্যায় করেন তাহলে প্রতিকারের আর পথ কোথায়? অনুরূপভাবে আপিল বিভাগ নিজেই যদি কোনো অন্যায় বা পক্ষপাতদুষ্ট কোনো রায় দেয় তাহলে আপিল বিভাগের বিরুদ্ধে আপিল করার আর রাস্তা কোথায়? কথায় বলে, 'রাজায় করিছে রাজ্য শাসন/রাজারে শাসিবে কে?'

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে

এসব কথা বলতে হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখে। জরুরি অবস্থা জারীর পর সেনাবাহিনীর সক্রিয় সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমন কিছু কাজ করেছে, যে কাজ বিশাল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে। তেমনি উচ্চ আদালতে এমন কিছু রায় হয়েছে, সেগুলো তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এগুলো দলবিশেষ বা মতবিশেষের পক্ষে চলে গেছে। এ ধরনের রায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সরকার পরিবর্তন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, স্বাধীনতার ঘোষক প্রভৃতি বিষয়। অন্যদিকে সেনাপ্রধান জেনারেল মইন স্বয়ং এমন কিছু উক্তি করেছেন যেগুলো জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানার বিরুদ্ধে যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার সপক্ষে যায়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এখন আর উপেক্ষা করার মতো কোনো বিষয় নয়। এর জনবল দেড় লাখ বলে বিশ্বের একাধিক প্রতিরক্ষা সাময়িকী এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়। সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্য এবং অফিসারদের ব্যাংক এন্ড ফাইল কোনো রাজনৈতিক মত বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু জেনারেল মইনের মতো দুই একজন সুপ্রীম কমান্ডার দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থে তাদের পদ-পদবীকে ব্যবহার করেছেন। এসব কারণেই আজ দেশে একাধিক সামরিক অফিসারের বিচারের প্রশ্ন উঠেছে। এসব কারণেই দেশের একাধিক জাঁদরেল নেতা বলেই ফেলেছেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে রায় দেয়ার কারণে হাইকোর্ট নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

জাতির জনক এবং স্বাধীনতার ঘোষক

বাংলাদেশের সংবিধানে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এবং মরহুম জিয়াউর রহমান, কাউকেই জাতির পিতা অথবা স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে স্থান দেয়া হয়নি। শেখ মুজিবের আমলে দেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। এখানে ছিল বহুদলীয় সংসদীয় সরকার। সেই সংবিধানে শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' অথবা 'স্বাধীনতার ঘোষক' উপাধি দেয়া হয়নি। ৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর মরহুম জিয়াউর রহমানের আমলে দেশের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয়। এটি ছিল বহুদলীয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির। ৬ বছর মরহুম জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তখন তাকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে সংবিধানে বিধৃত করা হয়নি। এরপর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ৯ বছর তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। এই ৯ বছরে সংবিধানে জাতির পিতা বা স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়নি। ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সাল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন যথাক্রমে–বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং পুনরায় বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। ২০০৮ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। এই ৬ মাসে শেখ হাসিনাও শেখ মুজিব এবং জেনারেল জিয়াকে জাতির পিতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটি সামনে আনেননি। আসলে স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৩৮ বছরে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী অর্থাৎ প্রধান ৪টি রাজনৈতিক দলের কোনো দলই জাতির পিতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক ইস্যুটির সাংবিধানিক নিষ্পত্তির কোনো চেষ্টা করেনি।

বিগত বছরগুলোতে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, এইচ এম এরশাদ এবং মাওলানা নিজামী এই দুটি ইস্যুতে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে হয়ত তাদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সেই মতামত তারা সংবিধানের মাধ্যমে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি। তারা সকলেই পলিটিশিয়ান। আর এগুলো হলো রাজনৈতিক ইস্যু। এগুলো শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যু।

রাজনীতি এবং ইতিহাসের ফয়সালায় হাইকোর্ট

স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর সমাধান হতে পারে প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর ঐকমত্যের মাধ্যমে। ভারতে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ও জওহর লাল নেহরু এবং পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খানের স্ট্যাটাস বা অবস্থানের ব্যাপারে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোনো মতদ্বৈধতা ছিলনা। তাই ভারতে মি. গান্ধী হয়েছেন 'মহাত্মা গান্ধী', পাকিস্তানে মি. জিন্নাহ হয়েছেন

www.pathagar.com

'কায়েদে আযম' এবং মি. লিয়াকত আলী খান হয়েছেন 'কায়েদে মিল্লাত'। আমেরিকাতে যেমন কেনেডি এয়ারপোর্ট রয়েছে, তেমনি রয়েছে ওয়াশিংটন নগরী। এমনকি তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের নামেও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক ঘরানার মাঝে আজ ৩৮ বছরেও মৌলিক ইস্যুগুলোতে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভারত এবং পাকিস্তানে কাশ্মির ইস্যুতে তেমন কোনো মতভেদ নেই। পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের ব্যাপারে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশে তেমন কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত সম্ভবত সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' বনাম 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বনাম 'ধর্মভিত্তিক দল' 'জয়বাংলা' বনাম 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'– এসব প্রশ্নেও কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একই অবস্থা জাতির পিতা এবং স্বাধীনতার ঘোষক প্রশ্নেও। একই অবস্থা ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বর প্রশ্নে। এসব প্রশ্নের সমাধান হবে পার্লামেন্টে। এসব প্রশ্নের সমাধান হবে মাঠেঘাটে। আর না হলে বিগত ৩৮ বছরের মতো অমীমাংসিত থেকে যাক। সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট এসে যদি কোনো সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, হাইকোর্টও সেখানে দুইটি মতবাদ বা দুইটি স্রোতধারার যে কোনো একটিতে জড়িয়ে পড়বে এবং অপরপক্ষের কাছে উচ্চ আদালত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। গত মঙ্গলবার যখন এই রিপোর্ট লিখছি তখন টেলিভিশন নিউজ থেকে জানা গেল যে, হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ইতোমধ্যেই আপিল দায়ের করা হয়েছে। যেদিন এই মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে সেদিনের মধ্যে হয়তো আপিলের শুনানি হবে। ৫ম সংশোধনী মামলার মতো সম্ভবত এক্ষেত্রেও এটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হয়তো হাইকোর্টের রায় কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ থাকবে।

রায়টি দারুণভাবে রাজনৈতিক

একই বিচারপতির বেঞ্চ থেকেই ঘোষিত হয়েছে ৫ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে রায়। অবশ্য মহামান্য আপিল বিভাগ ঐ রায়টির কার্যকারিতা স্থগিত রেখেছেন। মহামান্য আপিল বিভাগে এই রায়ের ফলে জাতি সুতীব্রভাবে দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ার বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। এখন স্বাধীনতার ঘোষক প্রশ্নে আপিল বিভাগ কি বলেন, সেটি জানার জন্য জনগণ ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। [সোনার বাংলা ২৬ জুন ২০০৯]

www.pathagar.com

২০

আ'লীগ রাজনৈতিক এজেন্ডাকে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের বিষয় বানাতে চাচ্ছে

'দৈনিক সংগ্রামের' সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই ও বোনেরা, আজকের লেখার শিরোনাম দেখে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হন। লেখাটি যতোই আপনি পড়তে থাকবেন ততোই দেখবেন সুপ্রীম কোর্ট সম্পর্কে আমাদের কোনো রকম বক্তব্য নেই। বরং নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কেউ যদি হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের ঘাড়ে সওয়ার হতে চান তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের যত কথা। দেশে-বিদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কারো কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। বরং এসব প্রতিষ্ঠান এতো মর্যাদাশীল বা এতো স্যাক্রোস্যান্ট, অর্থাৎ পূত-পবিত্র যে এগুলোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ উত্থাপনের কথা কল্পনাতেও আসে না। তেমনি দু'টি প্রতিষ্ঠান হলো বিচার বিভাগ এবং সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী জনগণের পবিত্র আমানত। দেশ রক্ষার মহান কাজে তারা নিয়োজিত। যখন ভিন দেশের সাথে যুদ্ধ লাগে তখন যুদ্ধের ময়দানে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে প্রাণ দিতে হয়। এসব কারণে সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে বেতন ভাতা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে জনগণের তরফ থেকে কোনোদিন কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। কিন্তু সেই সামরিক বাহিনীকে যখন কোনো সেনানায়ক তার উচ্চাভিলাষ বা ক্ষমতালিপ্সার কারণে ব্যবহার করে তখন সাধারণ মানুষের কাছে সমগ্র সামরিক বাহিনী নিয়েই প্রশ্নের অবতারণা হয়। অথচ সেনাবাহিনীর হাজার হাজার জওয়ান এবং মধ্যম স্তরের অফিসার বুঝতেই পারেন না যে, কিভাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন জেনারেল মইন উ আহমদ। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই তার ক্ষমতার বেপরোয়া অপব্যবহার, অর্থলিপ্সা এবং রাজনৈতিক মতলব চরিতার্থ করার ষড়যন্ত্র ফাঁস হচ্ছে। মইন উ আহমদের এসব অপকীর্তিতে যারা তাকে কোলাবরেট করেছেন তাদের নামও পত্রিকায় আসছে। এরা হলেন লেঃ জেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, মেজর জেনারেল আমিন আহমদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফজলুল বারী, লেঃ জেঃ হাসান মশহুদ চৌধুরী প্রমুখ। এইসব কীর্তিমানের কীর্তি কাহিনীর জন্য সেনাবাহিনীর হাজার হাজার অফিসার ও জওয়ান মোটেই দায়ী নন।

একই কথা প্রযোজ্য উচ্চ আদালত সম্পর্কে। সুপ্রীম কোর্টে মহামান্য আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগের কাজ করে যাওয়ার কথা দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইন-কানুনের অধীনে। উচ্চ আদালতের সামনে ব্যক্তি কোনো ফ্যাক্টর নয়। আইনের

www.pathagar.com

প্রিজম দিয়ে তারা দেখবেন এবং বিচার করবেন বিভিন্ন অভিযোগ। সুপ্রীম কোর্টের সামনে তথা তার বিচারপতিদের সামনে রাজনৈতিক দল এমনকি সাধারণ নাগরিকেরও এমন কোনো মামলা নিয়ে যাওয়া উচিত নয় যে মামলার চরিত্র বা উপজীব্য রাজনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক। আপিল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ স্যুয়োমোটো কোনো মামলা করেন না। অর্থাৎ তারা নিজ উদ্যোগে মামলা করেন না। কিন্তু যদি কেউ এমন কোনো মামলা বিচারপতিদের সামনে নিয়ে যায়, যেটি রাজনীতি-কেন্দ্রিক অথবা ইতিহাস নির্ভর, তাহলে সেটা বিচারপতিদের জন্য কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করতেও পারে। অতীতে এদেশে এক বা একাধিক রাজনৈতিক নেতা গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। যিনি বা যারা নিহত হয়েছেন তারা অনেক বড় রাজনৈতিক নেতা। যাদের গুলীতে তারা নিহত হয়েছেন তারা সেনাবাহিনীর লোক। হত্যাকান্ড হিসেবে যখন এসব মামলা আদালতে ওঠে তখন অনেক বিচারক সেই মামলার শুনানিতে বিব্রতবোধ করেন। বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। মুজিব হত্যা মামলায় একাধিক বিচারপতি বিব্রতবোধ করেছেন। সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি মামলা উচ্চ আদালতে গেছে যেগুলো চরিত্রগতভাবে 'হাইলি পলিটিক্যাল'। সাধারণভাবে বলতে গেলে উচ্চ আদালত এ ধরনের রাজনৈতিক মামলা গ্রহণ করতেও পারে, আবার নাও পারে। তারা বলতে পারেন যে, এসব রাজনৈতিক মামলা আদালতে না এনে আপনারা এগুলো রাজনীতির ময়দানে অথবা পার্লামেন্টের ফ্লোরে ফয়সালা করুন। আর যদি মামলাটি গ্রহণ করেন তাহলে তিনি বা তারা যে রায়টিই দেন না কেন, সেই রায়টি দেশে বিরাজমান দু'টি বিপরীতমুখী রাজনৈতিক স্রোতধারার যে কোনো একদিকে চলে যায়।

॥ দুই ॥

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, বিতর্কিত রাজনৈতিক ইস্যুর ফয়সালা বিবদমান সব দলকে একসাথে খুশি বা সন্তুষ্ট করতে পারে না। রাজনৈতিক বিতর্ক এমন একটি বিষয় যেটি বিবদমান সব পক্ষকে একসাথে খুশি বা সন্তুষ্ট করতে পারে না। এক পার্টি খুশি হলে আরেক পার্টি অখুশি হয়। যে পার্টি অখুশি হয় সেই পার্টিকে আইনের পরিভাষায় বলা হয় সংক্ষুব্ধ পার্টি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ল্যান্ডসক্কেপ অন্য আর ১০টি দেশের মতো নয়। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতি, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, জয় বাংলা বনাম বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, সমাজতন্ত্র বনাম মিশ্র অর্থনীতি-এসব ইস্যুতে দেশ সুস্পষ্টভাবে দুইটি মতাদর্শে বিভক্ত। আপনার পছন্দ হোক আর না হোক, ভাল হোক আর খারাপ হোক, এটিই হলো এ দেশের কঠোর রাজনৈতিক বাস্তবতা। এসব ইস্যুতে যে রাজনৈতিক বিভাজন বিরাজমান সেই বিভাজনের উভয়দিকেই কোটি কোটি মানুষের অবস্থান।

www.pathagar.com

মাননীয় বিচারপতিরা যদি এই ধরনের স্পর্শকাতর রাজনৈতিক মামলা বিচারের আওতায় আনেন তাহলে তিনি যে রায়টিই দেন না কেন, সেই রায়টি বিভাজন রেখার যে কোনো একধারে চলে যাবে। ফলে এই রায়টির পক্ষে যেমন অসংখ্য লোক থাকবে তেমনি বিপক্ষেও অসংখ্য লোক থাকবে। এজন্য এসব মামলা আইনের আওতায় না আনাই ভাল।

এই ধরনের মামলায় বিচারপতি যে রায় দেবেন সেই রায়টিকে কোনো একপক্ষ তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে যদি ব্যবহার করে তাহলে সেটি হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। দুঃখের বিষয়, তেমন একটি কাজ করারই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। সেই কথাটি বলার সময় তিনি কোনো অস্পষ্টতার আশ্রয় নেননি। গত বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই একটি সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে আইনমন্ত্রী বলেছেন, সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ জন্য সরকার আপিল বিভাগের একটি রায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট বিভাগ যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের ওপর সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে সরকার একটি ইতিবাচক রায় শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বলেন, ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে সুপ্রীম কোর্ট একটি রায় দিয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। "যদি সুপ্রীম কোর্টের রায় আমাদের পক্ষে আসে তাহলে ১৯৭২ সালের সংবিধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।" এরপর ঐ ভাষণে আইনমন্ত্রী থলের বিড়াল বের করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "পার্লামেন্টের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কিছু সমস্যা আছে। সে কারণে আমরা সুপ্রীম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছি।"

॥ তিন ॥

এখানেই আইনমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারের মতলব খুব পরিষ্কার। তারা ১৯৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করবেন, কিন্তু পার্লামেন্টের মাধ্যমে সেটি করবেন না। সেটি করবেন সুপ্রীম কোর্টের কাঁধে বন্দুক রেখে। এইখানে আসে অনেক প্রশ্ন। পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের রয়েছে ব্রুট মেজরিটি। সংবিধানের মৌলিক বিষয়ের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু হাসিনা-এরশাদ কোয়ালিশন সরকারের রয়েছে চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। যদি তারা পার্লামেন্টে ৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো বিল উত্থাপন করে তাহলে সেটা পানির মত সহজভাবে পাস হবে। সেটিই তো সংসদীয় পন্থা। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ বাঁকা পথে সুপ্রীম কোর্টের কাঁধে সওয়ার হতে চায় কেন? এখানেই রয়েছে রহস্য। তার বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী বলেছেন যে, পার্লামেন্টের মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করতে গেলে কিছু 'অসুবিধা' হবে। কিন্তু কি সেই 'অসুবিধা' সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলেননি। সেইসব মুশকিল আসানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবহার করতে চাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টকে। এর জন্য সুপ্রীম কোর্ট মোটেই দায়ী নয়। দায়ী হল তারা যারা সুপ্রীম কোর্টের রায়টিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

আসলে পার্লামেন্টের মাধ্যমে করলে অসুবিধা কি হতে পারে, সেগুলো আগে দেখা যাক। প্রথমত, পার্লামেন্টে গেলে তাদেরকে একটি বিল উত্থাপন করতে হবে। সেই বিলে তাদেরকে বলতে হবে যে, কেন তারা ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে চায়? তখন তাদের বলতে হবে যে, তারা বর্তমান সংবিধানে 'বিধৃত' 'আল্লাহর প্রতি ঈমান' কেটে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা বসাতে চায়। তাদের বলতে হবে, তারা ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করবে, কিন্তু কমিউনিস্ট রাজনীতি চালু রাখবে।

এই বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হলে তারা ব্রুট মেজরিটির জোরে সেই বিল সংসদে পাস করিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সেই বিলের ওপর যখন আলোচনা হবে তখন বিরোধী দলের অর্থাৎ বিএনপি এবং জামায়াত সদস্যরা সংখ্যায় কম হলেও কথা বলতে কসুর করবেন না। তারা বলবেন যে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে 'ইসলামী মূল্যবোধ' উঠিয়ে দিতে চায়, ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' হিসেবে বাতিল করতে চায়। 'জয় বাংলাকে' রাষ্ট্রীয় শ্লোগান করতে চায়, 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নামে ধর্মহীনতা কায়েম করতে চায়। এই ধরনের বিলের বিরুদ্ধে বিরোধীদল পার্লামেন্টের ভেতরে সংগ্রাম করবে, বাইরে ও রাজপথে লড়াই করবে। সেই ধকলটি সইতে হবে পার্লামেন্টকে এবং বাইরে আওয়ামী লীগকে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট যদি পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় বহাল রাখে তাহলে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয়তায় ধস নামার এই ঝুঁকি থেকে বেঁচে যায়।

মানুষ জানে না, উচ্চ আদালতের রায় কি হবে। (দৈনিক সংগ্রাম : ১৯/০৭/২০০৯)

www.pathagar.com

২১

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে দেশের আদর্শিক ভিত নড়ে যাবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ৩৭ বছর পূর্ণ হলো। গত ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ৩৮ বছরে পা দিলো। এর আগে ৩৬ বছর পার হয়ে গেল, তখন যুদ্ধাপরাধীদের এমন সরব বিচারের দাবি ওঠেনি কেন? ২০০৭ সালে অর্থাৎ ৩৭ বছর পরে হঠাৎ করে এই দাবিটি উত্থিত হলো কেন? কোথা থেকে কেমন করে আকস্মিকভাবে উদিত হলো সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম? তাদের আবির্ভাবের নেপথ্যে রয়েছেন কোন কুশীলব? সেদিন তারা একটি সম্মেলন করলেন। সেখানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থেকে ইস্যুটি হঠাৎ করে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে গিয়ে ঠেকলো কেন? তাহলে মূল ইস্যুটি কি? ওয়ার ক্রাইমের সাইন বোর্ডের আড়ালে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করাই কি ওদের আসল দাবি? 'সোনার বাংলার' সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এসব কথার মাধ্যমে আমি এটা বলছি না যে, আমি যুদ্ধাপরাধের বিচার করার বিরোধিতা করছি। আইন-কানুনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কেউ যদি যুদ্ধাপরাধী হয়ে থাকে তাহলে তার বিচারে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার আগে যারা যাকে ইচ্ছা তাকে যুদ্ধাপরাধী বলবেন সেটা ওদের ভাষায় 'মুক্তবুদ্ধির মানুষ' হিসেবে কেউ মেনে নিতে পারেন না। আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের জীবনে ৩৭ বছর পার হয়ে গেল। সেক্টর কমান্ডারস ফোরামে যাদের সংখ্যা এবং দাপট বেশি তারা দুই দুইবার ক্ষমতায় ছিলেন। প্রথমবার স্বাধীনতার অব্যবহিত পর। দ্বিতীয়বার ৯০ দশকের মধ্যভাগে। তখন তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলেন না কেন? দু'টি মেয়াদে তারা ৮ বছর ৮ মাস, অর্থাৎ প্রায় নয় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এছাড়া প্রধান বিরোধী দল হিসেবেও জাতীয় সংসদে ছিলেন ১৫/১৬ বছর। তখন তারা যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করলেন না কেন?

এই দাবির নেপথ্য রহস্য

যারা ২৩/২৪ বছর ধরে জাতীয় সংসদ নামক সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠানটির ডানধারে বা বামধারে ছিলেন তারা যুদ্ধাপরাধীর বিচারও করলেন না, অথবা তাদেরকে শনাক্তও করলেন না। অথচ ৩৭ বছর পর আজ তারা আবার সেই বিচারের আওয়াজ তুলেছেন। আজ তারা বিচার দাবি করছেন এমন একটি সরকারের নিকট, যে সরকার সম্পূর্ণ অনির্বাচিত। যারা এসেছেন একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার নিয়ে। সংবিধান মোতাবেক ৩ মাসের মধ্যে ইলেকশন দিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা

www.pathagar.com

হস্তান্তরের কথা। সেই সময়সীমা বর্তমান সরকার রক্ষা করতে পারেনি। সেটি অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আসল কথা হলো, এমন একটি অনির্বাচিত ও স্বল্পমেয়াদী সরকারের নিকট তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাচ্ছেন কেন? জনগণ এই সরকারকে সেই ম্যান্ডেট দেয়নি। আর সংবিধানও তাদেরকে সেই কর্তৃত্ব দেয়নি। এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি তাদের সরকারের আমলে লম্বা সময় ধরে সেনাপ্রধান ছিলেন। তখন তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবি উত্থাপন করেননি কেন? এদের মধ্যে আরেক ব্যক্তি আছেন যিনি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে সেনাপ্রধান ছিলেন। তখন তিনি কেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নিকট এই দাবি উত্থাপন করেন নি? সেই আমলেই তো দালাল আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই আমলেই তো দালালদেরকে ক্ষমা করা হয়। সেই আমলেই তো সরকারের তালিকা মোতাবেক ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার পাক সৈন্যকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদের মধ্যে আরেকজন ঐ সময় বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন। এরা দু'জন অর্থাৎ একজন সেনাপ্রধান ও একজন বিমান প্রধান ছিলেন। সেনা বাহিনীর এই দু'টি সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে তারা স্বাধীনতার প্রথম সরকারের সাথে কতবার দেন-দরবার করেছেন? আমরা জানি তারা কিছুই করেননি। তারা মনে করেন, আন্তর্জাতিক আবহাওয়া তাদের অনুকূল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইঙ্গ-মার্কিন, ইহুদী ও ভারত এক কাতারে শামিল হয়েছে। টার্গেট মুসলিম পুনর্জাগরণ প্রতিহত করা এবং সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া।

ধর্মীয় রাজনীতি এবং বাংলাদেশের আদর্শিক ভিত

বাংলাদেশে যদি ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক এবং আদর্শিক ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করা হবে। এই কথাটি আজ স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে। 'উইকিপিডিয়ার' মত বিশ্ববিখ্যাত তথ্য ভাণ্ডারেও বলা হয়েছে যে, সাবেক পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সীমানার ভিত্তি হলো ধর্মীয়। অন্যেরা 'ধর্মীয়' শব্দের বদলে বলেছেন 'সাম্প্রদায়িক' বিভাজন। তদানীন্তন পূর্ববাংলা বা পূর্ব -পাকিস্তানের ভিত্তি যদি হয় ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক তাহলে বর্তমান বাংলাদেশের ভিত্তিও হলো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক। কারণ তৎকালীন মুসলিম লীগ তথা মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রবল বিরোধিতার মুখেও মুসলমানদের ঘাড়ে যে খণ্ডিত বাংলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, প্রথমে সেই বাংলার নাম দেয়া হয় 'পূর্ব বাংলা'। এরপর তার নাম হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ সেই পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানই স্বাধীন ও সার্বভৌম

www.pathagar.com

ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই নতুন সত্তার নাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানা এক এবং অভিন্ন। যেটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান, সেটির সীমানা এবং মানচিত্রের এক ইঞ্চি পরিবর্তনও ঘটেনি। নতুন বাংলাদেশের মানচিত্রে বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্ট বা লোকসভায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেন, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আজ বাংলাদেশের জন্ম হলো। এর ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবসান হলো। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সেদিন খুব বড় একটি ভুল কথা বলেছিলেন। আসলে বাংলাদেশের জন্মের ফলে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবসান হয়নি। বরং বাংলাদেশের জন্মের ফলে এই উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্ব নয়, বরং ত্রিজাতি তত্ত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে। এই তিনটি জাতি হলো– ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। এই বিষয়টি ভালভাবে বোঝা এবং হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জন্মের গোড়ার কথায় ফিরে যেতে হবে।

৩রা জুন পার্টিশন প্ল্যান

১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে একভাগ পাকিস্তান ও একভাগ ভারতে যাবে। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলি এবং লর্ডসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিসটল বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মাধ্যমে ভারত বিভক্তি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেন তা যুগপৎ ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়। বাংলা এবং পাঞ্জাব আইনসভাগুলোকে (ইউরোপীয় সদস্য ছাড়া) আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করার জন্য বলা হয়। এই দুটি প্রদেশের মুসলমান ও হিন্দুপ্রধান জেলাগুলোর সদস্যরা আলাদাভাবে বসবেন। মুসলিম ও হিন্দু প্রধান জেলাগুলো হলো :

১. **চট্টগ্রাম বিভাগ:** (ক) চট্টগ্রাম (খ) নোয়াখালি (গ) ত্রিপুরা।
২. **ঢাকা বিভাগ :** (ক) বাকেরগঞ্জ (খ) ঢাকা (গ) ফরিদপুর (ঘ)ময়মনসিংহ।
৩. **রাজশাহী বিভাগ :** (ক) বগুড়া (খ) পাবনা (গ) রাজশাহী (ঘ) রংপুর (ঙ) দিনাজপর (চ) মালদা।
৪. **প্রেসিডেন্সী বিভাগ :** (ক) যশোহর (খ) মুর্শিদাবাদ (গ) নদীয়া।

অতঃপর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণের পদ্ধতি বলা আছে নিচের আদেশে–

www.pathagar.com

"গভর্নর জেনারেল একটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করবেন। এই কমিশনকে পাঞ্জাবের সীমানা দুইভাগে ভাগ করার নির্দেশ দেয়া হবে। এর ভিত্তি হবে মুসলিম ও হিন্দুপ্রধান এলাকার সংলগ্ন এলাকা নির্ধারণ। অন্যান্য বিষয় বিবেচনার জন্যও কমিশনকে বলা হবে। বাংলার সীমানা কমিশনকেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হবে।" আসাম সম্পর্কে ভারত বিভক্তির প্ল্যানে বলা হয়েছে- "যদি সিদ্ধান্ত হয় যে বাংলা ভাগ হবে, তাহলে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই গণভোটে সিদ্ধান্ত হবে সিলেট আসামের একটি প্রদেশ থাকবে না-কি পূর্ববঙ্গ নামক নয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে।" বাংলা বিভাগ হবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ওপরে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই গণভোটে ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৬শ' ৬০টি ভোট পড়ে। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গে যোগ দেয়ার পক্ষে পড়ে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬শ' ১৯ ভোট ও আসামে থাকার পক্ষে পড়ে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪১ ভোট। অর্থাৎ, মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে যোগ দেয়ার পক্ষে পড়ে ৫৫ হাজার ৫শ' ৭৮টি বেশি ভোট। বাংলার দুই অংশকে ভাগ করার জন্য বাউন্ডারী কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই বিভক্তির ভিত্তি হবে মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান সংলগ্ন এলাকা নির্ধারণ করা। এটা করতে গিয়ে তারা 'অন্যান্য বিষয়ও' বিবেচনা করবেন। যদি গণভোটে সিলেট পূর্ববঙ্গের সাথে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে বাউন্ডারী কমিশন সিলেট জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নির্ধারণ করবেন এবং আসামের সন্নিহিত জেলাগুলোর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহও নির্ধারণ করবেন।

বাংলা ও আসাম বিভক্তি : ভিত্তি হলো হিন্দু-মুসলমান

উপরে এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব তথ্য পরিবেশিত হলো সেসব তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলা এবং আসাম বিভক্তির প্রধান মাপকাঠিই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং সেই অঞ্চল সংলগ্ন অমুসলিম এলাকা চিহ্নিত করা। এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তার সাথে সংলগ্ন অমুসলিম এলাকা নিয়ে গঠিত হবে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। এই বিঘোষিত নীতির ভিত্তিতে যদি সীমানা চিহ্নিত হতো তাহলে পূর্ববঙ্গের চেহারা ভিন্ন হতো। বর্তমানে যে এলাকা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত সেই এলাকা আরো বড় ও সম্প্রসারিত হওয়ার কথা ছিল। ৩রা জুন পার্টিশন প্ল্যান মোতাবেক যদি বাংলার বিভক্তি ঘটতো তাহলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া এবং দিনাজপুর জেলা সাবেক পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকতো। অনুরূপভাবে সিলেটের করিমগঞ্জ এবং আসামের কাছাড়,ধুবড়ি এবং হাইলাকান্দিও বাংলাদেশের অংশ হতো। ৬টি জেলা অর্থাৎ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর, কাছাড় ও করিমগঞ্জ এবং দুটি মহকুমা অর্থাৎ হাইলাকান্দি ও ধুবড়ি যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতো সেটির ভিত্তি হতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কারণ এই

www.pathagar.com

৬টি জেলা এবং ২টি মহকুমার সবগুলোতেই মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সাথে ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত বা সংলগ্ন এলাকাও বাংলাদেশে যোগ দেয়ার কথা। ভৌগোলিক সংলগ্নতার এই ফর্মুলায় জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও ত্রিপুরা বাংলাদেশের অংশ হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে ২৪পরগোনা জেলার বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমা এবং যশোর (বর্তমান) জেলার বেনাপোল ও বোনগাঁ, তৎকালীন পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশে যোগ দিতো। মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, বেনাপোল, বনগাঁ, বারাসাত ও বসিরহাট বাংলাদেশের অংশ হলে কোলকাতা বাংলাদেশের ভাগে পড়তো। কোলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অংশ করার জন্যই কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার যদি বাংলাদেশের অংশ হতো তাহলে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের অধিকারী দার্জিলিং আজ বাংলাদেশের হতো। অনুরূপভাবে নয়নাভিরাম কাঞ্চনজঙ্ঘাও আজ আমাদের সম্পদ হতো।

বাংলাদেশের ভিত্তি হিন্দু-মুসলিম বিভাজন

আজ যিনি যত কথাই বলুন না কেন, সাবেক পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভাজনের ভিত্তি হলো ১৯৪৭ সালের ৩ জুনের পার্টিশন প্ল্যান। এই পার্টিশন প্ল্যান মোতাবেক অবিভক্ত বাংলার সংসদ সদস্যরা দুইভাগে বিভক্ত হলো। অবিভক্ত বাংলার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ১৯৪৭ সালের ২০ জুন যুক্ত বাংলার মুসলিম ও হিন্দু সদস্যরা আলাদা আলাদা বৈঠকে মিলিত হন। মুসলিম সদস্যরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলাকে এক ও অবিভক্ত রাখার পক্ষে ভোট দেন। পক্ষান্তরে হিন্দু সদস্যরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হিন্দু প্রধান ও মুসলিম প্রধান এলাকা এই ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করার পক্ষে ভোট দেন। তখন মুসলমানরা বলেন যে, বাংলাকে যদি ভাগ করতেই হয় তাহলে হুগলি তথা ভাগিরথী নদীকে বিভাজন রেখা করা হোক। এ ক্ষেত্রে ভাগিরথীর পূর্বতীরের অংশ হবে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তান এবং পশ্চিম তীরের অংশ হবে পশ্চিম বাংলা তথা ভারত। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাবও মেনে নেয়নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের আপোষহীন দাবির ফলে বাংলা ভাগ হয়। আমরা পাই খণ্ডিত বাংলা। এই খণ্ডিত বাংলাকে পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন, 'পোকা খাওয়া খণ্ডিত বাংলা'। সেই পোকায় খাওয়া বাংলাই আজকের বাংলাদেশ। যদি হিন্দু-মুসলমান প্রধান এলাকা বাংলা বিভক্তির ভিত্তি হতো তাহলে ভারতীয় দিনাজপুরসহ আরো বেশ কয়েকটি জেলা ও মহকুমা বাংলাদেশের অংশ হতো। যে ধর্মীয় বিভাজন সাবেক পূর্ব বাংলার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভিত্তি সেই বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি যে নড়বড়ে হয়ে যায়।

সোনার বাংলা ২৮/৩/২০০৮

www.pathagar.com

(২২)

পৃথিবীর অন্তত ৫২টি দেশে খ্রিস্টান ধর্মের নামে একাধিক দল রয়েছে

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে। কমিশনের গঠনপ্রণালী এবং সদস্যদের নিয়োগ অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের (১) থেকে (৬) উপ-অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সংবিধানের ১৯৯ অনচ্ছেদের (১)-এ [ক] [খ] [গ] [ঘ] এবং ১১৯ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদে স্পটভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারা ভোটার হওয়ার যোগ্য, কারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য বা অযোগ্য, সেগুলোও সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের (১) উপঅনুচ্ছেদ এবং (২) উপ-অনুচ্ছেদের [ক] [খ] [গ] [ঘ] ধারায় এবং ৬৬ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) উপ-অনুচ্ছেদ এবং (২) উপানুচ্ছেদের [ক] থেকে [ছ] পর্যন্ত ধারায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সংবিধানে এমন স্পষ্ট অনুচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হয়েও নির্বাচন কমিশন এমন সব কাজে হাত দিচ্ছে যেসব কাজ করার কোনো দায়িত্ব অধিকার বা এখতিয়ার এই সংবিধান তাদের দেয়নি। ফলে ওই ধরনের যেসব কাজে নির্বাচন কমিশন হাত দিচ্ছে সেই কাজগুলো সংবিধানের পরিপন্থী এবং সংবিধান লংঘন হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। তেমনি অনেকগুলো অসাংবিধানিক কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে নিবন্ধন পাওয়ার জন্য ইসলামী দলগুলোর গঠনতন্ত্র সংশোধন। আরেকটি হলো ১৯৭২ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনী অধ্যাদেশ। নির্বাচন কমিশন বলেছে যে, রাজনৈতিক আচরণবিধি এবং জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ পূরণ না করলে রাজনৈতিক দলসমূহকে নিবন্ধিত করা হবে না। আর নিবন্ধিত না হলে ওইসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়বে। সুতরাং দেখা যাছে যে, গঠনতন্ত্রে নির্বাচন কমিশনের বাঞ্ছিত সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত না করলে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলো আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

সংবিধানে নিবন্ধনের স্থান নেই

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কিত ১১ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" ৩২ অনুচ্ছেদে

www.pathagar.com

বলা হয়েছে, "আইনে বিধৃত সীমাবদ্ধতা ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।" এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক হলো সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ অনুচ্ছেদ। এসব অনুচ্ছেদে চলাফেরা করা, সমাবেশ করা, সংগঠন বা সমিতি করা এবং সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে নিবন্ধিত হতেই হবে। সংবিধানের ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, তার অধীনে অসংখ্য উপানুচ্ছেদ এবং সেগুলোর অসংখ্য সংশোধনী ও তফসিলের কোথাও নিবন্ধনের কথা উল্লেখ নেই। তবুও নিবন্ধনের এই বিধান চালু করা যেতে পারে যদি রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতিক্রমে সেগুলো অনুমোদিত এবং গৃহীত হয়।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তখন বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, তারা খাতায় নাম লিখে, রেজিস্ট্রি করে রাজনীতি বা পার্টি করবেন না। তাদের বিরোধিতার মুখে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধনের উদ্যোগ ভণ্ডুল হয়ে যায়। আজ যদি সেই কাজটি করতেই হয় তাহলে সকলের মতামত নিয়ে সেটি করতে হবে। এবং পরবর্তী সংসদে সেটি পাস করতে হবে। অন্যথায় নির্বাচন কমিশনের এই নিবন্ধন প্রক্রিয়া বেআইনী ও অসাংবিধানিক বলে পরিগণিত হবে।

ইসলামী দলসমূহের গঠনতন্ত্র সংশোধন

এ প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন এবং ইসলামী দলসমূহের নিবন্ধন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর সর্বশেষ সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, গঠনতন্ত্রে বর্ণিত রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য যদি হয় সংবিধান পরিপন্থী তাহলে সেসব দল নির্বাচিত হতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, সংবিধানের ২(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রের শান্তিতে পালন করা যাইবে। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) (ক) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' নির্বাচন কমিশনকে এখন ভেবে দেখতে হবে যে, যেসব দলের গঠনতন্ত্রে এখনও সমাজতন্ত্রকে তাদের মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের সেই ঘোষণা সংবিধানের ২(ক) এবং ৮(১) [ক] অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কিনা। যদি পরিপন্থী হয় তাহলে ইসলামী দলগুলোর গঠনতন্ত্র সংশোধনের আগে ওইসব দলের নিবন্ধন হবে কিনা সেটি তাদের বিবেচনা করতে হবে। ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের কোন কোন ধারা সংশোধন করতে হবে, সেটাও নির্বাচন কমিশনকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৭২ সংশোধনী প্রত্যাখ্যান

গত ১৯ আগস্ট গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। দেশের সবগুলো বড় রাজনৈতিক দল যথা– আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী এবং বামপন্থী দলসমূহ সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামী দলগুলো নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়া বা অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের মাথায় কেন এলো সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। একথা ঠিক যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। একথাও ঠিক যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আমাদের সাংবিধানিক ম্যান্ডেট। তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। বাংলদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৩৭ বছরে একবারই মাত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। সেটাও ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অথচ সেখানে 'হিন্দুত্ববাদী' সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। তারা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতায়ও এসেছে একাধিকবার। আজও গুজরাটে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চলছে। মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে, এই অভিযোগে ভারতীয় কাশ্মীরে প্রবল গণআন্দোলন চলছে। আন্দোলন দমন করার জন্য কাশ্মীরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৫ বছরে একবারও এরকম ঘটনা ঘটেনি। অথচ তারপরেও নির্বাচন কমিশন ইসলামী দলগুলোর প্রতি এলার্জিক।

ইউরোপ ও আফ্রিকায় খ্রিস্টান রাজনীতি

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রায়শই ইউরোপের তুলনা দেয়া হয়। কিন্তু ইউরোপ ও আফ্রিকাতেও খ্রিস্টান ধর্মের নামে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল পরিচালিত হচ্ছে। নমুনা হিসেবে আমি কয়েকটি দলের নাম উল্লেখ করছি।

১. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব নেদারল্যান্ডস
২. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আলবেনিয়া
৩. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব অস্ট্রেলিয়া
৪. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব বলিভিয়া
৫. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব চিলি
৬. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব কিউবা

www.pathagar.com

৭. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব চেকোশ্লোভাকিয়া
৮. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব ডেনমার্ক
৯. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব এল সালভাদর
১০. হাইতিয়ান ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি
১১. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব হন্ডুরাস
১২. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব পাপুয়া পানামা
১৩. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব পাপুয়া নিউগিনি
১৪. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব সামোয়া
১৫. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (দক্ষিণ আফ্রিকা)
১৬. ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব সাউথ আফ্রিকা

এসব দেশে খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক দল নিয়ে সরকার প্রশাসন বা সুশীল সমাজ মাথা ঘামায় না। এসব দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টিকে প্রপাগান্ডা ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। বিষয়টি জনগণের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। আমাদের নির্বাচন কমিশনের মতো তাদের নির্বাচন কমিশন এসব বিষয় নিয়ে গলদঘর্ম হয় না।

প্রসঙ্গত আরো জানাতে চাই যে, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, কানাডা, ক্রোয়েশিয়া, এস্টোনিয়া ফিজি, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জিব্রাল্টার, হাঙ্গেরী, আয়ারল্যান্ড, ইটালী, ম্যাসিডোনিয়া, লেবানন, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা মেক্সিকো, মোল্ডাভিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, ফিলিপাইন, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, সার্বিয়া স্লোভেনিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, সিরিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি দেশেও খ্রিস্টান ডেমোক্র্যোটিক দল বা ইউনিয়ন রয়েছে। এগুলোর কোনো কোনো দেশে খ্রিস্টান ডেমোক্র্যাটিক নাম দিয়ে ৩ থেকে ৫টি রাজনৈতিক দল রয়েছে। সেজন্য আমাদের দেশের মতো বা নির্বাচন কমিশনের মতো এসব দেশকে বা এসব রাজনৈতিক দলকে কেউ মৌলবাদী বলে গালাগালি করে না।

(দৈনিক ইনকিলাব ২৭/৮/২০০৮)

www.pathagar.com

২৩

সংবিধানে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের কোনো স্থান নেই

রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ করে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন নিয়ে মহল বিশেষ থেকে ধূম্রজাল সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ২০০৮ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের দোহাই পাড়া হচ্ছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিকে এক বিশাল রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। একজন সুপরিচিত আইনজীবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এখনও বলবৎ রয়েছে। এই আইনের অধীনেই শায়খ আবদুর রহমানের জেএমবি, বাংলা ভাইয়ের জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাতুল হিকমা এবং মুফতি হান্নানের হরকাতুল জিহাদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এই আইন এখনও পূর্ণভাবেই কার্যকর রয়েছে। তার মতে, ওই আইনের একটি ধারা যদি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সেই একই আইনের অন্য কোনো ধারা রাজনীতির অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না কেন? এই আইনজীবীর নাম ড.শাহিদান মালিক। আলোচ্য ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত তার বক্তব্য মোতাবেক ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন (এসপিএ) ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এই আইনটির সাথে এখন যুক্ত হয়েছে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ। এই আদেশটি এখন ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নির্বাচন কমিশনে যদি কোনো দল নিবন্ধিত না হয় তাহলে সেই দল আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয় অথবা তাদের বক্তব্য মোতাবেক এই ব্যাখ্যার যদি কঠোর প্রয়োগ হয় তাহলে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মতো বড় বড় রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বিশেষ ক্ষমতা আইন (এসপিএ) এবং জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও) মোতাবেক ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধিত হতে পারবে কিনা এবং আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কিনা সেই বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য নির্বাচন কমিশন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে বলে ইংরেজি দৈনিকটির খবরে প্রকাশ। এই কমিটি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দাখিল করবে।

বিশেষজ্ঞ কমিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসমূহ পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা করার প্রধান পয়েন্ট হবে তাদের গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোনো ধারা বা অনুচ্ছেদ ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গভেদে জনগণের মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করে

www.pathagar.com

কিনা। বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে যদি প্রতীয়মান হয় যে, এক বা একাধিক দলবিশেষের গঠনতন্ত্র জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তাহলে সেসব দলকে নিবন্ধন না করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্বাচন কমিশনের নিকট সুপারিশ করবে। নির্বাচন কমিশন যদি সেই সুপারিশ গ্রহণ করে তাহলে ওইসব দল নিবন্ধিত হবে না। অর্থাৎ ওইসব দল পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

॥ দুই ॥

এসপিএ'র ২০ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সাম্প্রদায়িক সমিতি বা ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন না অথবা সদস্য হতে পারবে না অথবা ওই ধরনের সমিতির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, যে ধরনের সমিতি ধর্মের নামে রাজনীতি করবে অথবা যাদের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকবে। এই ধরনের সমিতি বা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতিও এসপিআরে বিধৃত রয়েছে। সেই ব্যবস্থার মধ্যে কারারুদ্ধ করার বিধানও রয়েছে। আরপিওতে বলা হয়েছে, কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের যোগ্য হবে না যদি তারা জাতি ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও লিঙ্গভেদে মানুষে মানুষে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। আইনবিদদের বরাত দিয়ে এই ইংরেজি পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইসলামী দলগুলো যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে তাহলে তারা ইসির নিবন্ধন পাবে না। যদি তাদের গঠনতন্ত্রে ধর্মের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক বিধান থাকে তাহলে পরিষ্কারভাবে তারা আরপিওর সংশ্লিষ্ট বিধান লঙ্ঘন করছে বলে গণ্য হবে। দেশের প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন করে ইসির কেউ যদি সেই রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন দেয় তাহলে তাকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আইনজ্ঞদের বরাত দিয়ে এই হুমকি দিয়েছে ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাটি। ওই পত্রিকাটির রিপোর্ট মোতাবেক, বিশিষ্ট আইনবিদ ড.শাহিদান মালিক বলেছেন, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের যেসব শর্ত আরপিওতে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেসব শর্ত এসপিএ'র ২০ ধারার সাথে সংগতিপূর্ণ। এই ২০ ধারায় রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে এই নিষেধাজ্ঞাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এসপিও মোতাবেক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের কোনো সুযোগ নেই। আরপিও'র এই সংশ্লিষ্ট ধারাকে সমর্থন করতে গিয়ে ইসি বলেছে, তারা নতুন কিছুই করেননি। তারা সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। ২৮ অনুচ্ছেদের (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।" ২৮ অনুচ্ছেদের (৩) উপানুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে

www.pathagar.com

কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না"। ইসি আরো বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যখন সংলাপ হয় তখন দলগুলো দাবি করেছিল যে, সংবিধানের এই অনুচ্ছেদটি বিবেচনায় রেখে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হোক। ইসি তখন তাদের বলেছিলেন, সময় হলে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করবেন। এখন এই মহলটি দাবি করছে, এখন সময় এসেছে। সুতরাং বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।

॥ তিন ॥

এগুলো ছিল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার সপক্ষে অথবা রেজিস্ট্রেশন না দেয়ার সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি। এসব যুক্তির ভিত্তিতেই মহল বিশেষ ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করার জন্য গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই শক্তিশালী প্রচারণার মুখে নির্বাচন কমিশন কি করে সেটি এখন দেখার বিষয়। এগুলো হলো চিত্রের এক পিঠ। চিত্রের এই পিঠটি অস্বচ্ছ এবং অস্পষ্ট। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হবে কিনা। স্পষ্ট করে বলা হয়নি, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীগতভাবে ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করছে কিনা। কিন্তু চিত্রের রয়েছে আরেকটি পিঠ। এই পিঠ অত্যন্ত স্বচ্ছ, অত্যন্ত পরিষ্কার। চিত্রের এই পিঠ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সংবিধানে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের কোনো বিধান নেই। সেই আলোকে বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সংবিধানে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে। বলা হয়েছে 'রাজনৈতিক দল' বলতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত যে অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনো নামে কাজ করেন এবং কোনো রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ হতে পৃথক কোনো অধিসঙ্ঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন।' সংবিধানে রাজনৈতিক দলের যে ব্যাখ্যা ওপরে দেয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যার কোথাও আরপিও বা জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নেই। কতগুলো জেলার বা কতগুলো উপজেলায় একটি রাজনৈতিক দলের কার্যকর অফিস থাকতে হবে, কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে কত শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব থাকতেই হবে, পার্লামেন্টে অতীতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড থাকতেই হবে, রাজনৈতিক দলের শ্রমিক বা ছাত্রফ্রন্ট থাকা চলবে কিনা, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারবে কিনা ইত্যাদি কোনো বিষয় রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় নেই। আসলে এগুলো থাকেও না। মাছ

www.pathagar.com

যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, রাজনৈতিক দলও তেমনি জনসমর্থন ছাড়া টিকতে পারে না। জনগণের মাঝেই রাজনৈতিক দল বেঁচে থাকে। ১৯৯১ সাল থেকে এদেশে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৫ বছরে ৩টি সরকার জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছিল। এই ৩টি নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল যে, বাংলাদেশে দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিকড় গেড়েছে এবং দৃঢ় ভিত্তির ওপর বিকশিত হচ্ছে। যারা বলেন, ১১৪টি রাজনৈতিক দলকে সামলাবো কিভাবে? তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় একটি কথা বলতে চাই- গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে, যদি মেয়াদ শেষে নিয়মিত নির্বাচন হয়, তাহলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা দলগুলো এমনিতেই ঝরে যাবে।

প্রতিবেশী ভারত। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারত। ১১০ কোটি লোকের দেশ ভারত। সেখানেও বিগত ৬১ বছর ধরে গণতন্ত্র চালু রয়েছে। সেখানেও দ্বিদলীয় গণতন্ত্র। সেখানেও বাংলাদেশের মত বড় দুটি দলকে ছোট দলের সাথে জোট বাঁধতে হচ্ছে। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা দিয়েছিলেন। জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পর যে নির্বাচন হয়েছিল সে নির্বাচনে স্বয়ং মিসেস গান্ধী পরাস্থ হয়েছিলেন। তবুও সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়নি।

॥ চার ॥

ফিরে আসছি ইসলামী দলগুলোর কথায়। সংবিধান একটি দেশের সবচেয়ে বড় আইন। সংবিধানে বলা হয়েছে, দেশে অন্য যে আইনই প্রচলিত থাকুক না কেন, এই আইন অর্থাৎ সংবিধান আর সব আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে। আমাদের সেই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম। সুতরাং সেই রাষ্ট্রে অর্থাৎ বাংলাদেশে ইসলামী দল থাকবে না, সেটি কিভাবে কল্পনা করা যায়? সংবিধানে বলা হয়েছে,'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম শান্তিতে পালন করা যাবে'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবিধানই ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' এখানে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ যদি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে এসপিআর এবং আরপিও'র ওইসব ধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ৩ যুগের জীবনেও এটি প্রমাণিত হয়নি যে, ইসলামী দলগুলো আন্তঃধর্ম বৈষম্যে লিপ্ত হয়েছে। এটি তাদের ট্র্যাক রেকর্ড নয়। সুতরাং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হতে পারে, এমন চিন্তাইবা মাথায় আসছে কেন? ইলেকশন কমিশনের মাথা থেকে এসব চিন্তা যত দ্রুত বের হয়ে যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

(দৈনিক ইনকিলাব- ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

www.pathagar.com

২৪

সংবিধানের ১৪টি সংশোধনের ধারাবাহিক ঘটনা এবং প্রস্তাবিত সংশোধনী কমিটি

একটি দেশের সংবিধান সেই দেশের জনগণের পবিত্র আমানত। তাই বলে সেটি অমোঘ বা অপরিবর্তনীয় নয়। নিয়তই বদলে যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। বদলে যাচ্ছে এই সমাজ। বদলে যাচ্ছে মানুষের ধ্যান-ধারণা। যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে চলতে গিয়ে, পরিবর্তনশীল যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে, তাই সংবিধানকেও পরিবর্তন করতে হয়। সব দেশেই সংবিধান পরিবর্তিত হচ্ছে। এমনকি কথায় কথায় যে দেশটির নজির আমরা তুলে ধরি, যে দেশটিকে গণতন্ত্রের রোল মডেল বলা হয়, সেই আমেরিকার শাসনতন্ত্রও অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতেও সেটা হচ্ছে। তবে দেখতে হবে যে পরিবর্তন বা সংশোধনের সেই ধাক্কায় সংবিধানের খোল-নলিচা যেন বদলে না যায়। আড়াইশ' বছর হলো আমেরিকায় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। মার্কিন শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হলেও তাদের সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তিত হয়নি। শতবর্ষ আগেও সেখানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ছিল, শতবর্ষ পরও সেখানে সেই প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিই বহাল রয়েছে। ৬৩ বছর আগে ভারত স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছিল পার্লামেন্টারি পদ্ধতি দিয়ে। আজো সেখানে সেই পদ্ধতিই চলছে। আবার দেখুন, গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে আমরা যে দেশটিকে জানি, সেই ইংল্যান্ডে কোনো লিখিত শাসনতন্ত্রই নেই। যুগের পর যুগ ধরে যেসব কনভেনশন স্থাপিত হয়েছে সেসব কনভেনশনের ভিত্তিতেই দেশটি পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশের। দেশ দু'টি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৫৬ সালের ২২ শে মার্চ পর্যন্ত এই ৯ বছর ধরে পাকিস্তানে কোনো শাসনতন্ত্র ছিল না। দেশটি পরিচালিত হয়েছে ব্রিটিশ রাজ প্রণীত বিভিন্ন আইনকানুন দিয়ে। তাই ওই ৯ বছর পাকিস্তানে ছিলেন একজন গভর্নর জেনারেল, যার অধীনে ছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী এবং পার্লামেন্ট। ১৯৫৬ সালে ২৩ মার্চ পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র চালু হয়। যদিও বলা হয় দেশটিতে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র, তৎসত্ত্বেও তাদের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রেসিডেন্ট ছিলেন অসীম ক্ষমতাধর। পরবর্তী ঘটনা সকলেই জানেন। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থেকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে রূপান্তর, আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি নানান চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিবর্তন ঘটেছে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের দাবি মেটাতে গিয়ে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার পাখনা দারুণভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সে জন্যই শুরুতে বলেছি যে সংবিধান কোন সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না।

বাংলাদেশেও যা ঘটেছে সেটাকে অনেকটা পাকিস্তানের অনুগমন বলা যায়। বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের মাধ্যমেই। কিন্তু ৩ বছর যেতে না যেতেই সরকার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। সংসদীয় বহুদলীয় পদ্ধতি থেকে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটানো হয়। এরপর একদলীয় থেকে বহুদলীয় পদ্ধতিতে উত্তরণ ঘটলেও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি রয়েই যায়। এই পদ্ধতি চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালে দেশ আবার সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে আসে। সেই থেকে বিগত ১৯ বছর পর্যন্ত সংসদীয় পদ্ধতি চলে আসছে। ইতিপূর্বে দেশ পার হয়েছে তিনটি সামরিক শাসনের মধ্যদিয়ে। ঘটেছে একটি গণঅভ্যুত্থান এবং দুটি গণআন্দোলন। এভাবে বাংলাদেশ পরিবর্তনের তথা সংশোধনের প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলেছে।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশের ৩৯ বছরের জীবনে সংবিধানকে অন্তত ১৪ বার সংশোধন করতে হয়েছে। এগুলো করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে।

১. সংবিধান প্রণয়ন এবং কার্যকর হওয়ার ৭ মাসের মধ্যেই করতে হয়েছে প্রথম পরিবর্তন, যেটি সংবিধানের প্রথম সংশোধনী হিসেবে পরিচিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি উত্থিত হয়। পাকিস্তানের ১৯৫ জন অফিসার ও জওয়ানকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে চিহ্নিত ও অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিচারের জন্যই প্রণীত হয় ১৯৭৩ সালের যুদ্ধাপরাধের বিচার আইন।

২. কিছুদিন সরকার চালানোর পর তৎকালীন সরকার দেখতে পায় যে দেশ যেভাবে অরাজকতার পথে ধাবিত হচ্ছে সেই অরাজকতা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে জরুরী অবস্থা জারি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ৭২ সালের মূল সংবিধানে দেশে জরুরী অবস্থা জারির কোন বিধান ছিল না। তাই সংবিধানে জরুরী অবস্থা জারি সম্বলিত দ্বিতীয় সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩. এরপর ঘটে আরেকটি ঘটনা। মরহুম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলা-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি মোতাবেক ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করতে হবে। বিনিময়ে দহগ্রাম, আঙ্গুরপোতা ও তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। বেরুবাড়ি তখন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এটিকে হস্তান্তর করতে হলে সংবিধানে সেটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ এর সাথে মানচিত্রের পুনর্বিন্যাস জড়িত। সুতরাং মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির কারণে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করার জন্য সংবিধানে আনা হলো তৃতীয় সংশোধনী।

৪. তারপর চতুর্থ সংশোধনী। বিষয়টি এতো বেশি আলোচিত যে এ সম্পর্কে আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতি থেকে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটানো হয়।

www.pathagar.com

৫. তারপর আসে পঞ্চম সংশোধনী, যে সংশোধনী নিয়ে সারা দেশে আজ বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। পঞ্চম সংশোধনীতে রাষ্ট্রীয় মূল নীতির পরিবর্তন করা হয় এবং একদলের পরিবর্তে বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ঘটে।

৬. অতঃপর আসে ষষ্ঠ সংশোধনী। উপ-রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে তার উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অথবা সংসদ সদস্য পদ বাতিলের বিধান এই সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭. তারপর সপ্তম সংশোধনী। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেন এবং দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সামরিক বিধি ও ফর্মান জারি করেন। সপ্তম সংশোধনীতে এরশাদের সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত বিভিন্ন ফর্মান ও বিধিকে বৈধতা দেয়া হয়।

৮. এরপর আসে অষ্টম সংশোধনী। এই সংশোধনীতে পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়।

৯. অতঃপর আসে নবম সংশোধনী। এই সংশোধনীতে প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্টের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

১০. অতঃপর গৃহীত হয় দশম সংশোধনী। এই সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

১১. অতঃপর একাদশ সংশোধনী। এটি একান্তভাবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদ সম্পর্কিত। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের পদত্যাগ এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দান এবং আবার তাকে প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান সম্বলিত সংশোধনী। এটি একটি ল্যান্ডমার্ক সংশোধনী। ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তিকে নিয়ে সংবিধান সংশোধিত হয় নি।

১২. এরপর দ্বাদশ সংশোধনী। এটি একটি ঐতিহাসিক সংশোধনী। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে আবার বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া হয়, যে পদ্ধতি আজো চলছে।

১৩. এরপর আসে ত্রয়োদশ সংশোধনী। এটি আরেকটি ল্যান্ডমার্ক সংশোধনী। কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা ইতিপূর্বে সংবিধানে ছিল না। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৪. সবশেষে চতুর্দশ সংশোধনী। এটি করা হয় ২০০৪ সালে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়। একই সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৬৭ করা হয়। একই সংশোধনীতে সমস্ত অফিস-আদালতে প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর আলোকচিত্র টাঙ্গানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

এই হলো বাংলাদেশে সাংবিধানিক সংশোধনের ধারাবাহিক ইতিহাস। সাংবিধানিক সংশোধনের এই ধারাক্রম থেকেই দেখা যায় যে, সংবিধানের সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই সেই উদ্দেশ্যে যখন সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করা হয়েছে তখন তার মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু থাকার কথা নয়।

২০০৪ সালের পর ৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে সংবিধানের আর কোন সংশোধনী হয় নি। সরকার যদি মনে করে যে, সংবিধানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং সেই কারণে সংবিধান সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাহলে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। কিন্তু তারপরও সংশোধনী আনা তো দূরের কথা, কমিটি গঠনের সাথে সাথে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সেই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং কমিটির আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। আমরা এ জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন দল বা পক্ষকে দায়ী করছি না।

আমাদের বক্তব্য হলো এই যে, সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই যে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে সেটি জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কেন এই কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কারণটি স্পষ্ট করার জন্য কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স থাকা দরকার ছিল। তাহলে হয়তো অনেক বিভ্রান্তি দূর হতো। কিন্তু সেটির অভাবে একেক মহল বা ব্যক্তি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কমিটি গঠনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। প্রায় সকলেই বলছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই পয়েন্টটি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায় না পাওয়া পর্যন্ত সেই রায়ের আলোকে সংবিধান কিভাবে সংশোধন করা হবে? এই কলাম লেখার সময় পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তাদের রায় চূড়ান্ত করেছেন এবং সমস্ত বিচারপতি সেই রায়ের স্বাক্ষর দিয়েছেন, এমন কথা শোনা যায়নি। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত রায়টি সরকার বা কমিটির হাতে এসে পৌঁছেনি। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই রায়টি তারা না পাচ্ছেন ততোক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনী কমিটি কি করবেন? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ে প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রক্রিয়ায় বিএনপির অংশগ্রহণের প্রশ্নটি। জাতীয় সংসদে বিএনপির আসন সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা মোট ভোটের এক-তৃতীয়াংশ। বলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিও নাকি সংশোধনের আওতায় আসবে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন করলে সেটি জনগণের প্রায় সর্ব শ্রেণীর মানুষের সমর্থনে বলীয়ান হতে হবে। বিএনপি ও ইসলামী দলসমূহ যদি ওই সব সংশোধনীর বিরোধিতা করে তাহলে গত নির্বাচন মোতাবেক দেশের অন্তত ৩৭ শতাংশ মানুষের সমর্থন সেই সংশোধনীর পেছনে থাকবে না। ১৯৯১ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে চক্রাকারে। একবার বিএনপি আরেকবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে। দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এটাই ঘটে। বামপন্থীরা বর্তমানে যেমন আওয়ামী লীগের পেরিফেরি, তেমনি ইসলামী দলগুলোও বিএনপির পেরিফেরি। এটিই হলো আমাদের রাজনীতির কঠোর বাস্তবতা। তাই সাংবিধানিক সংশোধনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশাল জনগোষ্ঠীকে সংশোধনী প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা সঠিক হবে না। বিষয়টি সরকার আরো গভীরভাবে ভেবে দেখবেন বলে আশা করি। (দৈনিক ইনকিলাব : ২৭-০৭-২০১০)

www.pathagar.com

২৫

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : ধর্মীয় রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আ'লীগ

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্ট বেঞ্চের রায় ২০০৫ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়া গেল এই সেদিন। এই দুটি রায় পর্যালোচনার পর যে তিনটি বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সেগুলো হলো- (১) সামরিক শাসন (২) ধর্মনিরপেক্ষতা এবং (৩) ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ। আংশিকভাবে এসেছে জাতীয়তাবাদ। আলোচনায় আরো এসেছে একটি নতুন শব্দ। নাম 'আদি সংবিধান'। কথা উঠেছে, ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া। আরো কথা উঠেছে 'সমাজতন্ত্র'। গত মঙ্গলবারের কলামে আমি বলেছিলাম যে, একটি মাত্র কলামে একটি বিশাল ক্যানভাসের বিস্তৃত বিষয়ের ওপর লেখা সম্ভব নয়। তাই আজ আবার একই বিষয়ে লিখতে বসেছি। লিখছি সেখান থেকে, যেখানে গত মঙ্গলবার শেষ করেছিলাম।

প্রথমে শুরু করছি আদি সংবিধানের বিষয়টি। ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার যে কথাটি উঠেছে সেটিরও সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো আদি সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে উঠছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতা, এসব বিষয়। প্রথমেই একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সেটি হলো, আদি সংবিধান বলে কিছু আছে কি? সংবিধানের সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় সব দেশেরই সংবিধানের যাত্রা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে সেটি দাঁড়িয়ে নেই। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এসব দেশের উদাহরণে আর যাব না। কেউ যদি বলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তাহলে সম্ভবত সঠিক বলা হবে না। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পঠিত এবং প্রকাশিত হয় সেখানে সরকার পদ্ধতি হয় প্রেসিডেন্সিয়াল। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়। যেহেতু তখন তিনি পাকিস্তানের কারাগারে ছিলেন, তাই তার অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ওই ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন সরকারপ্রধান এবং বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এ ব্যাপারে অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু স্থানাভাবে আর এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব দেশে ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অস্থায়ী সরকারে তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ মুজিব ফিরে আসার পর তাজউদ্দিনকে অর্থমন্ত্রী

www.pathagar.com

নিয়োগ করা হয়। আবার দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করা হয়। বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতি থেকে একদলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সরকার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু থাকে দীর্ঘদিন, অর্থাৎ ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু ছিল। ১৯৯১ সালের প্রথম প্রান্তিকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি বাতিল করে আবার সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হয়।

সুতরাং ওপরের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধান ঠিক এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সময়ের দাবিতে অথবা শাসকদের প্রয়োজনে এটির পরিবর্তন ঘটে । বাংলাদেশেও সেই পরিবর্তন ঘটেছে। কেউ যদি বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার, তাহলে তিনি সঠিক কথা বলছেন না। আবার কেউ যদি বলেন যে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকারই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তাহলে তিনিও সঠিক কথা বলছেন না। আমেরিকায় রয়েছে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। আবার ভারতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। দুই পদ্ধতির সরকারই গণতান্ত্রিক সরকার। এ বিষয়টির সাথে এসে যায় আদি সংবিধান বা ৭২-এর সংবিধান। আগেই বলেছি যে, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশে সংবিধানের অনেক সংশোধন এসেছে। প্রতিটি সংশোধনের মাধ্যমে সময়ের দাবি পূরণ করা হচ্ছে। এসব সংশোধনীর মাধ্যমে দেশ এবং রাজনীতি সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, পেছনে ফিরে যাচ্ছে না।

॥ দুই ॥

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে যারা ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য জোর দাবি তুলেছেন এবার তাদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা। সংবিধান সংশোধন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৫ সদস্যের যে সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কে ড. শাহীদান মালিক, ড. জহির এবং ড. আসিফ নজরুল বলেছেন যে, সংবিধান সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সেদিকে লক্ষ্য রেখে যদি এই কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু জানতে হবে যে ওই কমিটি কি করতে যাচ্ছেন। কমিটির উপপ্রধান বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এমপি প্রতিদিনই যেসব কথা বলছেন সেসব কথা শুনে মনে হচ্ছে যে, কমিটি করা হয়েছে যেন একটি বিশেষ সময়ের শাসনকালকে তুলাধুনা করার জন্য। সুরঞ্জিত বাবুদের মতো লোকরাই সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়কে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে জোর গলায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব করে ইতিহাসের এমন মহান ও পবিত্র একটি অধ্যায়কে অহেতুক বিতর্কের জটাজালে নিক্ষেপ করার অপচেষ্টা

www.pathagar.com

করছেন। কথা উঠেছে যে, সুরঞ্জিত সেন নিজেই নাকি ৭২ সালের সংবিধানে স্বাক্ষর দেননি। সেই তিনিই এখন ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার চ্যাম্পিয়ন সেজেছেন। সেই তিনিই বলছেন যে, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা নাকি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ড. আসিফ নজরুলসহ অনেক উদারপন্থী আইনবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদেরও বক্তব্য এই যে, ওইসব তাত্ত্বিক বিষয় মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করেনি। মুক্তিযুদ্ধ একদিনের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও ক্ষোভের পরিণতিই নয়। দীর্ঘদিন ধরে একটি রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করছিলেন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান। সেটি হলো, তৎকালীন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান (যেটি আজকে বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তির জন্যই বিভিন্ন সময় দেয়া হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দুটি কর্মসূচি। একটি হলো ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচি। আরেকটি হলো ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচি। সকলেই জানেন যে, ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার ছিল ২১ দফা কর্মসূচি। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ রাজনৈতিকভাবে উৎখাত হয়ে যায়। ৬ দফার ভিত্তিতে প্রণীত হয় ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। ৬ দফাকে ভিত্তি করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে তার নির্বাচনী ইস্তেহার তুলে ধরে। এই নির্বাচনে বিশাল বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আবির্ভাব ঘটে এবং শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে উত্থিত হন।

অথচ ২১ দফা, ৬ দফা বা ৭০-এর আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো, ইয়াহিয়ার কাছে পেশকৃত শেখ মুজিবের সাংবিধানিক খসড়া এবং মুজিবনগরে ১০ এপ্রিল গৃহীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অঙ্গীকার ছিল না। যা ছিল সেটি বরং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের বক্তব্যের বিপরীত। ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচির মূলনীতি হিসেবে বিধৃত ছিল নিম্নোক্ত লাইনসমূহ, "কোরআন ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না বরং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।" ২১টি দফার একটি দফাতেও সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতার কোন দফা ছিল না।

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

১৯৬৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ দফা বলতে শুধু ৬ দফাই ছিল না, ৬ দফার অধীনে অনেকগুলো উপদফা ছিল। অথচ সেই ৬ দফার কোনো মূল দফা অথবা কোনো উপদফায় ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোন কথা ছিলন। অথচ কে না জানেন যে, এই ৬ দফাই রচনা করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি। এই ৬ দফা নামক ভিত্তিপ্রস্তরের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ইমারত। ৬ দফার ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে (পাকিস্তান পার্লামেন্ট) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৬৯টি আসন। নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে বিজয় লাভ করে ২৯৮ আসনে। এই ঐতিহাসিক বিজয় লাভের পর ১৯৭১ সালের ২৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ বিজয় দিবস ঘোষণা করে। বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা রেসকোর্সে লাখ লাখ লোকের সমাবেশে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ টিকিটে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যবৃন্দকে ৬ দফা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার সম্বলিত শপথ বাক্য পাঠ করান। আওয়ামী লীগের সেই শপথনামাটি নিম্নে প্রদত্ত হল– In the name of Allah, the Merciful and Almighty, in the name of the brave martyrs and fighters who heralded our initial victory by laying down their lives and undergoing the utmost hardship and repression, in the name of the peasants workers, students, toiling masses and the people of all classes of this country, we the newly elected members of the National and Provincial assemblies, do hereby take oath that we shall devote all our energy to honor the over whelming support and unstinted confidence the people of this country have reposed in the program and the leadership of Awami League in the National General Election.

May Allah help us in our endeavour.

নিম্নে উক্ত শপথনামার বঙ্গানুবাদ দেয়া হল ঃ

করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার নামে, বীর শহীদান ও যোদ্ধাদের নামে, যাহারা স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়া ও অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন স্বীকার করিয়া আমাদের প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিত করিয়াছেন। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মেহনতী জনতা ও দেশের

www.pathagar.com

সকল শ্রেণীর মানুষের নামে আমরা নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা এতদ্বারা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও কর্মসূচির প্রতি যে ব্যাপক সমর্থন ও অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিব। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টায় সহায় হউন।

॥ চার ॥

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ বেলা ১১টায় পাকিস্তানের তৎকালীন মিলিটারি শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুরের মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই ঘন্টা চলে এই বৈঠক। কোন সাহায্যকারী ছাড়াই এটি ছিল মুজিব-ইয়াহিয়া ওয়ান-টু-ওয়ান বৈঠক। ১৭ মার্চ বেলা ১০টা ৫ মিনিট থেকে ১১টা ৭ মিনিট পর্যন্ত শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ মার্চ কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯ মার্চ সকাল ১০টায় তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বৈঠক। ওই দিন বিকেলে প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিবের পক্ষে তিনজন এবং ইয়াহিয়ার পক্ষে তিন উপদেষ্টার মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে জাতির স্থপতি শেখ মুজিবের পক্ষে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ড. কামাল হোসেন। ইয়াহিয়ার পক্ষে ছিলেন বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস, জেনারেল পীরজাদা এবং এডভোকেট জেনারেল কর্নেল হাসান। ২০ মার্চ উপদেষ্টাবৃন্দসহ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যে পুনরায় বৈঠক হয়। ২১ মার্চ বিকেলে ঢাকায় আসেন জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো। ২১ মার্চ পুনরায় মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে ৭০ মিনিটব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব ইয়াহিয়ার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক চলে ৭৫ মিনিট। ২৩ মার্চ কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। ২৪ মার্চ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি, তবে উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে ইয়াহিয়া খানের কাছে খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। এই শাসনতন্ত্রের প্রিয়েম্বলে বলা হয়- In the name of Allah, the Beneficient the Merciful We the peoples of the autonomous States of Bangladesh. The Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan.

কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে গৃহীত স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে। এই ঘোষণাপত্রটি রচিত এবং পঠিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। শিরোনাম THE

www.pathagar.com

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ টিকিটে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এমএনএ এবং প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ টিকিটে নির্বাচিত এমপিরা এই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন এবং অনুমোদন করেন। সেইদিন তারা এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে শপথ গ্রহণ করেন। আগেই বলেছি যে, এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, যে যুদ্ধে লাখ লাখ বাংলাদেশী শহীদ হন এবং লাখ লাখ মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারান। এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রেও ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের লেশমাত্র ছিল না। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার গঠনের পর বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ যে ভাষণ দেন সেখানেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা বা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কোন কথা ছিল না। বরং আমরা ২৩ জানুয়ারি রেসকোর্সে আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দকে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মহান আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করতে দেখি। সমগ্র পাকিস্তানের জন্য আওয়ামী লীগ যে খসড়া সংবিধান পেশ করেন সেখানেও আল্লাহকে 'রহমানুর রহীম' সম্বোধন করে তার নামে সংবিধান শুরু করা হয়েছে। এ সমস্ত দলিলপত্র ও ঘটনাবলীই মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এবং সুরঞ্জিত বাবুরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা খুঁজে পেলেন কোত্থেকে?

আজ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী কিস্তিতে সামরিক শাসন জারি, সেটিকে বৈধতা দেয়া এবং ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে জাতীয় সংসদকে ব্যবহার করায় এক শ্রেণীর প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। (দৈনিক ইনকিলাব, ০৩-০৮-২০১০)

www.pathagar.com

(২৬)

আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় এবং অনেক আইনগত প্রশ্ন

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের সমস্ত মহল থেকে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া আসছে। প্রতিদিনই খবরের কাগজে কারো না কারো মন্তব্য এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হচ্ছে। এক সময় ধারণা ছিল যে, হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের রায় সম্পর্কে কেউ প্রকাশ্য মন্তব্য করতে পারবেন না। কিন্তু এখন দেখছি, দিন বদলে গেছে। রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ, ব্যারিস্টার, পলিটিশিয়ান, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট, রাজনৈতিক ভাষ্যকারসহ সকলেই এ বিষয়টির ওপর অনবরত লিখে চলেছেন। প্রথম তিনদিন আমি তাদের লেখাসমূহের ক্লিপিং করেছিলাম। কিন্তু তিন দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। তিন দিনে পেপার ক্লিপিংয়ের সংখ্যা ৩০টি দাঁড়িয়েছে। তাও আবার সব পত্রিকার ক্লিপিং নয়। ১৭/১৮টি পত্রিকা। সব পড়াও সম্ভব নয়, আবার ক্লিপিং মেইনটেন করাও সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত যদি ক্লিপিং মেইনটেন করতাম তাহলে সেগুলো দিস্তা দিস্তা কাগজে পরিণত হতো। যাই হোক, এ মুহূর্তে আমার হাতে যতগুলো পেপার কাটিং রয়েছে তার মধ্যে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় সম্পর্কে যেসব বিদগ্ধজন মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন-(১) ড. কামাল হোসেন (২) ড. জহির (৩) শাহীদান মালিক (৪) ড. আসিফ নজরুল (৫) সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (৬) আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (৭) ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ (৮) বিচারপতি টিএইচ খান (৯) সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন (১০) ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়াসহ আরো অনেকে। যারা কলাম লিখেছেন তাদের সংখ্যাও ১০ জনের কম হবে না। এদের কেউ কেউ এই রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই রায়ের সমালোচনা করেছেন। এগুলো নিঃসন্দেহে সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক। বাংলাদেশের দুই প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি একাধিক সভা সমিতি ও সেমিনারে অত্যন্ত চমৎকার মন্তব্য করেছেন। এরা হলেন বিচারপতি মোস্তাফা কামাল এবং বিচারপতি এটিএম আফজল। এরা বলেছেন যে, হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের কার্যাবলী এবং রায়ের যদি গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে দেশের এবং বিশেষভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের জন্য ভাল হবে। তারা বিষয়টির সবদিক জানতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে আরো নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ রায় দিতে পারবেন।

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

শুরু করছি ড. জহিরের মন্তব্য দিয়ে। বাংলাদেশে যে ক'জন আইনজীবীকে সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের মধ্যে একজন হলেন ড. জহির। তিনি বলেছেন, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের মাধ্যমে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এসেছে। এটি ভাল কথা। কিন্তু ইসলাম যদি রাষ্ট্র ধর্ম থেকে যায় তাহলে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ থাকে কিভাবে? তিনি বলেন, সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং সেই সুবাদে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তার মতে, এটির কোন প্রয়োজন ছিল না। যিনি মামলা করেছিলেন তার তো আসল লক্ষ্য ছিল মুন সিনেমা হলের মালিকানা ফেরত পাওয়া। সেটি পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। সেটা করতে গিয়ে একেবারে সংবিধান পর্যন্ত সংশোধন করা হলো। তিনি আরো বলেন, একটি সিনেমা হলের মালিকানা ফেরত পাওয়া মামলায় যদি সংবিধানের এতো বড় ওলোট-পালট হতে পারে, তাহলে সপ্তম সংশোধন বাতিল হলো না কেন? বলা হচ্ছে যে, সপ্তম সংশোধনীর বিরুদ্ধে কেউ তো মামলা করেননি। তাই সেটি বাতিল করা হয়নি। মামলা করলে বিষয়টি দেখা যাবে। আরো বলা হচ্ছে যে, অষ্টম সংশোধনীর বিরুদ্ধেও কেউ মামলা করেননি। তাই ওইগুলোতে হাত দেয়া হয়নি। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে হাইকোর্টের সাথে সাথে আপিল বিভাগও বলেছেন যে, সব মার্শাল ল'ই অবৈধ। তাই পঞ্চম সংশোধনীও অবৈধ। এখন মুন সিনেমা হলের মালিকানা ফেরত পাওয়ার মামলায় তিনজন সামরিক আইন প্রশাসক অবৈধ হয়ে যান। তাহলে সেই একই রায়ের আওতায় জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন আসবে না কেন? ড. এমএ জহিরের এ মন্তব্যটি শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, বর্তমান পটভূমিতে অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। আজকের আলোচনায় আমি যতদূর সম্ভব রাজনীতি পরিহার করবো। চেষ্টা করবো আইনগত বিষয়ের মধ্যেই এই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে।

॥ তিন ॥

আপিল বিভাগের ১৮৪ পৃষ্ঠার বিশাল রায়টি আমি জোগাড় করেছি। এটি একদিনে পড়ে শেষ করা যায় না। শুধু একদিন কেন? বেশ কয়েক দিন বেশ কয়েকবার পড়তে হয়। আইনের এতো জটিল এবং খুঁটিনাটি বিষয় বুঝতে হলে বার বার বিষয়টি পড়তে হয়। আমি আইনজ্ঞ নই। তবে সেই পাকিস্তান আমলে পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়ার বিরুদ্ধে তৎকালীন স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান যে মামলা করেছিলেন, সেই মামলার

www.pathagar.com

বিবরণী এবং রায় আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। বিচারপতি মুনিরের বিতর্কিত রায়টি পড়েছি এবং সেই রায়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে সেগুলো পড়েছি। সেই থেকে বিগত ৪৫ বছর ধরে সংবিধান সংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যবিবরণী এবং রায় পড়েছি। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে হাইকোর্ট বেঞ্চ যে রায়টি দিয়েছেন সেটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বেশ কয়েকবার পড়েছি। এসব পড়ে সেই রায়ের মূল সুর আমার কাছে যা মনে হয়েছে তা নিম্নরূপ–

ওই দুই বিচারপতির মতে, সংবিধানে সামরিক শাসন বা মার্শাল ল'র কোন স্থান নেই। তাই সামরিক শাসন সব সময় সংবিধান বহির্ভূত এবং বেআইনী। যেসব সেনানায়ক সামরিক আইন জারি করেন তারা হাই ট্রিজন অর্থাৎ সর্বোচ্চ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেন। আপিল বিভাগও হাইকোর্টের এই রায় সমর্থন করেছেন এবং যারা অবৈধ শাসন জারি করেছেন তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি বিধানের সুপারিশ করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এই শাস্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নেরও সুপারিশ করেছেন। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায় মোতাবেক যেহেতু প্রতিটি সামরিক শাসনই অবৈধ, তাই ওই শাসনবলে যারা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হয়েছেন এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাদের সিএমএলএ এবং প্রেসিডেন্টের সমগ্র শাসন কালটি অবৈধ। এসব শাসন আমলে যেসব কাজ করা হয়েছে তার সবগুলোই অবৈধ।

এই রায়ের আলোকে এক ব্যক্তি তার শাস্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছেন। তিনি বলেছেন, জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন আমলে তিনি একটি সামরিক বিধির অধীনে দণ্ডিত হন। এখন তিনি এটির প্রতিকার দাবি করছেন। তার মন্তব্য এই যে, তিনি দোষী কি নির্দোষ, সেটি এখানে বিবেচ্য নয়। যেহেতু হাইকোর্টের এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে মার্শাল ল' অবৈধ তাই এরশাদের মার্শাল ল'ও অবৈধ। সেই সুবাদে সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদের ৯ বছরের শাসনকালও অবৈধ। অবৈধ শাসন, অবৈধ শাসক এবং সেই অবৈধ শাসকের বিধির অধীনে তাকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে সেটিও অবৈধ। এই পটভূমিতে হাইকোর্ট সরকারের প্রতি রুল জারি করেছে। পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সরকারকে হাইকোর্টের কাছে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, কেন ওই শাস্তি অবৈধ হবে না? পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সরকার নাকি ইতোমধ্যেই আপিল বিভাগের রায়ের কপিসহ তাদের ব্যাখ্যা রেডি করেছে। ইতোমধ্যেই এ মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। শীঘ্রই এই মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা হবে বলে অনেকেই আশাবাদ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই এ কথাও বলেছেন, আপিল বিভাগের রায়ের পর এই মামলায় এরশাদের সামরিক শাসন এবং তার সময় প্রণীত সংবিধানের সপ্তম ও অষ্টম সংশোধনী বাতিল হয়ে যাবে। সপ্তম

www.pathagar.com

সংশোধনীতে রয়েছে এরশাদের সামরিক আইনকে বৈধতা দানের আদেশ। আর অষ্টম সংশোধনী হচ্ছে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার সাংবিধানিক আইন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং পর্যবেক্ষকদের মতে, সপ্তম সংশোধনী এবং অষ্টম সংশোধনী অর্থাৎ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বিধান বাতিল না করে সম্ভবত আর কোন উপায় থাকছে না।

॥ চার ॥

এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায় যেন প্যান্ডোরার বাক্স উন্মোচন করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেছেন, এই রায়ের মধ্যে রয়েছে অনেক স্ববিরোধিতা। আপনি 'বিসমিল্লাহ' রেখেছেন, আবার 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমান'– এই বাক্যটি বাতিল করেছেন। খন্দকার মাহবুবের ভাষায়, "আপনি বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করবেন আর শেষ করার সময় বলবেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখতে পারবেন না। এটি হাস্যকর।" আপনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রেখেছেন আবার রাষ্ট্রের মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ফেরত এনেছেন। এই দুটো পাশাপাশি চলবে কিভাবে? খন্দকার মাহবুব হোসেনের এ কথার প্রতিধ্বনি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। তিনি একাধিক টেলিভিশন টক শো'তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম পাশাপাশি থাকতে পারে না। একটিকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তিনিও একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে, এটি 'হাস্যকর'। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়কে সংবিধানে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেব্যাপারেও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ড. কামাল হোসেন শুধু সংবিধান বিশেষজ্ঞ নন, যে ক'জন আইনজ্ঞ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। বাংলাদেশের আদি সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছেন। কিন্তু ড. কামাল হোসেন এখন জীবিত রয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আপিল বিভাগের রায় প্রকাশের সাথে সাথে সেটি কার্যকর হয়েছে। অর্থাৎ এটি সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ মোটামুটি একই কথা বলেছেন। তবে তার মতে, সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার জন্য সরকারীভাবে গেজেট প্রকাশ করতে হবে। গেজেট প্রকাশিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওই রায়টির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদগুলো সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হবে। এই দু'জন আইনজীবীর বক্তব্য থেকে ধরে নেয়া যায় যে, আপিল বিভাগের রায় ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে, শুধু গেজেট প্রকাশ বাকি। ড. কামাল হোসেন তার বক্তব্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, সংবিধানে যেসব অনুচ্ছেদ সম্পর্কে আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রায় দিয়েছেন সেসব অনুচ্ছেদ সম্পর্কে পার্লামেন্টের আর কিছু করার নেই। সরকার ১৫

www.pathagar.com

সদস্য বিশিষ্ট যে সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছে, আপিল বিভাগের রায়ের অংশগুলোতেও সেই কমিটির করার কিছু নেই। ১৫ সদস্যের কমিটি সেসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারে বা সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে সেইসব বিষয়, যেসব বিষয় আপিল বিভাগ টাচ্ করেনি। আইনের দৃষ্টিতে ড. কামাল হোসেনের বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে বেগম সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বলতে গেলে এমন কিছু করার নেই। এখন এ ব্যাপারে সরকারের কি বক্তব্য, সেটি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, কিউসি আজমালুল হোসেন, ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আমিরুল ইসলাম, বিচারপতি মোস্তাফা কামাল, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, বিচারপতি টিএইচ খান প্রমুখ খ্যাতিমান আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের বক্তব্যের এই অংশটির ওপর কোন মন্তব্য করেননি। সরকারও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। এই লেখাটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। অথচ, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে, রাজনৈতিকভাবে, এমনকি সামাজিকভাবেও অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অন্তর্ভুক্ত সব পয়েন্টের ওপর আলোচনা করতে গেলে তিন থেকে পাঁচটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রয়োজন। আজ আর একটি মাত্র বিষয় আলোচনা করে এই নিবন্ধ শেষ করছি। সেটি হলো জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ। আদি সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সেই সাথে ৯ অনুচ্ছেদও পুনর্বহাল হয়েছে। ফলে 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' আমাদের সংবিধানে ফিরে এসেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ফিরে এসেছে বলে যারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, বিনয়ের সাথে বলছি, তারা সমগ্র রায়টি পড়েননি। আমাদের নাগরিকত্বের পরিচয় হবে বাংলাদেশী। আমাদের পাসপোর্টে পরিচয় থাকবে বাংলাদেশী হিসেবে। যে ৮০ লাখ মানুষ বিদেশে কাজ করছেন তারা পরিচয় সঙ্কটজনিত জটিলতার সম্মুখীন হবেন। যারা ফেরত আসবেন তারাও সমস্যার সম্মুখীন হবেন। এসব কথা রায়ে বলা হয়েছে। একদিকে আদি সংবিধানের ৮ ও ৯ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে ফেরত আনা হয়েছে। আবার অন্য নিঃশ্বাসে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রায়ে বলা হয়েছে, "Since it is a political issue parliament is to take decision in this regard" অর্থাৎ "যেহেতু এটি একটি রাজনৈতিক বিষয় তাই পার্লামেন্ট এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে"। এই অংশটি নতুন প্রশ্নের জন্ম দেবে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক বিষয়। তাহলে সেই বিষয়গুলোও পার্লামেন্টে ফয়সালা হওয়া উচিত। অথচ এই দু'টি জ্বলন্ত বিষয় পার্লামেন্টে ফয়সালা হওয়ার কোন সুযোগ উচ্চ আদালতের রায়ে রাখা হয়নি।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১০-০৮-২০১০)

www.pathagar.com

(২৭)

মার্শাল ল': পূর্ণাঙ্গ রায়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতা : পূর্বে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে বৈধতা প্রদান

গত সংখ্যায় কথা দিয়েছিলাম যে, আজকের কিস্তিতে সামরিক শাসন জারি তথা সেই সামরিক শাসনের পটভূমিকা, সেটিকে বৈধতা দেয়ায় একশ্রেণীর পলিটিশিয়ান ও বিচারকের ভূমিকা এবং প্রধান বিচারপতিসহ উচ্চ আদালতের একশ্রেণীর বিচারপতি পলিটিশিয়ান এবং সামরিক শাসকদের কাছে কিভাবে ধরনা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। এর মধ্যে দুটি গোলটেবিল বৈঠকে দু'জন খ্যাতিমান আইনজীবীর সাথে দেখা এবং কথা হয়। এদের একজন আবার খুব বড় মাপের পলিটিশিয়ান। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায়ে যেসকল অসঙ্গতি আমার চোখে পড়েছে, ওইসব গোলটেবিল বৈঠকে সেগুলো উল্লেখ করি। আমি বিজ্ঞ আইনজীবীদের তাদের বক্তৃতায় সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলি। তাদের উত্তর শুনে মনে হলো, আমার যেন জ্ঞানচক্ষু উম্মিলিত হলো। ওরা দু'জনেই বললেন, আইনজীবী হিসেবে কালো গাউন পরে যখন আদালত প্রাঙ্গণে ঢুকবো, তখন উচ্চ আদালতের রায়কে সমর্থন করবো, অথবা করতে হবে। কিন্তু যখন পলিটিশিয়ান হিসেবে পার্লামেন্ট বা রাজপথে থাকবো অথবা জুরিসপ্রুডেন্সে সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে অ্যাকাডেমিক লেকচার দেব, তখন আমরা স্বাধীন মতামত দেব। লাউঞ্জে বসে চা-পানের সময় তারা তাদের স্বাধীন মতামত দিলেন। তারা অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চ আদালতের দুটি রায়ের সাথে সহমত পোষণ করলেন না। আমাদের আলোচনার একপর্যায়ে যোগ দিলেন একজন মহিলা আইনজীবী, যিনি ইতোমধ্যেই তার পেশায় বেশ নাম করেছেন। আমাদের এই আলোচনায় যেটা বেরিয়ে এলো সেটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

প্রথমে সামরিক শাসনের পটভূমি। দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষই সামরিক শাসন চান না। কিন্তু তারপরও সামরিক শাসন আসে। আরো অবাক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর এক শ্রেণীর মানুষকে সেটি সমর্থন করতেও দেখা যায়। কোন একটি ঘটনাকে শুধু থিওরি দিয়ে বিচার করলে চলবে না। সেই ঘটনাকে ঠিক সেই সময়ের পটভূমিতে বিচার করতে হবে যখন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল। মরহুম জেনারেল আইউব খানের সামরিক শাসন এসেছিল ১৯৫৯ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছর আগে। তিন বছর পর যখন মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়, তখন মানুষ সর্বপ্রথম সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলেন। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে,

www.pathagar.com

জেনারেল আইউব যখন সামরিক শাসন জারি করেন তখন জনগোষ্ঠীর বিশাল একটি অংশ সেই শাসনকে ওয়েলকাম করেন। সামরিক শাসন কোন দিন গণতন্ত্রের বিকল্প হতে পারে না। আজ যারা প্রবীণ তাদের হয়তো মনে আছে যে, সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আইউব খানকে Saviour of the country. বা দেশের ত্রাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

প্রথম দিকে মার্শাল ল' তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কেন? এর কারণ হলো, চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র ৩ বছর ২ মাস সময়ে ৭ বার পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হয়। এই সময় কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হন। অনুরূপভাবে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানও তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হন। জনাব আবু হোসেন সরকার প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১৩ মাস। দ্বিতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৩ মাস। তৃতীয় দফায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৪ দিন (১৯৫৮ সালের ১৮ জুন থেকে ২২ জুন)। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দেড় বছর। দ্বিতীয় দফায় ছিলেন ৩ মাস। তৃতীয় দফায় ১১ দিন (১৯৫৮ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর)। এটাই যেখানে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মন্ত্রিসভার ভাঙ্গাগড়া বা উত্থান-পতনের কাহিনী সেখানে ক্ষমতা দখল করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা আইউব খানরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেনই। পলিটিশিয়ানরা সামরিক জান্তাকে সেই সুযোগটা দিলেন কেন? পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে এই বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে।

॥ দুই ॥

আপিল বিভাগের ১৮৪ পৃষ্ঠার বিশাল রায়টি যতদূর সম্ভব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগের সুবিস্তৃত রায়টিও পড়লাম। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আপিল বিভাগের রায়ের কয়েকটি ছোট ছোট মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া উল্লেখ করার মতো নতুন কিছু নেই। আপিল বিভাগের পুরো রায়টিই যেন হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সমর্থনসূচক একটি বিবৃতি। হাইকোর্ট বেঞ্চ যেসব পয়েন্ট উল্লেখ করেছে, আপিল বিভাগের রায় যেন সেসব পয়েন্টের সরব প্রতিধ্বনি। তাই পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলার রায় নিয়ে কথা বললেই চলবে। এখানে একটি কথা বলা দরকার। বিশাল কলেবরের এই রায়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে পাকিস্তানের রেফারেন্স এবং উদাহরণ টানা হয়েছে। পাকিস্তানে গণপরিষদ গঠন, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষণ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার ঘটনাক্রম, গণপরিষদ ভেঙে দেয়া, স্পীকার তমিজ উদ্দিন খানের মামলা দায়ের, জাস্টিস মুনিরের রায়, প্রধান বিচারপতি কর্নেলিয়াস, জাস্টিস হামুদুর রহমান, আসমা জিলানি মামলা,

www.pathagar.com

জাস্টিস ইফতেখার চৌধুরী পর্যন্ত অনেক কিছুই স্থান পেয়েছে এই পূর্ণাঙ্গ রায়ে। রায়ের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যুক্তি। আরো রয়েছে সমাজতন্ত্র ও বাংগালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে জোরালো বক্তব্য। আইনগত প্রশ্নের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়াবলী প্রবলভাবে প্রাধান্য পেয়েছে এই রায়ে। পাকিস্তানে সামরিক শাসনের পক্ষে জেনারেল আইউব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া যুক্তি দিয়েছেন। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক শাসনের কথা বলা হয়েছে। রায়ের এক স্থানে বলা হয়েছে, In both occassions some pretexts were raised for declaring Martial Laws. But while imposing Martial Law on August 15, 1975 and also while issuing the Proclamation dated August 20, 1975 Khandaker Mustaque Ahmed did not raise any such pretext. বাংল অনুবাদ, "উভয়ক্ষেত্রেই সামরিক শাসন জারির পক্ষে কিছু যুক্তি খাঁড়া করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক শাসন এবং ২০ আগস্টের ফরমান জারির পক্ষে খন্দকার মোশতাক আহমেদ এ ধরনের কোন যুক্তি খাঁড়া করেননি বা বক্তব্য দেননি। বিনয়ের সাথে বলতে হচ্ছে যে, রায়ের এই অংশটির সাথে সহমত পোষণ করা যাচ্ছে না। ১৫ আগস্ট সামরিক শাসন জারির সপক্ষে খন্দকার মোশতাক আহমেদ অনেক যুক্তি দিয়েছেন এবং ওইসব যুক্তি সম্বলিত একটি দীর্ঘ ভাষণও দিয়েছেন। এছাড়া তার ৮৮ দিনের শাসন আমলে সরকারী ভাষ্যে এবং প্রচার মাধ্যমে ১৫ আগস্টের সামরিক শাসনের পক্ষে অনেক কথা বলা হয়েছে। ওইসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য কিনা সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ৩৫ বছর পর ওইসব যুক্তি আর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।

সমগ্র রায় জুড়ে সামরিক শাসন জারির জন্য তিন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা হলেন- (১) খন্দকার মোশতাক আহমেদ (২) প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (৩) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনজনের মধ্যে দুইজনই সিভিলিয়ান এবং একজন সামরিক ব্যক্তি। সিভিলিয়ানদের মধ্যে খন্দকার মোশতাক আহমেদ একজন প্রবীণ পলিটিশিয়ান। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগ করেছেন এবং মুজিব মন্ত্রিসভায় একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও ছিলেন। জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম সম্পর্কে হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। ইতিহাসকে সব সময় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত। অন্যথায় পরবর্তী প্রজন্ম ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ করবেন, যেমন এখন ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠছে। হাইকোর্ট বিভাগের রায় চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে আপিল বিভাগের। সুতরাং আইনগতভাবে সেটি আমরা মানতে বাধ্য। কিন্তু তাই বলে ইতিহাসকেও তার সঠিক অবস্থানে বসাতে হবে। সুখের বিষয়, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও রায়ের এখানে-ওখানে ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে বিধৃত হয়েছে। রায়ের এখানে ওখানে যা বলা হয়েছে সেগুলোকে ধারাক্রম অনুযায়ী সাজালে বিষয়টি এমন দাঁড়ায়–

www.pathagar.com

॥ তিন ॥

১. আজ উচ্চ আদালত সামরিক আইনকে দেশদ্রোহিতা বলছেন। সেটিই গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই উচ্চ আদালতই ১৫ আগস্টের সামরিক আইনকে বৈধতা দিয়েছেন। বলেছেন যে, সামরিক শাসন জারি হলে সংবিধান গৌণ হয়ে যায়, সামরিক বিধান মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সংবিধানের ওপর সামরিক বিধিই প্রাধান্য পায়। এ ব্যাপারে মহামান্য উচ্চ আদালত যেসব রায়ে বৈধতা দিয়েছেন তার কয়েকটি আমি কিছুক্ষণ পর উল্লেখ করবো।

২. অবাক ব্যাপার হলো এই যে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভাষায়, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সারা দেশকে সামরিক আইনের অধীনে আনেন। অথচ তিনি নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হননি অথবা কাউকে সিএমএলএ নিযুক্ত করেননি।

৩. দেশে সামরিক আইন জারি করা সত্ত্বেও খন্দকার মোশতাক সংবিধান বাতিল করেননি বা স্থগিত করেননি। অনুরূপভাবে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছিল সেই সংসদটিও ভেঙে দেননি।

৪. ১৯৭৫ সালের দ্বিতীয় সামরিক শাসন কোনটি? ৭৫ সালের ৬ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং প্রদান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। একদিন পর তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের (সিএমএলএ) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রথম সিএমএলএ হলেন প্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। ৭ নভেম্বর তিনি তিনজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (ডিসিএমএলএ) নিযুক্ত করেন। এরা হলেন, সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এমএইচ খান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এমজি তাওয়াব।

৫. প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, প্রধান বিচারপতি সায়েম যখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দী ছিলেন। ৭ নভেম্বর তিনি মুক্ত হন এবং সিএমএলএ ও প্রেসিডেন্ট সায়েম তাকে ডিসিএমএলএ নিযুক্ত করেন। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতে এবং নির্মোহভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসন জারি করেননি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের ১৯ নভেম্বর উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা সিএমএলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৬. জনাব সায়েমই একমাত্র বিচারপতি নন যিনি সামরিক বাহিনীর সাথে ক্ষমতা শেয়ার করেছেন। আরেকজন বিচারপতির নাম করা যায়, যিনি সামরিক বাহিনীর

www.pathagar.com

সাথে ক্ষমতা শেয়ার করেছেন। তিনি হলেন বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন চৌধুরী। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করেন এবং সিএমএলর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিন দিন পর ২৭ মার্চ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দিন চৌধুরীই সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদের চাকরির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি করেন।

৭. প্রসঙ্গত আরেকজন বিচারপতির নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি হলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর তাকে দেশে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি একটি শর্ত জুড়ে দেন। সেটি হলো, প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও তিনি প্রধান বিচারপতি থাকবেন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব শেষ হলে তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে ফেরত পাঠাতে হবে। এরপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৯১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর সংসদে একাদশ সংশোধনী পাস হয়। এই সংশোধনী মোতাবেক অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জনাব সাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে প্রত্যাবর্তন করেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন যে, কোন একজন ব্যক্তির জন্য একটি দেশের পার্লামেন্টে তার চাকরিতে ফেরত যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি সংশোধনী আইন পাস করতে হয়েছে।

॥ চার ॥

হাইকোর্টের রায় 'এ টু জেড' সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে নিবেদিত। সুপ্রিম কোর্ট যেদিন সেটিকে অনুমোদন দিয়েছে তখন সেই বক্তব্যকেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেই সুপ্রিম কোর্ট যে কতবার আইনের শাসন তথা সংবিধানের ওপর সামরিক শাসনকে প্রাধান্য দিয়েছে তার একাধিক ঘটনা পাওয়া যাবে একাধিক মামলায় এবং সেই মামলায় উচ্চ আদালতের রায়ে। এ ধরনের মামলা এবং রায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ব্যারিস্টার মোস্তফা কামাল লিখিত সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থে। গ্রন্থটির নাম Bangladesh Constitution: Trends And Issues. সবিনয়ে বলতে চাই যে, বাংলাদেশে অন্তত ৮/১০টি মামলা পাওয়া যায় যেখানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ১৫ আগস্ট এবং এরশাদের সামরিক আইনকে সংবিধানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এভাবেই সামরিক আইনকে বৈধতা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো-হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ, কেস নাম্বার ডি এলআর-২০৭। ১৯৭৮ সালের ৪ জানুয়ারি বিচারপতি ফজলে মুনিম রায় দিয়েছেন, "যখনি সংবিধান এবং সামরিক বিধির মধ্যে অসঙ্গতি থাকবে তখন সংবিধানের ওপর সামরিক বিধি প্রাধান্য পাবে।

ইংরেজিতে বলা হয়েছে, "The Constitution will be subservient to the Martial Law Regulations (MLRS).

www.pathagar.com

যেহেতু এই নিবন্ধটি বড় হয়ে যাচ্ছে তাই দু'জন বিচারপতির রায়ের দু'টি অংশ এখানে উদ্ধৃত করে লেখা শেষ করছি। এদের একজন হলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী। আরেকজন হলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রুহুল ইসলাম। **'হাজী জয়নাল আবেদীন বনাম রাষ্ট্র'** মামলায় বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী তার রায়ে বলেন, Badrul Haider Chowdhury sought to extricate the 1975 Martial Law from the clutches of the all pervading doctrine of revolutionary legality and sought to bring it within the purvew of doctrine of state necessity and constitutional deviation in the following words: "We have already found that present Martial Law is completely different from that of 1959 or 1996. The Constitution has not been abrogated; only certain part of it has been circumscribed by the Martial Law Proclamation out of necessity. This Martial Law is a mere constitutional deviation and not one of Wellingtonian Style. প্রাক্তন বিচারপতি রুহুল ইসলাম **'সলিমুল্লা বনাম বাংলাদেশ'** মামলায় জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়েছেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল তার গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন- "It is well vetted that Martial Law is not a part of the constitutional scheme of this country. It is an extra constitutional dispensation. It is a temporary measure, a short term arrangement. It meets only an interim need. When it leaves, it usually legalises all past actions for purposes of immunity, with the tacit acknowledgement that its interference with the constitutional process is an aberration and needs to be condoned. But while leaving, the Martial Law does not leave a trail of disqualification. It is good as long as it lasts. But with its departure it no longer casts a shadow upon the ordinary laws of the land." স্থানাভাবে আর উদাহরণ বাড়াতে চাই না। সামরিক শাসনের জন্য যদি কাউকে নন্দ ঘোষ বানাতে হয় তাহলে শুধু পলিটিশিয়ান এবং মিলিটারি অফিসারকেই টার্গেট করা হবে কেন? আমরা এখানে ৩ জন প্রধান বিচারপতিসহ ৫ জন বিচারপতির রায় এবং বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম। বিষয়টি বিদগ্ধজনরা একাডেমিক দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি। লেখাটি বড় হয়ে গেল বলে আজকে এখানেই শেষ করছি।

আগামীতে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের রায়, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় সমর্থিত হাইকোর্টের রায়, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হাইকোর্টের মন্তব্য, ভারতের সংবিধান রচনার ১৭ বছর পর ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি, খন্দকার মোশতাক এবং জাস্টিস সায়েমের নেপথ্য শক্তি এবং সে সম্পর্কে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করার ইচ্ছা নিয়ে আজকে শেষ করছি। (দৈনিক ইনকিলাব : ১৭-০৮-২০১০)

www.pathagar.com

(২৮)

দৃশ্যপটে মোশতাক ও সায়েম : নেপথ্যে কর্নেল রশীদ ফারুক এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল জামিল

গত মঙ্গলবার কথা দিয়েছিলাম যে, আজকের লেখায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। এগুলো হলো–

১. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের রায়।
২. সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তার প্রায়োগিক বাস্তবতা।
৩. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়।
৪. ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি।
৫. খন্দকার মোশতাক ও জাস্টিস সায়েমের নেপথ্য শক্তি।

এসব বিষয় নিয়েই আজকে আলোচনা করার ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের পুরো রায় পড়তে গিয়ে বারবার একটি জায়গায় থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সেটি হলো (১) সামরিক শাসনের বৈধতা বা অবৈধতা এবং (২) সামরিক শাসন জারিকে অবৈধ ঘোষণা করার পরও ওই শাসনের কতগুলো কাজকে বৈধতা দেয়া বা কন্ডোন করা বা মার্জনা করা। আমি দেখেছি যে, সুপ্রিমকোর্ট তার রায়ের বিশাল অংশ এই দু'টি বিষয়কে জাস্টিফাই করার কাজে ব্যয় করেছে। এসব করতে গিয়ে তারা দারুণভাবে নির্ভর করেছে পাকিস্তানের সাংবিধানিক মামলাসমূহের ওপর। সেখানে বারবার এসেছে আসমা জিলানির মামলা। এসেছে পাকিস্তানের চারজন প্রধান বিচারপতি চীফ জাস্টিস মুনির, চীফ জাস্টিস আনোয়ারুল হক, চীফ জাস্টিস কর্নেলিয়াস, চীফ জাস্টিস হামুদুর রহমান, চীফ জাস্টিস ইয়াকুব আলী, জাস্টিস আজমল মিয়া প্রমুখের কথা। কারণ এসব আলোচনা না করলে সমগ্র বিষয়টি একপেশে হয়ে যাবে।

তার আগে ইনকিলাবের প্রিয় এবং সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা ভাইবোনের উদ্দেশ্যে একটি কথা বলে রাখতে চাই। দেখা যাচ্ছে যে, জুরিসপ্রুডেন্স বা আইন বিদ্যায় বিশেষ করে তার সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কোনো আইনই স্থির বা স্বতঃসিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয় না। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে সর্বশেষ জেনারেল পারভেজ মোশাররফের সামরিক শাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমিও সেখান থেকেই শুরু করছি। গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দিলে তৎকালীন স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান উচ্চ আদালতে মামলা করেন। উল্লেখ করতে চাই যে, মৌলভী

www.pathagar.com

তমিজ উদ্দিন খান বাংলাদেশের মানুষ। তার জামাতা ড. এমএন হুদা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী এবং গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। মৌলভী তমিজ উদ্দিন খানের এই মামলাকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে প্রথম শোনা যায় একটি নতুন থিওরি। এটির নাম Doctrine of Necessity (ডকট্রিন অব নেসাসিটি) এটি যেহেতু সামরিক শাসন সংক্রান্ত মামলা নয় তাই আমরা এই মামলার আলোচনায় যাবো না। আমরা এখন আসছি আইউব খানের সামরিক শাসন জারি সংক্রান্ত মামলায়। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মির্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন, শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং পার্লামেন্ট বা জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ ভেঙে দেন। এর বিরুদ্ধে মামলা হয়। সেই মামলাটি 'রাষ্ট্র বনাম ডেসো' নামে পরিচিত। মামলাটির নাম্বার PLD 1958: SC 533. তখন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন জাস্টিস মোহাম্মদ মুনির। এই মামলার রায়ে জেনারেল আইউব খানের সামরিক শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়। এই বৈধতা দেয়ার সময় প্রয়োগ করা হয় ১৯৪৬ সালে প্রণীত Hans Kelsens এর GRUNDNORM থিওরি। এই তত্ত্বের অর্থ হলো General Theory of Law and State. এই মামলার রায়ে বলা হয়, "A successful coup d'etat or revolution could create a new basic norm and, therefore, could be the supporting plank for a "new legal order" Once the revolution was shown to be efficacious in nullifying the old basic norm, it had to be regarded as a law-creating fact giving validity to a "new legal order"

The Pakistan Supreme Court's use of Kelsen's thesis in October 1958 in the cause celebre, State v. Dosso, has led to constitutional debates across the world on the legitimacy of coups. The court, presided over by Chief Justice Muhammad Munir, held that there had been a successful revolution by Mirza and, applying Kelsen, declared that the document issued by him, Laws (Continuance in Force) Order (LCFO), was the law.

This order purported to avert the drastic consequences of an abrogated Constitution সাদামাটা বাংলায় এর অর্থ হলো, যখন একটি বিপ্লব সফল হয় তখন সেই বিপ্লবটি নতুন নিয়মরীতি সৃষ্টি করে। তখন পুরাতন নিয়মরীতি বাতিল হয়ে যায়। সংবিধান বিলোপের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়মরীতি কার্যকরী হয়। জেনারেল আইউব খান ৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেছিলেন। এই অবস্থায় সামরিক আইন শূন্যতা পূরণ করে।

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

১৯৬৯ সালে জেনারেল আইউব খান সরে দাঁড়ান এবং পাকিস্তান জুড়ে চলমান প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি আইউব খানের মতোই ৬২ সালের সংবিধান বাতিল করেন। এর বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে মামলা করেন আসমা জাহাঙ্গীর জিলানী। মামলাটির শিরোনাম 'আসমা জিলানী বনাম পাঞ্জাব সরকার'। মামলা নম্বর (PDL 1972 SC 139)। মামলার রায়ের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ :

Asma Jilani v. The Government of Punjab: On April 7, 1972 the Supreme Court declared that General Yahya Khan had usurped power, that his action was not justified by the revolutionary legality doctrine and consequently his martial law was illegal. However, it must be noted that this decision came after he ceased holding the office. However the Supreme Court validated all closed and past transactions whose re-opening could not have served any useful purpose, all acts and legislative measures which could have been validly taken under the abrogated constitution, all acts which promoted the good of the people and all acts which were required to be done for ordinary running of the state.

লেখাটি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে সাদামাটা বাংলায় এর সারাংশ দিচ্ছি। আইউব এবং ইয়াহিয়া দু'জনই সামরিক আইন জারি করেছিলেন এবং সংবিধান বাতিল করেছিলেন। কিন্তু আদালত ইয়াহিয়ার সামরিক আইনকে বৈধতা দেননি এবং তাকে ক্ষমতা দখলকারী বলেছেন। কারণ ক্ষমতা দখলের সপক্ষে যে যুক্তি তিনি দিয়েছেন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেটি প্রযোজ্য নয়। তবে আসমা জিলানীর মামলাতেই আমরা পাচ্ছি কন্ডোন করা বা মার্জনা করার উদাহরণ। এই মামলার রায় দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ইয়াকুব আলী। তিনি ইয়াহিয়ার শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করলেও তার আমলে সম্পাদিত অনেকগুলো কাজকে বৈধতা দিয়েছেন বা মার্জনা করেছেন। আসমা জিলানীর মামলার সূত্র ধরেই আমাদের হাইকোর্ট বেঞ্চ বা আপিল বিভাগ এসব সামরিক আইনকে অবৈধ ঘোষণা করলেও তাদের অনেকগুলো কাজকে বৈধতা দিয়েছেন বা মার্জনা করেছেন। পাকিস্তানেও সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল যে, উচ্চ আদালত কি একটি বিশেষ সময়কে অবৈধ ঘোষণা করে আবার সেই সময়ের একটি অংশকে বৈধ এবং অপর একটি অংশকে অবৈধ বলতে পারেন? এর ফলে সর্বোচ্চ আদালতের স্ববিরোধিতা প্রকাশ পায় কিনা? এর ফলে সর্বোচ্চ আদালত ডাবল স্টান্ডার্ড

www.pathagar.com

অনুসরণ করছেন কিনা? পাকিস্তানে দ্বিতীয় মার্শাল ল' অবৈধ ঘোষিত হবার পরও কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হকের তৃতীয় মার্শাল ল'কে ঠেকানো যায়নি। তার মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন মরহুম বেনজীর ভুট্টোর মাতা এবং জুলফিকার ভুট্টোর স্ত্রী মরহুমা নুসরাত ভুট্টো। প্রধান বিচারপতি জাস্টিস আনোয়ারুল হকসহ সব বিচারপতি সর্বসম্মত রায়ে বলেন–

"The intervention thus appears to be for a temporary period" and for limited purpose of arranging fair and free elections so as to enable the country to return to the democratic way of life. Thus on the present occasion the proclamation of martial law does not appear to be of the same type as the proclamations of martial laws of 1958 and 1969, whereby not only the existing constitutions were abrogated but that this was done with the intention of replacing them with new constitutions. The purpose there was to destroy the existing legal orders and replace them with new legal orders. In the present case the situation is quite different. In view of the break-down of the normal constitutional machinery and to fill the vacuum, the armed forces were obliged to take an extra-constitutional step. Martial law was imposed in the picturesque words used in the written statement filed by Mr. Brohi, not "in order to disable the constitutional authority, but in order to provide a bridge to enable the country to return to the path of constitutional rule." In the felicitous phrase of my Lord the Chief Justice, the act was more in the nature of a 'constitutional deviation' rather than an overthrow of the constitution. The Constitution of 1973 is not buried, but merely suspended. It, however continues to be the governing instrument subject to the provisions of the Laws (Continuance in Force) Order, 1977. In these circumstances neither the ration decidendi of Dosso. V. State nor that of Asma Jilani.V. the Punjab Government is applicable to the present case.

স্থানাভাবে সাদামাটা বাংলায় সংক্ষিপ্ত সার দিচ্ছি। পাক সুপ্রিম কোর্ট বলেন, সামরিক বাহিনী একটি অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হস্তক্ষেপ করেছিল। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ এ কে ব্রোহীর ভাষায়, 'সংবিধানকে অকার্যকর নয়, বরং সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই একটি সেতু তৈরি করতে এসেছে সামরিক শাসন।' প্রধান বিচারপতির ভাষায় 'এটি সংবিধানকে উড়িয়ে দেয়া নয়, বরং এটি ছিল একটি সাংবিধানিক বিচ্যুতি।'

www.pathagar.com

ওপরের এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মার্শাল ল' যদি আসতে চায় তাহলে আইন করে তার পথে বাধা সৃষ্টি হয়তো করা যায়। কিন্তু তারা আসতে চাইলে তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কোনটা বৈধ, আর কোনটা অবৈধ, কে করবে তার বিচার? আপনি হয়তো বলবেন, সুপ্রিম কোর্ট সেই বিচার করবে। কিন্তু পাকিস্তানে তো দেখছেন যে ৫৮ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরে তিনবার সামরিক শাসন এসেছিল এবং তিনবার তিন রকম রায় দেয়া হয়েছে। সব রায়ই দিয়েছেন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধান বিচারপতিসহ তাদের ফুল বেঞ্চ। আবার জেনারেল পারভেজ মোশাররফের আমলে সামরিক শাসনের বৈধতা বিচার করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ সুস্পষ্টভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হন। এসব রায়ে জড়িত ছিলেন এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিচারকবৃন্দ। এরা হলেন, জাস্টিস মোহাম্মদ মুনির, জাস্টিস আনোয়ারুল হক, জাস্টিস হামুদুর রহমান, জাস্টিস কর্নেলিয়াস, জাস্টিস আজমল মিয়া, জাস্টিস ইয়াকুব আলী প্রমুখ। অথচ এসব আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাংবিধানিক রায়ের ওপর দারুণভাবে নির্ভর করেছেন আমাদের হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ। বর্তমান সময়কে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই রায় দিয়েছেন। সময়ের আবর্তনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। যখন এসব মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ থাকবেন না তখন কি হবে? হয়তো তারা বলবেন, 'হাকিম নড়ে, কিন্তু হুকুম নড়ে না'। কথাটি কি সব সময় সত্য হয়? সাম্প্রতিক অতীতের উদাহরণ সে কথা বলে না।

॥ তিন ॥

এবার বাংলাদেশের দিকে তাকানো যাক। এখানে সামরিক শাসন জারি হয়েছে দু'বার অথবা তিন বার। সিএমএলএ এসেছেন তিনজন। গত মঙ্গলবার বলেছি যে, প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ। তিনি সামরিক আইন জারি করলেও সংবিধান বাতিলও করেননি অথবা স্থগিতও করেননি। তার আমলে সংবিধান কার্যকর ছিল। সংসদও চালু ছিল। তিনি যে মন্ত্রী সভা গঠন করেছিলেন, তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য। কিন্তু মোশতাকের ক্ষেত্রে গোড়ায় যে গলদটি ছিল সেটি হলো এই যে, যেহেতু সংবিধান চালু ছিল তাই প্রেসিডেন্ট পদে তার সমাসীন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভাইস প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করার কথা। আর সেটি না হলে স্পীকার প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর ছিল চরম বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াচ্ছন্ন পরিস্থিতি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে কর্নেল ফারুকের ট্যাঙ্ক বাহিনীকে বঙ্গভবন থেকে হটিয়ে দেয়া হয় এবং ব্যাংকক

www.pathagar.com

পাঠিয়ে দেয়া হয়। খন্দকার মোশতাক আহমেদ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন এবং এই দুই সামরিক অফিসারের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। মোশতাকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসান কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ ও মেজর ডালিমসহ ১৭ জন সামরিক অফিসারের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর ওই অংশটি যারা ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন। দৃশ্যপট থেকে সামরিক বাহিনীর এই অংশটি অপসারিত হলে খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনীর অপর অংশ ক্ষমতা দখল করেন। তারা কি করবেন, সেটি নিয়ে চরম

সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। তাই তারা ৩ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত খন্দকার মোশতাককেই প্রেসিডেন্টের গদিতে রাখেন। ৬ তারিখ রাতে তারাই মোশতাককে সরিয়ে প্রধান বিচারপতি জাস্টিস আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসান। এই তিনদিন বাংলাদেশ কার্যত ছিল সরকারবিহীন এবং দেশে বিরাজ করে চরম অরাজকতা। আসলে খন্দকার মোশতাক এবং বিচারপতি সায়েম ছিলেন সেনাবাহিনীর ফারুক রশীদ গ্রুপ এবং খালেদ মোশাররফ গ্রুপের শিখণ্ডি। বিচারপতি খায়রুল হক এবং বিচারপতি ফজলে কবিরের ডিভিশন বেঞ্চ যদি এ বিষয়টি আরো ভালভাবে বর্ণনা করতেন তাহলে হয়তো সব দোষের জন্য মোশতাক এবং সায়েমকে 'নন্দ ঘোষ' হিসেবে চিহ্নিত হতে হতো না।

ফারুক-রশিদ যে কাজটি মোশতাককে দিয়ে করাননি সেই কাজটি খালেদ-জামিল সায়েমকে দিয়ে করিয়েছেন। মোশতাককে দিয়ে সংবিধান বহাল রাখা হয়েছিল। কিন্তু খালেদ জামিলরা সংবিধান স্থগিত করেন। মোশতাককে দিয়ে জাতীয় সংসদও বহাল রাখা হয়েছিল। কিন্তু খালেদ জামিল জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। সুতরাং যাকেই স্কেপগোট বানানো হোক না কেন, নেপথ্য নটরাজকে বের করতে না পারলে ইতিহাস অবিকৃত হবে না।

অনেক কথাই বলার থাকলো। তাই আগামীতে (১) সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের রায় (২) সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তার প্রায়োগিক বাস্তবতা (৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হাইকোর্টের রায় (৪) ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বলার ইচ্ছে নিয়ে আজকে বিদায় নিচ্ছি। (দৈনিক ইনকিলাব : ২৪-০৮-২০১০)

www.pathagar.com

২৯

সপ্তম সংশোধনীর রায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তাহের হত্যা দালালদের মুক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে কিছু কিছু ঘটনা এত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে ঘটছে যে, সেগুলোর সাথে তাল রাখতে গিয়ে 'ইনকিলাবে'র সম্মানিত পাঠকদের কাছে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। গত সপ্তাহে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, আজকের লেখায় নিম্নলিখিত বিষয় বা ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করবো। এগুলো হচ্ছে- (১) সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে একাধিক বিচারপতির রায় (২) সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং তার প্রায়োগিক বাস্তবতা (৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হাইকোর্টের রায় (৪) ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে গত ২৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার মাননীয় হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দিয়েছেন। এই বেঞ্চের দুইজন বিচারপতি হলেন জাস্টিস এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এবং জাস্টিস শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের পথ ধরে এসেছে সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায়টি। এখন সারাদেশের বিভিন্ন মিডিয়াতে এটি নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। তাই এর বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ে যেমন মোশতাক, সায়েম এবং জিয়াকে ক্ষমতার অবৈধ দখলদার বলা হয়েছে, তেমনি সপ্তম সংশোধনীর রায়েও জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতার অবৈধ দখলদার বলা হয়েছে। রায়টি যদি এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে হয়তো আজকের এই কলাম লেখার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সিদ্দিক আহমদ নামক এক ব্যক্তি খুনের অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে মামলাটি করলেন সেটি এরশাদের সামরিক শাসনামলকে অবৈধ ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। সেটি পেছনে যেতে যেতে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং তারও ৭ বছর আগে লাহোর প্রস্তাব পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো। সেই লাহোর প্রস্তাব এবং '৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টি সম্পর্কে যদি ইতিহাস নির্ভর সঠিক তথ্য পরিবেশিত হতো তাহলেও হয়তো আজকের লেখায় ওই প্রসঙ্গের অবতারণা করার প্রয়োজন হতো না। ইতিহাসকে তার সঠিক অবস্থানে প্লেস করার জন্যই গত সপ্তাহে প্রদত্ত ওয়াদার পরিবর্তে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের লিখতে হচ্ছে। মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে সবিনয়ে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। বিচার বিভাগ যদি কোনো মামলার রায় ঘোষণা করতে গিয়ে কোনো ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

ঘটনার অবতারণা করেন এবং সেই বিষয়ে প্রদত্ত তথ্যাবলী যদি সঠিক না হয় তাহলে ইতিহাসবেত্তাদের অবশ্যই কিছু করণীয় থাকে। যারা ইতিহাস রচনা করেন তারা অতীত খুঁড়ে সত্যের মণিরত্ন বের করে আনেন। পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে আমি ধারাবাহিকভাবে লিখে যাচ্ছি। সপ্তম সংশোধনী মামলার রায় নিয়েও ধারাবাহিকভাবে লেখার ইচ্ছা আছে। তবে এই মুহূর্তে দু'টি কারণে সেটি সম্ভব হবে না। একটি হলো, হাইকোর্টের এই রায়টির পূর্ণ বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত এরশাদ সাহেব রায়টি মেনে নিয়েছেন। এরপর তিনি আর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে যাবেন কিনা সেটি আমাদের জানা নেই। যদি এই মামলাটি আপিল বিভাগে যায় তাহলে সেটি হবে চূড়ান্ত রায়। ততোদিন পর্যন্ত আমাদের পক্ষেও চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব হবে না। আর যদি আপিল বিভাগে না যায় তাহলে হাইকোর্ট বেঞ্চের এই রায়টি চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এখন দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই রায়ের অংশ বিশেষ অথবা সংক্ষিপ্তসার যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে সেটির বিপরীত কোনো ভাষ্য বা বিবরণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আসেনি। ফলে ধরে নেয়া যায় যে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট হাইকোর্ট বেঞ্চের রায়েরই অংশ বিশেষ।

॥ দুই ॥

রোববার এই লেখার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে গিয়ে সেই দিনের পত্রিকায় দেখলাম যে, জেনারেল এরশাদ তথা জাতীয় পার্টি নাকি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল করবেন না। কারণ তাদের মতে তারা গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন। তারা সামরিক শাসনে নাকি বিশ্বাস করেন না। যাইহোক, দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখন আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

সপ্তম সংশোধনীর রায়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়। আদালত বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এ অঞ্চলের মানুষ এ বিভক্তি মেনে নেয়নি। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের দূরত্ব ছিল এক হাজার মাইল। খুব কম ব্যাপারেই দুই অংশের মানুষের মধ্যে মিল ছিল। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মাঝে ছিলো বিরাট ভৌগোলিক দূরত্ব। রায়ে আরো বলা হয় যে, মোহাম্মদ আলী জিন্নার কারণেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি।

আদালতের রায়ে আরও বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী পাকিস্তান সমর্থনকারী শাহ আজিজুর রহমান, কর্নেল মোস্তাফিজ, মাওলানা এমএ মান্নান, আব্দুল আলীম, এএসএম সোলায়মানসহ অনেককে জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করে মুক্ত

www.pathagar.com

করে দিয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সুযোগ করে দেন। শেখ মুজিবের খুনিদের বিদেশী দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরুর জন্য ৭৯ সালে রেফারেন্ডাম দেয়া হয়।

রায়ের এই অংশ দু'টি যদি ইতিহাস আশ্রয়ী হতো তাহলে আমরা অবশ্যই সেটিকে সাধুবাদ জানাতে পারতাম। কিন্তু ইতিহাস বলছে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে ওই সভায় যোগদান করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। বাংলা তখন অবিভক্ত ছিল। জনাব ফজলুল হক সেই অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ভারতীয় ডোমিনিয়নে অবিভক্ত বাংলা তখন বিশেষ মর্যাদা ভোগ করতো। সেজন্য বাংলার মন্ত্রিসভার প্রধানকে 'মুখ্যমন্ত্রী' না বলে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হতো। সেই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয়, No constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary. That the areas in which the Muslims are numerically in majority as in the North-Western and Eastern Zone of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

এই প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত সার হলো ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চলে একটি রাষ্ট্র এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চলে একটি রাষ্ট্র এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলিম প্রধান এই দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

॥ তিন ॥

এরপর পানি অনেক দূর গড়িয়ে যায়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলা মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আবুল হাশিম (ড. বদরুদ্দীন ওমরের পিতা), কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায় এবং নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর ভাই শরৎচন্দ্র বসু স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বা বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য জোর চেষ্টা চালান। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল রূঢ়ভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

www.pathagar.com

এর মধ্যে ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ৪৯৫টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৪৩০টি আসন। কংগ্রেসের দুই শীর্ষ নেতা পণ্ডিত নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেল স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাব পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করলে বাংলার নেতা সোহরাওয়ার্দী যে সংগ্রাম করেন সেই সংগ্রামে তাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন যোগান সিনিয়র নেতা বগুড়ার মোহাম্মদ আলী (পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) প্রমুখ। এরপর জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লী কনভেনশনে যোগদান করেন। এই কনভেনশনে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ টিকিটে নির্বাচিত সদস্যরা যোগদান করেন। জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে আর কেউ নয়, স্বয়ং বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী হিসেবে '৪৬ সালের ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হায়, "That the zones comprising Bengal and Assam in the North-Eest the Punjab the North-West Frontier Province, Sind and Balochistan in the North-West of India, namely Pakistan zones, where the Muslims are in dominant majority, be constituted into a sovereign independent state and that an unequivocal understanding be given to implement the establishment of Pakistan without delay. That the two separate constitution making bodies to be set up by the people of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitutions" বাংলায় এর সারাংশ দাঁড়ায়, "স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান গঠিত হবে সেই সব এলাকা নিয়ে যেখানে রয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এসব অঞ্চল হলো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান। নিজ নিজ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়নের জন্য পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানে গঠিত হবে দুইটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা বা গণপরিষদ।"

॥ চার ॥

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লাহোর প্রস্তাবে অবিভক্ত ভারত বর্ষের দুই অঞ্চলে দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। একটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। সেই জন্যই লাহোর প্রস্তাবে শব্দটি ছিল STATES। কিন্তু ৬ বছর পর দিল্লী কনভেনশনে STATES থেকে S বাদ পড়ে যায়। এটি কংগ্রেসের একগুঁয়েমির কারণেই বাধ্য হয়ে করতে হয়। ফলে দুই অঞ্চলের

www.pathagar.com

মাঝে ১০০০ মাইলের ব্যবধান থাকলেও সেই দু'টি অঞ্চল নিয়েই একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হয়, যার নাম পাকিস্তান। সুধীবৃন্দ লক্ষ্য করবেন যে, লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এক বাঙালি। তিনি ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। আবার সেই প্রস্তাব সংশোধন করে আরেকটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন আরেক বাঙালি। তিনি ছিলেন বাংলার আরেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ইনিই সেই সোহরাওয়ার্দী যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর গঠন করেন আওয়ামী লীগ। যতোদিন সোহরাওয়ার্দী জীবিত ছিলেন ততোদিন বাংলাদেশে তার প্রধান শক্তি, প্রধান স্তম্ভ এবং দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের এমন জ্বলন্ত সত্য কিভাবে হাইকোর্টের মতো একটি অসাধারণ মর্যাদাশীল বেঞ্চের দুই মান্যবর বিচারপতির রায়ে ভিন্নভাবে অন্তর্ভুক্ত হলো, সেটি এখনও আমাদের বোধগম্য হয় না।

কাহিনীর কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যে কথাটি মহামান্য আদালত বলেননি সেই কথাটি এখানে আমি উল্লেখ করছি। সেটি হলো এই যে, দিল্লী কনভেনশনে পাকিস্তানের যে রূপরেখাটি অঙ্কিত হয়েছিল সেই পাকিস্তানও আমরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাইনি। আসাম পাকিস্তানে আসেনি, শুধু গণভোটের মাধ্যমে আসামের একটি অংশ সিলেট পাকিস্তানে এসেছে। বাংলা ভাগ হয়েছে। (১) দিনাজপুরের একটি অংশ পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতের ভাগে পড়েছে। তেমনি (২) মুর্শিদাবাদ (৩) মালদহ (৪) নদীয়া (৫) যশোর (বনগাঁসহ) ২৪ পরগণার বশিরহাট ও বারাসাত (৬) ত্রিপুরা (৭) জলপাইগুড়ি (৮) কুচবিহার (৯) করিমগঞ্জ (১০) কাছাড় (১১) ধুবড়ি (১২) হাইলাকান্দি ইত্যাদিও পাকিস্তানে আসেনি। সেদিন যদি এসব অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে আজ বাংলাদেশের মানচিত্র তথা আয়তন আরো বড় হতো। কিন্তু সে জন্য কি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দায়ী করা হবে? আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, এই জন্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মোটেই দায়ী নন। কেন এই বিভক্ত বাংলা তথা পোকায় খাওয়া কীটদংশিত বাংলা আমরা পেলাম সে ব্যাপারেও আমি দলিলপত্রসহ এই কলামেই লিখবো, ইনশাআল্লাহ। এবং সেটাও খুব শ্রীঘ্রই।

॥ পাঁচ ॥

লেখাটি বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আরো দুই-একটি বিষয় আজকে উল্লেখ না করলেই নয়। কারণ জেনারেল এরশাদের মার্শাল ল'কে অবৈধ ঘোষণা করতে গিয়ে হাইকোর্টের রায়ে এমন কতগুলো মন্তব্য করা হয়েছে, এমন কিছু ব্যক্তির নাম নেয়া হয়েছে এবং এমন এক পটভূমিতে নেয়া হয়েছে, যেটি ইতিহাসের আলোকে, গবেষণার আলোকে প্রচণ্ড বিতর্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য।

www.pathagar.com

মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে যে–

১. জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের সহযোগী বাহিনীর (Auxiliary Force) দালালদের পুনর্বাসিত করেছেন। এরা হলেন- (ক) শাহ আজিজুর রহমান (খ) মাওলানা এম এ মান্নান (গ) এএসএম সোলায়মান (ঘ) কর্নেল মোস্তাফিজুর রহমান এবং আরো অনেকে।

২. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কালে যারা হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপরাধ করেছিল সেই সব স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে দালাল আইন বাতিলের মাধ্যমে জিয়া মুক্তি দিয়েছিলেন।

৩. জিয়া মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান 'জয় বাংলা' পরিবর্তন করেছিলেন এবং বাংলাদেশ বেতারের নাম বদলে দিয়েছিলেন।

৪. ১৯৬৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেনারেল জিয়া খেমকারান সেক্টরে যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সেটি তিনি তার ইউনিটকে উপহার দিয়েছিলেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যে পিস্তল ব্যবহার করেছিলেন সেটি তিনি তার ইউনিটকে উপহার দেননি।

৫. জিয়ার অপরাধ এরশাদের অপরাধের চেয়ে অনেক বেশি। কর্নেল তাহেরসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে জিয়া ক্যাঙ্গারুকোর্টে ফাঁসি দিয়েছিলেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্য জেনারেল জিয়া বদ্ধপরিকর ছিলেন।

এখানে ইতিহাস থেকে হাইকোর্টের এই বেঞ্চটি সরে গেছেন। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের একটি অংশ। স্বাধীনতা বিরোধী শব্দটি রাজনৈতিক দল বা রাজনীতিবিদরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। হাইকোর্টও কিছু লোককে 'স্বাধীনতা বিরোধী' বলবে, সেটি ভাবাই যায় না। 'জয় বাংলা' বনাম 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' এবং 'বাংলাদেশ বেতার বনাম রেডিও বাংলাদেশ' প্রভৃতি ইস্যু একটি দলের বিরুদ্ধে আর একটি দলের রাজনৈতিক পরিভাষার লড়াই। এই প্রথম দেখা গেল যে হাইকোর্ট তেমন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা প্রয়োগ করলেন। জেনারেল জিয়া ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত পিস্তলটি তার ইউনিটকে উপহার দেয়ায় তার সমালোচনা করলেন হাইকোর্ট। ইতিপূর্বে উচ্চ আদালত কর্তৃক এই ধরনের সমালোচনা শোনা যায়নি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে শিশু পার্কে রূপান্তরিত করার মধ্যে যে কোন রাজনৈতিক মতলব নিহিত আছে, সেটি এ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলও বলেনি। এই প্রথম হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ থেকে এমন মন্তব্য শোনা গেল। শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে দালাল আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি যারা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তখন অভিযুক্ত ছিলেন না, তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। শেখ মুজিব এই কাজটি করেছিলেন জাতিকে আর বিভক্ত রাখার জন্য নয় বরং বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। হাইকোর্টের এই মন্তব্য শেখ মুজিবের সেই প্রচেষ্টার প্রশংসা নয়, বরং সমালোচনা বলেই সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিভাত হবে।

কর্নেল তাহের হত্যা মামলার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের এই মন্তব্যের ফলে বিচারাধীন সেই মামলাটি প্রভাবিত হয় কিনা সেটি ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে না। কিন্তু হাইকোর্টের এই বেঞ্চ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অনুমতি দেয়ার জন্য জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেছেন। এই মামলাটি ছিল জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু হাইকোর্টের রায়ের সিংহভাগ ব্যয় করা হয়েছে মরহুম জিয়াউর রহমানের সমালোচনায়।

প্রিয় পাঠক লেখাটি অনেক বড় হয়ে গেলো। এখন দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে গেলে আমাকে আরো বেশ কয়েকটি কিস্তি লিখতে হবে। এসব কিস্তিতে আমি ৩রা নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান, সিপাহী জনতার ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময় খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা প্রমুখের হত্যাকাণ্ড, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে সাবেক তিন প্রধান বিচারপতির রায় কেন বাংলা ভাগ হল ইত্যাদি বিষয় আগামিতে আলোচনা করার ইচ্ছে রেখে আজকের লেখা শেষ করছি। (দৈনিক ইনকিলাব : ৩১-০৮-২০১০)

www.pathagar.com

(৩০)

৩ থেকে ৭ নভেম্বর : পাল্টা অভ্যুত্থান এবং সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী

গত মঙ্গলবার কথা দিয়েছিলাম যে, আজকের লেখায় আমি ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সময় খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা, মেজর হায়দার প্রমুখের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে লিখবো। সেই ওয়াদা আজ পালন করবো, ইনশাআল্লাহ। তার আগে শুধু 'ইনকিলাব'-এর সম্মানিত পাঠকবৃন্দই নন, দেশবাসীর কাছে একটি সবিনয় নিবেদন রাখতে চাই। আমরা দেখছি যে, সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে অতীতের কোনো এক সময় সংঘটিত কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা এবং মূল্যায়ন বর্তমানকালে এসে বদলে যায়। তাই দেখা যায় যে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে যেসব ঘটনা ঘটেছে, যথা পলাশীর যুদ্ধ, ব্রিটিশ আমলের সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, ভারত বিভক্তি, ৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনার মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বদলে যাচ্ছে। ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে নিত্যনতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া হয়তো চলতে থাকবে। সেটি চলুক। কিন্তু যারা সেসব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করবেন তাদের অন্তত একটি ন্যূনতম সততা থাকতে হবে। সেটি হলো, ঘটনার বর্ণনা বা উপস্থাপনায় সত্যনিষ্ঠ থাকা এবং যে কোনো রকম ডিসটর্সন বা বিকৃতির ঊর্ধ্বে থাকা। সাম্প্রতিক সময়ে সামরিক আইন জারি করা, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটা ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথাই হচ্ছে, যেসব কথা উচ্চতর আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালত সেসব ঘটনার ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তো তারা সেটা দিন। আমি সত্যনিষ্ঠতার কষ্টিপাথরে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে চাই। বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল তিনটি। এর মধ্যে ১৫ আগস্ট সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন। সুতরাং সেটি আর আজকের আলোচনায় আনছি না। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছিল সেটি সংবিধানসম্মত ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস থেকে এটিও দেখা যাচ্ছে যে, সরকার গঠনের পর ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ওই সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী প্রধানগণ। সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত এবং আমেরিকাসহ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র।

www.pathagar.com

উচ্চ আদালতের রায়ে ক্ষমতার অবৈধ দখলদারদের তালিকায় এসেছে তিনটি নাম। সেই তিনটি নাম হলো- খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ, প্রধান বিচারপতি সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান। বিচারপতি সায়েম দৃশ্যপটে এসেছেন ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা রাতে। জেনারেল জিয়া দৃশ্যপটে এসেছেন ৭ই নভেম্বর দিনের বেলায়। কিন্তু মাঝখানে একটি ছোট্ট সময় রয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে যে, সেই সময়টি মহামান্য আদালতের সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ রায় থেকে হারিয়ে গেছে। ইতিহাসকে তার সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্য এই হারিয়ে যাওয়া সময়টুকু পুনরুদ্ধার করতে হবে। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়টি হলো ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন দিন। এই সাড়ে তিন দিনে ঘটেছে কতগুলো রুদ্ধশ্বাস ঘটনা। এসব ঘটনা মাত্র সাড়ে তিনদিনের ব্যবধানে ওলোট-পালট করে দিয়েছে আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক দৃশ্যপট। এই সাড়ে তিনদিনের একেবারে শুরুতেই ঘটেছে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান, এসেছে একটি সামরিক শাসন, যে অভ্যুত্থানের কথা আমাদের অতি সাম্প্রতিককালে রচিত ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। আসুন, এবার ৩৫ বছর পেছনে ফিরে যাই এবং ৩৫ বছর আগের অতীত খুঁড়ে ছোট্ট ইতিহাসটিকে টেনে বের করে আনি।

॥ দুই ॥

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যখন আওয়ামী লীগের প্রথম সরকারের পতন ঘটে তখন কিন্তু জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন না। তখন সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল সাফায়াত জামিল ছিলেন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার। ওই অভ্যুত্থান ঠেকানোর মূল দায়িত্ব ছিল কিন্তু সেনাপ্রধান এবং ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডারের ওপর। ইতিহাসকে তার সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য উল্লেখ করা দরকার যে, খন্দকার মোশতাক সামরিক শাসন জারি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সংবিধান স্থগিত করেননি এবং জাতীয় সংসদও ভেঙ্গে দেননি। এছাড়া তিনি সামরিক শাসন জারি করলেও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ (সিএমএলএ) গ্রহণ করেননি। ডামি হিসেবে মোশতাককে সামনে রাখা হয়। তার পেছনে আসল শক্তি ছিলেন কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ ও মেজর ডালিমসহ ১৭ জন কর্নেল ও মেজরের গ্রুপটি।

৮৩ দিন খন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতায় ছিলেন। এই ৮৩ দিনের মধ্যে একদিনও তিনি ঢাকার বাইরে বের হননি। অষ্টপ্রহর বঙ্গভবনে তিনি সাঁজোয়া বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সেনাবাহিনীর অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসারদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকায় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। এই

www.pathagar.com

পুঞ্জীভূত ধূমায়িত অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটে ওই বছর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানে। কিন্তু এটি কোনও সুপরিকল্পিত অভ্যুত্থান ছিল না। ১৯৯০ সালের ৭ই নভেম্বর দৈনিক 'ইনকিলাবে' প্রকাশিত একটি রচনা থেকে জানা যায়, একটি পাল্টা অভ্যুত্থানের খবর ১৯৭৫ সালের ১৭ অক্টোবর থেকেই উচ্চ পর্যায়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। এমনকি পাল্টা অভ্যুত্থানের দু'দিন পূর্বে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমেদের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মরহুম জেনারেল ওসমানী ও তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানানো হলে তারা তা বিশ্বাস করেননি।

৩ নভেম্বর গভীর রাতে পদাতিক বাহিনীর একাধিক ইউনিট বঙ্গভবন অভিমুখে মার্চ করে। পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে, সেটি টের পেয়ে ট্যাংক রেজিমেন্টের একটি ইউনিট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পজিশন নেয়। এভাবে পদাতিক বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট এবং ট্যাংক রেজিমেন্ট মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। কর্নেল ফারুকের ইউনিটও নাকি পাল্টা জবাব দেয় যে, তারাও প্রয়োজনে ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করবেন। বলাবাহুল্য পাল্টা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল সাফায়াত জামিল। এভাবে সেনা এবং বিমানবাহিনীর একাধিক ইউনিট যখন মুখোমুখি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তখন সেনাবাহিনী এবং নাগরিক সমাজের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারেন যে, যদি সশস্ত্র বাহিনীর বিবদমান ইউনিটগুলোকে সংযত করা না যায় তাহলে ভয়াবহ রক্তপাত ঘটবে। এমন একটি পরিস্থিতিতে কর্নেল ফারুক এবং খালেদ মোশাররফের মধ্যে নেগোশিয়েশন শুরু হয়। তখন জনশ্রুতি ছিল যে, তৎকালীন নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল অ্যাডমিরাল এম এইচ খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এম জি তাওয়াব কর্নেল ফারুক, রশীদ ও খালেদ জামিল গ্রুপের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ পরিহারের জন্য তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দূতিয়ালী করেন। তাদের মধ্যেকার আলাপ-আলোচনা শেষে যে ফয়সালা হয় সেটি ছিল নিম্নরূপ :

মোশাররফ ও জামিলের ইউনিট ফারুকদের ইউনিট আক্রমণ করবে না। বিনিময়ে ফারুক গ্রুপ দেশের বাইরে চলে যাবে। তবে তারা যেন নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে পারেন, সেই গ্যারান্টি দিতে হবে খালেদ মোশাররফকে। এই ফয়সালা মোতাবেক একটি বিশেষ বিমানে ফারুক রশিদ গ্রুপকে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওই সময় বাজারে এ মর্মে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ওই বিশেষ বিমানে খালেদ মোশাররফের স্ত্রীও যাচ্ছেন। কারণ ঢাকা বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানটি টেকঅফ করার পর যাতে ওয়াদা ভঙ্গ করা না হয় সে জন্য ওয়ার্ড অব অনার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার

www.pathagar.com

খালেদ মোশাররফের স্ত্রী ওই বিমানে আরোহণ করেন। ব্যাংককে ফারুক গ্রুপ নিরাপদে অবতরণ করেন এবং সেই সময়কার গুঞ্জন মোতাবেক বেগম খালেদ মোশাররফও নিরাপদে দেশে ফিরে আসেন। এরপর তিনদিন কেটে যায়। এই তিনদিন বাংলাদেশে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। খন্দকার মোশতাক নামকাওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু কার্যত তিনি ছিলেন কর্নেল সাফায়াত জামিলের নিয়ন্ত্রণাধীন জওয়ানদের হাতে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি।

॥ তিন ॥

৩ নভেম্বর সকালে রেডিওর সংবাদ বুলেটিন প্রচারে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে। সংশ্লিষ্ট সকলে যখন রেডিও বাংলাদেশের এই নীরবতায় উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত তখন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি রুশ মিগ-২১ জঙ্গী বিমান ঢাকার আকাশে উড্ডয়ন করে এবং বারবার বঙ্গভবনের ওপর চক্কর দিতে থাকে। পরবর্তীতে জানা যায় যে, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত এই বিমান চালনা করেন। উদ্দেশ্য, জঙ্গী বিমান দিয়ে সাঁজোয়া বাহিনীকে ভয় দেখানো এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

এভাবে ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশ সরকারবিহীন অবস্থায় চলতে থাকে। এর মধ্যে মোশাররফ-জামিল সংবিধান স্থগিত করেন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ৬ তারিখ সন্ধ্যায় খন্দকার মোশতাক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবার পর তিনি সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা সিএমএলএ ঘোষণা করেন। সুতরাং ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে-

১. বিচারপতি সায়েম বাংলাদেশের প্রথম সামরিক আইন প্রশাসক।
২. ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান অর্থাৎ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।
৩. ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল সাফায়াত জামিল ক্ষমতা গ্রহণের পর সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার করেন এবং ক্যান্টনমেন্টের একটি অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখেন।

ইতিপূর্বে বলেছি যে, ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে বিশেষ করে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে চলছিল অনিশ্চয়তা ও অচলাবস্থা। এই সময় সারাদেশের সেনানিবাসে ব্যাপকভাবে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। যারা এই প্রচার পত্রটি বিলি করে তারা নিজেদের পরিচয় দেন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'র কর্মী হিসেবে। সেই সময় দাবানলের মতো এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে যে, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার চেয়ারম্যান

www.pathagar.com

হচ্ছেন কর্নেল আবু তাহের। ওই দিকে খালেদ মোশাররফরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের ভাই আওয়ামী লীগের এমপি রাশেদ মোশাররফ এবং তাদের মাতার নেতৃত্বে ধানমন্ডিতে একটি মিছিল বের হয়। ওই মিছিলে খালেদ মোশাররফ ও সাফায়াত জামিলের পাল্টা অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে শ্লোগান ও বক্তৃতা দেয়া হয়। এই খবরটি দৈনিক 'ইত্তেফাকে'র প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে ব্যাংকক পৌঁছে কর্নেল ফারুক একটি বিবৃতি দেন। ওই বিবৃতিতে বলা হয় যে, ভারতের প্রত্যক্ষ মদদে আওয়ামী লীগের সমর্থনে খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল জামিলের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি অংশ পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। এটি হলো প্রো-ইন্ডিয়ান ও প্রো-আওয়ামী লীগ অভ্যুত্থান বা প্রতিবিপ্লব। ৪ নভেম্বর রাতে এবং ৫ নভেম্বর বিবিসি'র সকালের বাংলা বুলেটিনে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, ৩ নভেম্বর ভারতপন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে এবং দেশে একটি 'প্রো-ইন্ডিয়ান ক্যু' হয়েছে।

এসব কিছুর সম্মিলিত ফল হিসেবে সেনা ছাউনিতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ৫ নভেম্বর রাত ১০টার পর থেকেই বিভিন্ন চ্যানেলে ঢাকায় খবর আসতে থাকে যে কুমিল্লা ও বগুড়া প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সিপাহীরা ঢাকা অভিমুখে মার্চ করছে। ৬ নভেম্বর কয়েকটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে খবর পৌঁছে যে, কয়েকটি সেনা ছাউনি থেকে জওয়ানরা হাতিয়ারসহ ঢাকার দিকে রওনা হয়ে গেছে। ৩ নভেম্বর ক্ষমতা দখল এবং ৪ নভেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ সত্ত্বেও ঢাকা এবং মফস্বলের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ সিপাহী এবং সামরিক ছাউনির বাইরে জনতার প্রবল তৎপরতার মুখে খালেদ মোশাররফ সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হন।

॥ চার ॥

এসব রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে মাত্র তিনদিনের মধ্যেই খালেদ মোশাররফ ও সাফায়াত জামিলের প্রতিবিপ্লব সাধারণ সৈনিক ও জনগণের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। তাই দেখা যায় যে, ৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় মোশতাকের পদত্যাগ এবং সায়েমের প্রেসিডেন্ট নিযুক্তি ও দেশে মার্শাল ল' জারির পরেও শেষ রাতে সিপাহীরা অশান্ত হয়ে ওঠে এবং সেনা ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারা যেসব শ্লোগান দেয় সেগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য শ্লোগান ছিল– "সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই/অফিসারদের রক্ত চাই"। জওয়ানরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে এবং প্রতিবিপ্লবের নায়ক জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হত্যা করে। এছাড়া তারা কর্নেল হুদা এবং মেজর হায়দারকেও হত্যা করে। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সিপাহীরা শ্লোগান দেয়- "জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ", "কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ", "সিকিম নয়, ভুটান

www.pathagar.com

নয়, এ দেশ আমার বাংলাদেশ"। ঢাকা গ্যারিসনের দুর্ধর্ষ বাহিনী নবম ডিভিশনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর নেতৃত্বে একদল সিপাহী ও অফিসার বন্দিদশা থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করেন। হাজার হাজার সিপাহী বিজয় ও আনন্দ উল্লাস প্রকাশের জন্য সারারাত ধরে আকাশে ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। ৭ই নভেম্বর সকাল থেকে একদিকে লক্ষ জনতার পদভার ও অন্যদিকে সেনাবাহিনীর ভারী যানবাহন ও ট্যাংকের ভারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ।

পরদিন সকাল বেলা ঢাকা শহরে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হাজার হাজার সৈনিক তাদের অস্ত্র এবং সিপাহী বিপ্লবের সমর্থনে শ্লোগান দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই বিপ্লবী সৈনিকদের সমর্থনে লাখ লাখ জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সিপাহী এবং জনতা সেদিন রাস্তায় আনন্দ উল্লাসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। ওই দিকে পলায়নের সময় কর্নেল জামিলকে জওয়ানরা আটক করে। তবে জেনারেল জিয়ার হস্তক্ষেপে তিনি প্রাণে বেঁচে যান।

যে খালেদ মোশাররফ এবং শাফায়াত জামিল প্রধান বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছিলেন, তাদের অন্তত তিনজন অর্থাৎ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা এবং মেজর হায়দার বিপ্লবী সিপাহীদের হাতে নিহত এবং অপরজন অর্থাৎ ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল গ্রেফতার হওয়ার ফলে প্রেসিডেন্ট সায়েম নিজেকে অত্যন্ত অসহায়বোধ করেন। সেনাবাহিনী এবং জনতার মধ্যে অভূতপূর্ব বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে, এটি একদিকে আনন্দের সংবাদ। অন্যদিকে সাধারণ জওয়ানরা ব্যারাক ছেড়ে অস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমে এসেছে, এটি আইন-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে উদ্বেগের সংবাদ। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আগে যেটি করণীয় সেটি হলো সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা। ৭ই নভেম্বর আর্মি হেডকোয়ার্টারে সিএমএলএ ও প্রেসিডেন্ট জাস্টিস সায়েমের সভাপতিত্বে সামরিক জান্তার সভা হয়। ওই সভায় দেশ পরিচালনার জন্য জেনারেল জিয়া, নৌবাহিনী প্রধান রিয়াল এডমিরাল এমএইচ খান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াবকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (ডিসিএমএলএ) নিয়োগ করা হয়। তিন বাহিনী প্রধানের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে রাজপথে অবস্থানকারী সশস্ত্র সৈনিকগণকে অবিলম্বে ব্যারাকে ফেরার নির্দেশ দেয়া হয়। কি আশ্চর্য, রাজপথে অবস্থানকারী সৈন্যরাও তাদের বাহিনী প্রধানদের নির্দেশে ব্যারাকে ফিরে যায়। এভাবেই সেইদিন মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেনাবাহিনরি প্রতিটি বিভাগে 'চেইন অব কমান্ড' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

॥ পাঁচ ॥

৭ই নভেম্বর সম্পর্কে 'বাংলা পিডিয়া' যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে সেটি নিম্নরূপ :
ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের সহায়তায় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। তখন খালেদ মোশাররফ জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং তাকে গ্রেফতার করেন। তিনি নিজেই নিজেকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি ঘোষণা দেন এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলকে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে প্রমোশন দেন।

৩ নভেম্বর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে যে রুদ্ধশ্বাস ঘটনাবলী ঘটে গেছে এতক্ষণ ধরে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। এই বর্ণনা দেয়ার সময় নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। এসব ঘটনা সম্পর্কে আমার নিজস্ব অভিমত ও ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার সেই অভিমত এই বর্ণনাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আমরা সকলেই একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি থেকে যাবে। তাই অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ওই তিনদিনের ঘটনাবলী বর্ণনার চেষ্টা করেছি। যারা পরিণত বয়সে ওইসব ঘটনা অবলোকন করেছেন তারা সেসব ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী। তারা তাদের দেখা ঘটনাবলীর সাথে আমার এই বর্ণনা মেহেরবানি করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি ওইসব ঘটনায় কোনো রং চড়িয়েছি কিনা সেটাও তারা অনুগ্রহ করে খতিয়ে দেখবেন।

তিন বাহিনীর তিন প্রধান পরবর্তী এক বছর ১২ দিন পর্যন্ত যৌথভাবে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা ডিসিএমএলএ হিসেবে কাজ করেন। এক বছর ১২ দিন পর জেনারেল জিয়া ১৯৭৬ সালের ১১ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট সায়েম কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন। উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হওয়ার এক বছর সাড়ে পাঁচ মাস অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

প্রিয় পাঠক, ইচ্ছে ছিল আজকেই এই ধারাবাহিক কাহিনীর ইতি টানবো। কিন্তু তারপরও সম্ভব হলো না। কারণ হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায়ের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি। দেখা যাবে, মান্যবর সিটিং জাস্টিসরা যেগুলোকে মৌলিক কাঠামো বলছেন অতীতের অন্তত ২/৩ জন মহামান্য প্রধান বিচারপতি সেগুলোকে মৌলিক কাঠামো বলেননি। তারা অন্য কতকগুলো বিষয়কে মৌলিক কাঠামো বলেছেন। আগামীতে সে সম্পর্কে এবং আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার ইচ্ছে রইলো। (দৈনিক ইনকিলাব : ০৭-০৯-২০১০)।

www.pathagar.com

(৩১)

মৌলিক কাঠামো : সেদিনের সুপ্রিমকোর্ট এবং আজকের সুপ্রিম কোর্ট : দুই জামানার দুই রায়

এই সিরিজে দৈনিক 'ইনকিলাবে'র এই কলামে যখন পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত রায়ের ওপর আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তখন অনেক পাঠক আমাকে টেলিফোন করে এবং ই-মেলের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছেন যে, এ পর্যন্ত এই ধারাবাহিকে কতগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ কেউ একটি বিশেষ লেখা পড়েছেন, কিন্তু তার আগের লেখাগুলো পড়েননি। কেউ হয়তো সর্বশেষ লেখাটি পড়েছেন, কিন্তু আগেরগুলো পড়েননি। এরা এখন সবগুলো লেখার শিরোনাম এবং তারিখ জানতে চাচ্ছেন, যাতে করে তারা আগের কিস্তিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন অথবা ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট নিতে পারেন। সংক্ষেপে আমি আমার সেই সম্মানিত পাঠক ভাই-বোনদের জানাতে চাই যে, প্রকৃতপক্ষে সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত লেখাগুলোর প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় গত ২৭ জুলাই। শিরোনাম ছিলো, 'সংবিধানের ১৪টি সংশোধনীর ধারাবাহিক ঘটনা'। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ৭টি লেখা। লেখাগুলো প্রতি মঙ্গলবার ছাপা হয়েছে। এই সূত্র ধরে খুঁজলে পাঠক ভাইয়েরা আগের সবগুলো লেখাই পেতে পারেন। আজ প্রকাশিত হচ্ছে ৮ নাম্বার কিস্তি। আজকের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সংবিধানের মৌলিক কাঠামো।

যেসব যুক্তির ওপর ভিত্তি করে পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করে উচ্চ আদালতের রায় ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো এই যে, সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অলংঘনীয় এবং সংশোধনের উর্ধ্বে। এসব মৌলিক কাঠামো কোনদিনও সংশোধন করা যাবে না। এই সব মূলনীতি হলো ৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ। এগুলো হলো- (১) গণতন্ত্র (২) সমাজতন্ত্র (৩) ধর্মনিরপেক্ষতা এবং (৪) জাতীয়তাবাদ। গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্র বা সংশোধীয় পদ্ধতির গণতন্ত্র, যেটিই হোক না কেন, সবই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যদি জনগণের ভোটে সেই পদ্ধতির সরকার গঠিত হয়। অবশিষ্ট যে তিনটি মূলনীতিকে উচ্চ আদালতের রায়ে মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে গত ৩রা আগস্ট এই কলামে আমি যুক্তিতর্ক এবং উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি যে, এগুলো অতীতেও রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো ছিলো না, এখনও মৌলিক কাঠামো হতে পারে না। গত ৮ আগস্ট এ সম্পর্কে এই কলামে আমার যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সেটির শিরোনাম ছিলো, "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল ঃ ধর্মীয় রাজনীতি

www.pathagar.com

ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে আ'লীগ"। ওই লেখাতে আমরা বলেছি যে, যেসব গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেসব আন্দোলনের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় ইস্যু হিসেবে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি। গণআন্দোলনের ওইসব পর্যায় হলো–

১. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচি
২. ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচি
৩. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ঘোষিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচি
৪. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো
৫. ১৯৭১ সালের ২৩ জানুয়ারি সাবেক রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত লাখ লাখ লোকের জনসভায় সেই সময়কার জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণকে পাঠ করানো মুজিবের শপথবাক্য
৬. মুজিব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক পেশকৃত পাকিস্তানের খসড়া সংবিধান এবং
৭. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

এই ৭টি দলিলের একটি দলিলেও সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশের মৌলিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইনকিলাবের সম্মানিত পাঠক ভাই-বোন, যারা ৮ আগস্টের লেখাটি পড়তে পারেননি, তাদেরকে ওই লেখাটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, বিচারপতি খায়রুল হক ও বিচারপতি ফজলে কবিরের রায়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকেও মৌলিক কাঠামো বলা হয়েছে। তবে আপিল বিভাগের রায়ে ছোট্ট একটি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ওই রায়ে বলা হয়েছে যে, আমাদের জাতীয়তা অর্থাৎ নাগরিকত্বের পরিচয় হবে বাংলাদেশী, তবে জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝাবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশের ৪০ বছরের জীবনে এবারই সর্বপ্রথম অর্থাৎ পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত হাইকোর্ট বেঞ্চ এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চের রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতিকে মৌলিক কাঠামো বলা হয়েছে। যারা এই রায় দিয়েছেন তারা বর্তমানে অর্থাৎ ২০১০ সালের আপীল বিভাগের বিচারপতি এবং ২০০৫ সালের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ এবং পাঠক সমাজ বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে পাচ্ছি যে, তাদের আগে অন্তত চারজন প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের মৌলিক

www.pathagar.com

কাঠামো বলতে আলোচ্য তিনটি স্তম্ভকে বোঝাননি। তারা বুঝিয়েছেন অন্যান্য বিষয়কে। এসব মান্যবর বিচারপতি হলেন–

১. সাবেক প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজাল
২. সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী
৩. সাবেক প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং
৪. সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

এসব মান্যবর প্রধান বিচারপতিও বিভিন্ন মামলার রায় দান প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় মৌলিক কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে একজন মাননীয় প্রধান বিচারপতি আবার বলেছেন যে, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো বলে এমন কিছু থাকতে পারে না। কারণ সেটি থাকলে কতগুলো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ওপর স্থায়ীভাবে সিলমোহর মেরে দেয়া হয়। এসব বিচারপতি অন্তত দুইটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো বলেছেন। এগুলো হলো– (১) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (২) রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন। এই তিনটি অঙ্গ হলো– (ক) নির্বাহী বিভাগ (Executive) (খ) আইনসভা (Legislature) এবং (গ) বিচার বিভাগ (Judiciary)। যেসব পাঠক এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী তাদেরকে আমি কয়েকটি ঐতিহাসিক মামলার রায় পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। এসব ঐতিহাসিক মামলার রায়কে Landmark Judgements হিসেবে সুধীমহল আখ্যায়িত করেছেন। এসব রায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– (১) হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ (২) সুলতান আহমেদ বনাম সিইসি (৩) হাজী জয়নাল আবেদীন বনাম রাষ্ট্র (৪) এহতেশাম উদ্দীন আহমদ ইকবাল বনাম বাংলাদেশ (৫) জামিউল হক বনাম বাংলাদেশ (৬) নাছিরুদ্দীন বনাম সরকার (৭) আনোয়ার হোসেন বনাম রাষ্ট্র ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে অষ্টম সংশোধনীর একটি অংশ বাতিলের রায়টি ঐতিহাসিক। এই রায়টির নাম 'আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ'। এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সংশোধনীটি বাতিল করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ ঢাকার বাইরে কয়েকটি মফস্বল জেলায় হাইকোর্টের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়ে এটি বাতিল করা হয়। এই ঐতিহাসিক রায়টি প্রদান করেন সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ, যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কিত এই ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়–

"The principal argument of he judgement is that, the constitution stands on certain fundamental principles which are its structural pillars which the parliament cannot amend by its amending power. For, if these pillars are dismissed or damaged then the whole constitutional structure will be down. Basic structure are :

www.pathagar.com

1. Sovereignty belongs to the people 2. Supremacy of the Constitution 3. Democracy 4. Republican Government. 5. Independenec of Judiciary. 6. Unitary State. 7. Separation of powers 8. Fundamental rights.

The structural pillars of the constitution stand beyond any change by amendatory process. If by exercising the amending provision more than one permanent seat of the Supreme Court is catabliahed it destroys the unitary character of the Judiciary". এই রায় মোতাবেক রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোসমূহ হলো– (১) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ। (২) সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব (৩) গণতন্ত্র (৪) প্রজাতান্ত্রিক সরকার (৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (৬) এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র (৭) ক্ষমতার বিভাজন (৮) মৌলিক অধিকার। এগুলো সংশোধনের উর্ধ্বে।

বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর রায় সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে- B.H. Chowdhury. J. has listed (2) unique features which are basic features of the constitution and they are not amendable. He finally held, the impugned amendment violated Articles 102 and 44 of the constitution. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

॥ তিন ॥

বাংলাদেশের অপর একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নাম বিচারপতি এটিএম আফজাল। তিনি আবার রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে অন্যান্য বিচারপতিদের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তার রায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

Judgment of A T M Afzal J. Rejected the doctrine of basic structures on two grounds. That it is unthinkable the makers of the constitution did not leave any option to the future generation but decided on all matters for all people, and secondly the makers of the constitution envisaged the so called basic features to be permanent features of the constitution. He stressed on saying that sub Article (1A) in article 142 provided the procedure of referendum which manifests that other provision of he constitution is not basic that a referendum is required to be incorporated in the constitution. He feared that majority Judgment in the eighth amendment case may be a roadblock for the future.

এই রায়ে তিনি বলেন, এটা ভাবাই যায় না যে যারা বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কোনো বিকল্প রেখে যাননি, বরং সমগ্র জনগোষ্ঠির জন্য এবং সব সময়ের জন্য সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংবিধান প্রণেতারা একেবারে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন, তেমন কথা ভাবাও যায় না। তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, সংখ্যাগুরুর জোরে সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ অষ্টম সংশোধনী বাতিল করে দিয়েছেন, এটি ভবিষ্যতের জন্য রোড ব্লক হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক, সংবিধানের সংশোধন, সেই সংশোধনী বাতিল, রাষ্ট্রের মূলনীতি, সেইসব মূলনীতির সংশোধন, ইত্যাদি বিষয় হলো চলমান প্রক্রিয়া। মানুষ মরণশীল। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে মানুষ এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু রাষ্ট্র থেকে যাবে। সময় বদলে যায়। পৃথিবীও বদলে যায়। আমি প্রথমেই বলেছি যে, পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীতে হাইকোর্ট বিভাগ এবং সুপ্রিম কোর্ট যেসব রায় দিয়েছেন সেসব রায়ের বিরোধিতা করার অন্তত আইনগত সুযোগ নেই। কিন্তু তার পরেও যেসব তথ্য আমি পরিবেশন করছি সেসব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বিচারালয়েও সময়ের আবর্তনে একই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যাচ্ছে। স্থানাভাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব হলো না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রের মূলনীতি বা মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ যে রায় দেন তার সাথে বর্তমান আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতি এবং তার অব্যবহিত পূর্বের প্রধান বিচারপতির রায় মেলে না। অনুরূপভাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর মন্তব্যের সাথে এই ২০০৯ বা ১০ সালের এক শ্রেণীর বিচারপতির রায় বা মতামতের মিল নেই। বিচারপতি এটিএম আফজাল আবার এমন একটি মত দিয়েছেন যেটিকে অত্যন্ত উদারপন্থী বলে মনে হয়। তিনিও তো একদিন প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

প্রিয় পাঠক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে অন্তত চারজন বিচারপতি বিভিন্ন সময়ে অন্তত চার ধরনের বিষয়কে মৌলিক স্তম্ভ বা কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় মোতাবেক ৮টি এবং বর্তমান রায় মোতাবেক ৪টি। মাঝখানে সময়ের ব্যবধান অন্তত ৩০ বছর। এখানে একটি বিষয় গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে যে চারটি বিষয়কে মৌলিক কাঠামো হিসেবে রায় দেয়া হলো, আগামী ১০/২০ বা ৩০ বছর পর আমরা যে সুপ্রিম কোর্ট পাবো, তারা কি এই চারটি মৌলিক কাঠামোকে অপরিবর্তিত রাখবেন? যদি তাদের রায়ে অন্য কিছু মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত হয়, যেমনটি হয়েছে প্রধান বিচারপতি এটিএম আফজাল অথবা প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের রায়ে, তখন সর্বোচ্চ আদালতের এই অপরিবর্তনশীলতা কোথায় যাবে?

॥ চার ॥

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের কেন্দ্রীয় সুর হলো-যেহেতু সামরিক শাসন অবৈধ তাই ওই শাসন থেকে উদ্ভূত বিধিমালারবলে কৃত সমস্ত কাজই অবৈধ। পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে একটি পার্লামেন্ট। রায়ে বলা হয়েছে যে, ওই পার্লামেন্টও অবৈধ। কারণ যে ব্যক্তির আদেশে ওই পার্লামেন্ট গঠন করা হয়েছে, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের (সিএমএলএ) পদ এবং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্টের পদে সেই ব্যক্তির

www.pathagar.com

অধিষ্ঠানও অবৈধ। তাই সেই অবৈধ প্রেসিডেন্টের ফরমানবলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন এবং সেই অবৈধ পার্লামেন্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনীকে অনুমোদনের কাজটিও অবৈধ। তাই পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হয়েছে। ভাল কথা। এই রায়ের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, সামরিক ফরমানবলে গঠিত পার্লামেন্ট নয়, জনগণের ভোটে গঠিত পার্লামেন্ট যে আইন প্রণয়ন করবে, অথবা সংবিধান সংশোধন করবে, একমাত্র সেই পার্লামেন্টের কাজ বা সংশোধনীই হবে বৈধ। তাহলে মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের বৈজয়ন্তী ঊর্ধ্বে উড্ডীন করে বলতে চাই যে, চতুর্থ সংশোধনী পাস করেছে বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট, যেটি জনগণের ভোটে বৈধভাবে গঠিত হয়েছিল। তাহলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে সেই বৈধ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ সংশোধনীও সম্পূর্ণ বৈধ। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সেই বৈধ চতুর্থ সংশোধনীটি বাতিল করা হয়েছে। এই বাতিল করার কাজটি সম্পূর্ণ অবৈধ। তাহলে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট চতুর্থ সংশোধনী বাতিলের এই বেআইনী কাজটিকে কনডন করলেন বা মার্জনা করলেন কিভাবে? এবং বেআইনী পঞ্চম সংশোধনীর আংশিক বৈধতা দিলেন কিভাবে? বজ্রের ধ্বনি কেড়ে নিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে নীতি এবং আদর্শের বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেই নীতি ও আদর্শের পতাকা ঊর্ধ্বে সমন্বিত রাখার জন্য চতুর্থ সংশোধনী পুনর্বহাল করা প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। সেটি না করায় বিষয়টি ডাবল স্ট্যান্ডার্ডে পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে হয়। কোনটি বাতিল হবে, আর কোনটিকে কনডন বা মার্জনা করা হবে, সেই কর্তৃত্ব একান্তই পার্লামেন্টের। সেই কর্তৃত্ব নিজেদের কাছে Arrogate করার ক্ষমতা কোন্ আইনে অর্পিত হলো, সেটি বোধগম্য হয় না। এখানে কি Docrine of Necessity প্রয়োগ করা হয়েছে? মহামান্য উচ্চ আদালত জানেন যে, এই Docrine of Necessity নামক তত্ত্বটি তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। সেই মৃত আইন, যেটি জুরিপ্রুডেন্সে নেই, সেটি পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে কেন অন্তর্ভুক্ত হলো, সেটি বোধগম্য হয় না।

জেনারেল এরশাদের যে সময়টি অবৈধ ঘোষিত হয়েছে সেটি হলো ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল। রাষ্ট্রধর্ম অনুমোদিত হয়েছে তারপরে। যে পার্লামেন্ট এই বিলটি অনুমোদন করেছে সেই পার্লামেন্টও গঠিত হয়েছে এরশাদের এক ফরমান বলে। সেই পার্লামেন্ট কি বৈধ? সেই পার্লামেন্টই তো রাষ্ট্রধর্ম বিলটি অনুমোদন করেছে। পঞ্চম সংশোধনীর রায় মোতাবেক সেই অবৈধ পার্লামেন্ট কি এই সংশোধনীটি পাস করতে পারে? সেটিও কি অবৈধ হয়ে যায় না? সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায়ের পর আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রধর্ম কি আছে? নাকি নেই? বিষয়টি সপ্তম সংশোধনীর রায়ে পরিষ্কার হয়নি। এই বিষয়টিও সপ্তম সংশোধনীর পূর্ণাঙ্গ রায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন। (দৈনিক ইনকিলাব : ২১-০৯-২০১০)

www.pathagar.com

৩২

বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র : হাইকোর্টের ঘোষণা সংসদের আর বলার কিছু নেই

পঞ্চম ও সপ্তম সংবিধান বাতিল সম্পর্কে আমি যা লিখছিলাম তার অষ্টম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। এর মধ্যে কাশ্মীরে পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে শতাধিক কাশ্মীরি স্বাধীনতাকামী নাগরিক শহীদ হন। যেহেতু কাশ্মীর আমাদের এই উপমহাদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে গত ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত ধারাবাহিক রচনা থেকে আমি কিছুটা সরে আসি এবং কাশ্মীর নিয়ে লিখি। আমার দুর্ভাগ্য, এর মধ্যে আমার স্নেহময়ী আম্মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। ফলে আমি বগুড়ায় যাই। ফলে গত ৬ অক্টোবর পাঠক-পাঠিকার খেদমতে হাজির হতে পারিনি। তারপর এসেছে আজ মঙ্গলবার অর্থাৎ ১২ অক্টোবর। এর মধ্যে আমাদের সাংবিধানিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। একটি হলো প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলুল করিমের অবসর গ্রহণ। আরেকটি হলো, নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে জনাব এবিএম খায়রুল হকের দায়িত্বভার গ্রহণ। প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথগ্রহণের পর একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি সোজাসাপ্টা ঘোষণা করেছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সম্পর্কে আপিল বিভাগ যে দিন রায় ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকে অর্থাৎ ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই রায় কার্যকর হয়েছে। সেই রায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে সংবিধান প্রকাশ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি সংবিধান মুদ্রণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। প্রধান বিচারপতির এই রায়ের পরদিন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ বলেন যে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধান মুদ্রণের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হচ্ছে। এর দুই দিন পর বিচারপতি শামছুদ্দিন চৌধুরী ও জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বোরখা বা টুপির মত ধর্মীয় পোশাক পরতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

দেখা যাচ্ছে যে, এসব ব্যাপার ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এত তাড়াহুড়ো করে এসব ব্যাপার কেন ঘটানো হচ্ছে সেটি আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, দেশে নাকি সাড়ে ৩ লক্ষ মামলা পেন্ডিং রয়েছে। অর্থাৎ বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে আছে। ন্যায়বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল হল বিচারবিভাগ। আর

www.pathagar.com

চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল হলো হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগ। হাইকোর্টে এই মুহূর্তে রয়েছেন ৯৮ জন বিচারপতি। মানুষ টাকা পয়সা খরচ করে ন্যায়বিচারের আশায় উকিল মোক্তার নিয়োগ করে আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু বিচারপতির সংখ্যা কম, এই কারণে সময়মত বিচার পাচ্ছে না। সেজন্যই নাকি লক্ষ লক্ষ মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। অথচ বোরখার ক্ষেত্রে দেশের কোনো নাগরিক বিচারের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেননি। সেই ধরনের মামলা স্বউদ্যোগে গ্রহণ করে এমন একটি রায় দেয়ায় দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ স্তম্ভিত হয়েছেন। একটি দৈনিক পত্রিকায় নাটোরের রাণী ভবানী কলেজে বোরখা পরিধান সম্পর্কে কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। সাথে সাথে হাইকোর্টের এই বেঞ্চটি স্বপ্রণোদিত হয়ে অর্থাৎ স্যুয়োমোটো কেসটি টেকআপ করে এবং রায় দেয়। এমন একটি রায় দেয় যেটিকে সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য করা হয়। বিচার বিভাগের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে অবনত মস্তকে জানতে ইচ্ছে করে, বোরখা পরা এবং টুপি পরাই কি এখন বাংলাদেশের বড় সমস্যা? সারা বাংলাদেশের মহিলাদের বোরখা পরানোর জন্য অথবা পুরুষদেরকে টুপি পরানোর জন্য কেউ কি জবরদস্তি করছে? রাণী ভবানী কলেজের এটি তো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বাংলাদেশে এই ধরনের হাজার হাজার কলেজের মধ্যে শত শত নয়, কয়টি কলেজে বোরখা পরা বা টুপি পরা কি একটি সমস্যা হয়েছে? তেমন একটি অনুল্লেখযোগ্য সমস্যা নিয়ে হাইকোর্ট এত বড় একটি রায় দিলেন। ফলটা কি হয়েছে? পত্রিকার পাতাতেই দেখছেন যে, দেশের সমস্ত আলেম ওলামা, মাদ্রাসার শিক্ষক এবং মুসল্লি এই রায়ের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন। এখন আপনি কি এই হাজার হাজার আলেম ওলামার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার চার্জ আনবেন? উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিরা যেমন চান, তেমনি আমরাও চাই যে, আদালত এবং আদালতের মাননীয় বিচারপতিগণ যেন জনগণের মনে মর্যাদা এবং শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন থাকেন। কিন্তু তাই বলে তারা যদি এমন রায় দেন যেটা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, যার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় অনুভূতি এবং পলিটিক্যাল ওভারটোন, সেই ধরনের রায় তো প্রকাশ্য বিতর্কের সৃষ্টি করবেই।

কিছুদিন আগে এই ধরনের অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব গোলাম রব্বানী। এখন তিনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাথে আছেন। সেই জনাব গোলাম রব্বানী ফতোয়া সম্পর্কে একটি রায় দিয়ে আপিল বিভাগে থাকা অবস্থাতেই এক তীব্র বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। আজো তিনি তার সেই বিতর্কিত ইমেজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

www.pathagar.com

উচ্চ আদালতের বিচারকও আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সাধারণ মানুষের মত তাদেরও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে। এমনকি তারা ব্যক্তিজীবনে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থকও হতে পারেন। কিন্তু তিনি সেই সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ কিভাবে ঘটাবেন? যতদিন তিনি বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন তিনি নির্বাচনের সময় তার পছন্দের রাজনৈতিক দলটিকে গোপন ব্যালটে ভোট দেবেন। এর বাইরে তার কিছু করার নেই। আদালতের অঙ্গনে তার রাজনৈতিক মতামতের প্রতিফলন কোনভাবেই ঘটা উচিত নয়। বোরখা পরার ব্যাপারে তো দেশের একজন ব্যক্তিও বিচার প্রার্থনা করে আদালতের দরজায় কড়াঘাত করেননি। তারপরও এমন স্বপ্রণোদিত উদ্যোগ এবং এমন রায়কেন?

॥ দুই ॥

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য এবং সংবিধানকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী হালনাগাদ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করেছেন। জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী সেই কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কো-চেয়ারম্যান। ইতোমধ্যে কমিটি বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে। বাইরে থেকেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে ডাকা হয়েছে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। তারা কি মন্তব্য বা পরামর্শ দিয়েছেন সেটি গোপন রাখা হচ্ছে। আজ ১২ অক্টোবর। কমিটির নাকি চূড়ান্ত বৈঠক বসবে এবং তাদের সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হবে। এরপর সেই সুপারিশমালা জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হবে। জাতীয় সংসদে আলাপ-আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন সাপেক্ষে সেই সব সুপারিশ জাতীয় সংসদ অনুমোদন করবে।

অতঃপর সেগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব কারণে দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ রয়েছে বিশেষ সংসদীয় কমিটির বৈঠকের ওপর। ঠাণ্ডা মাথার বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন যে, এত তাড়াহুড়ো না করে উচ্চ আদালতের সংশ্লিষ্ট বিচারপতিরা জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতেন। এমনিতে খোদ আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করতে অনেক সময় নিয়েছেন। যখন রায়টি ঘোষিত হয় তখন প্রধান বিচারপতি ছিলেন জনাব তাফাজ্জল ইসলাম। আরো একজন বিচারপতি ছিলেন বাবু বিজন কুমার দাস। প্রায় ৫ মাস পর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলো। ততদিন প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম এবং বিচারপতি বিজন কুমার দাস অবসর নিয়েছেন। নতুন প্রধান বিচারপতি হয়েছেন জনাব ফজলুল করিম। বোরখা সম্পর্কে হাইকোর্টের আলোচ্য রায়টি যখন ঘোষিত হলো তখন ফজলুল করিম সাহেবও

www.pathagar.com

আর বিচারপতি নেই। সেখানে এসেছেন জনাব এবিএম খায়রুল হক। 'ডেইলি স্টারে' গত রবিবার ১০ অক্টোবর প্রকাশিত একটি উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে জানা গেল যে, আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বা সিনিয়রমোস্ট বিচারপতি জনাব এম এ মতিন নাকি ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটিতে থাকবেন। তিনি অবসরে যাবেন ২৬ ডিসেম্বর। অর্থাৎ তিনি আর চাকুরীতে ফিরছেন না। দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতম বা সিনিয়রমোস্ট বিচারপতি শাহ আবু নাইমও ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি চেয়েছেন। তিনিও আর ঐ দিনের আগে কোর্টে আসছেন না।

এই সামগ্রিক বিষয়ের আদ্যোপান্ত পর্যালোচনার পর উচ্চ আদালত এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে কেন যে তাড়াহুড়ো করছেন সেটি বোধগম্য হচ্ছে না। তাদের রায়ের প্রতিবাদে দেশের আলেম সমাজ যদি রাস্তায় নামেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি জেল জুলুমসহ পুলিশি এ্যাকশন হয় তাহলে হয়তো সরকারেরও পতন ঘটবে না, আর বিচারপতিরাও নিজ নিজ আসনে বহাল থাকবেন। কিন্তু উচ্চ আদালত নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যদি প্রতিকূল আলাপ-আলোচনা শুরু হয় সেটি উচ্চ আদালতের কাছেও খুব সুখকর হবে বলে আমার মনে হয় না।

॥ তিন ॥

প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হক, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ প্রমুখ বলছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণার সাথে সাথেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়েছে। এজন্য আলাদা করে কোন ঘোষণার প্রয়োজন নেই। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ ছাপিয়ে সেটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ রায়ের ঐ সব অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংবিধানের অংশ হয়ে গেছে। যেহেতু এটি সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ অর্থাৎ সর্বোচ্চ আদালতের রায়, তাই এ ব্যাপারে কার আর কি বলার আছে? তবে তারপরও কিন্তু কথা থেকে যায়। কারণ আপীল বিভাগের রায়ের একটি অংশে বলা হয়েছে–

"The next is Proclamations (Amendment) Order 1977, i.e proclamation order No. I of 1977 dated April 23, 1977. By this order, as described in details later on, BISMILLAH-IR-RAHMANAR-RAHIM was inserted above the preamble of the Constitution and the second and fourth paragraphs of the preamble as well as Articles 6, 8, 9, 10, 12, 25, 38 and 141 of the Constitution were drastically changed and further paragraph 3A was inserted in the fourth schedule of the constitution.

The High Court Division found that, by it-

a) The Second and Third Proclamations were changed.

b) Basic features of the Constitution were changed.

www.pathagar.com

আপীল বিভাগের উপরোক্ত রায়ের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, মূল সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম উৎকীর্ণ করে এবং মূল সংবিধানের ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ এবং ১৪১ এর আমূল সংশোধন করে সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঃ মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি? এ ব্যাপারে হাইকোর্টের রায়ের সংক্ষিপ্তসারে তৎকালীন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বর্তমানের প্রধান বিচারপতি যা বলেছেন তার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ- The Proclamations etc., destroyed the basic character of the Constitution, such as, change of the secular character, negation of Rule of law, ouster of the jurisdiction of Court. তাহলে এই রায় মোতাবেক সংবিধানের মৌলিক চরিত্র হলো ঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ
৩. আইনের শাসন
৪. আদালতের এখতিয়ার রহিতকরণ

প্রশ্ন হলো, এই চারটি কি আমাদের সংবিধানের মৌলিক চরিত্র? এই রায়ের সংক্ষিপ্ত সারের ১৬ নম্বর প্যারার এক স্থানে পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত ফরমান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "Those Proclamations etc,. destroyed its basic features" তাহলে সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? সংক্ষিপ্তসারের ৩ নম্বর প্যারায় বলা হয়েছে যে, আইন সভা অর্থাৎ জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ বাংলাদেশ নামক এই প্রজাতন্ত্রের ৩টি স্তম্ভ। আবার প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্র বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্যসমূহ কি? এই প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি বারবার এই প্রশ্ন উত্থাপন করছি। কারণ সংক্ষিপ্তসারের ১৬ নাম্বার প্যারায় বলা হয়েছে, "The Parliament may enact any law but subject to the Constitution" অর্থাৎ সংবিধান সাপেক্ষে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, সংবিধানের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পার্লামেন্ট পাস করতে পারবে না। তাহলে মূলনীতিগুলো কি? সেটি মূল সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই ভাগের শিরোনাম, "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।" আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

॥ চার ॥

রাষ্ট্রের বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচারক তথা আইনবেত্তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে গত ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার 'ইনকিলাবের'

www.pathagar.com

এই কলামে আমি এই ধারাবাহিক রচনার অষ্টম কিস্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আজ একটি কথা বলতে চাই। ৭২ সালের সংবিধানে (যেটিকে আদি সংবিধান বা মূল সংবিধান বলা হচ্ছে) যে চারটি মূলনীতি বিধৃত করা হয়েছে সেগুলো হলো–

১. গণতন্ত্র
২. সমাজতন্ত্র
৩. ধর্মনিরপেক্ষতা
৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদ

হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের চারটি মূলনীতি যদি অমোঘ, অলঙ্ঘনীয় এবং অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে এগুলো কি আগামীতে বর্তমান পার্লামেন্ট সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে? কারণ পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে সমাজতন্ত্রও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরে এসেছে। তাহলে আমরা কি এখন সেই ৭২ থেকে ৭৫-এর মতো ঢালাও জাতীয়করণে ফিরে যাবো? না গেলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে কিভাবে? হাইকোর্টের রায়ের সংক্ষিপ্তসারে রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্রের মধ্যে সমাজতন্ত্রকে বাদ দেয়া হয়েছে কেন? সেটি করতে গিয়ে কি ৭২ সালের সংবিধানের একটি স্তম্ভকে বাদ দেয়া হয়নি?

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের প্রবক্তা এবং সমর্থকরা বলছেন যে, তারা তো সংবিধান সংশোধন করেননি; বরং পঞ্চম সংশোধনী নামক যে অবৈধ সংশোধনীটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেটি বাতিল করেছেন মাত্র। তাহলে 'প্রয়োজনতত্ত্ব' বা Doctrine of necessity অনুসরণ করে পঞ্চম সংশোধনীর কিছু অংশ রাখা হয়েছে, আর কিছু অংশ বাদ দেয়া হয়েছে কেন? এই যে Pick and choose নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সেই ক্ষমতা সংবিধান কি হাইকোর্ট বা আপীল বিভাগকে দিয়েছে? এটি করতে গিয়ে তারা কিন্তু জাতীয় সংসদের ক্ষমতা নিজেরাই Arrogate করেছেন বা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। সেই ক্ষমতা কি সংবিধান তাদেরকে দিয়েছে?

এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আমি এই ধারাবাহিক রচনা অব্যাহত রাখার ইচ্ছা পোষণ করি। তবে মাঝখানে জরুরী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটলে তখন হয়তো এই ধারাবাহিক রচনা থেকে সাময়িকভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে পারি। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, লন্ডন, সৌদি আরব এবং বাংলাদেশ থেকে যারা এই ধারাবাহিক রচনার ওপর টেলিফোনে, ই-মেইলে বা চিঠিতে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাদের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা। (দৈনিক ইনকিলাব : ১২-১০-২০১০)

www.pathagar.com

৩৩

স্পর্শকাতর রাজনৈতিক বিষয় এবং উচ্চ আদালত একদিকে বার সমিতি অন্যদিকে সরকার

গত ৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক 'ইনকিলাবের' প্রথম পৃষ্ঠায় স্বনামে লিখিত একটি রাজনৈতিক ভাষ্যে ইনকিলাব সম্পাদক জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন প্রশ্ন রেখেছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা কে করবে? আদালত না সরকার? ঐ ভাষ্যটির শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কি সরকার, না আদালত।' ভাষ্যের শুরুতে তিনি বলেছেন, "এ প্রশ্ন এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। গত কিছুদিনে দেশের উচ্চ আদালত এমন কিছু রায় দিয়েছেন, যার প্রেক্ষিতে এ আলোচনা উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। আদালত দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এমনকি শহীদ মিনার, শিশুপার্ক, পোশাক পর্যন্ত ঠিক করে দিচ্ছে। যে কাজগুলোর জন্য সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশই যথেষ্ট, সেখানেও আদালতকেই এগিয়ে আসতে হচ্ছে। ফলে এমন প্রতীয়মান হওয়ার অবকাশ দেখা দিয়েছে, যেন দেশে সরকারই নেই।" ভাষ্যের অন্যত্র তিনি বলেন, "প্রতীয়মান হচ্ছে, রাষ্ট্র যেন আদালতের নির্দেশে চলছে। সংবিধান, গণতন্ত্র, সরকার– এসবই কি আদালতের বিষয়? এ প্রশ্নও উঠেছে। সরকার তো আদালতের নির্দেশের জন্য বসে থাকতে পারে না। তার তো নিজস্ব এজেন্ডা আছে এবং প্রশাসন আছে।" দেশের পলিটিক্যাল ডিভাইড তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে- "দেশের মানুষ রাজনৈতিক দিক দিয়ে কঠিনভাবে বিভক্ত অর্থনৈতিক কারণে ততটা নয়, যতটা রাজনৈতিক কারণে। উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক অনেক রায়ে এই বিভক্তি আরো প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত রায় জাতিকে বিভক্তির প্ররোচনা দিতে পারে। জাতি রাজনৈতিক দিক দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এই বিভক্তি আরো স্পষ্ট করার জন্য রায়কে কেন্দ্র করে আন্দোলনে যাচ্ছে বিরোধী দল। বিরোধী দল এ ধরনের বিষয়গুলোকে ক্যাশ করতে পারে।"

জাতীয় সংসদ না আদালত, কে বড়? এমন একটি অনভিপ্রেত প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে ইনকিলাব সম্পাদক আলোচ্য রাজনৈতিক ভাষ্যে বলেন, "সংবিধান সংশোধন জাতীয় সংসদের এখতিয়ার। উচ্চ আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতার ভূমিকা পালন করতে পারেন, যদি কেউ ব্যাখ্যা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। সংসদ বড় না আদালত বড়– এ প্রশ্নও এখন উঠেছে। সংসদ জাতির সর্বোচ্চ ফোরাম, আর সর্বোচ্চ আদালত উচ্চ বিচারালয়। সংসদের দ্বারস্থ কারো হতে হয় না, সংসদ প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে এবং জনস্বার্থে আইন পাস করে। আর আইন বলবতের কাজটি হয় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা। এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য দেখা দিলে এবং তার প্রেক্ষিতে কেউ আদালতে গেলে আদালত তা নিশ্চিত করতে পারেন রায়ের মাধ্যমে। সাধারণত আদালত নিজ দায়িত্বে তা করেন না, কাউকে না কাউকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

www.pathagar.com

দেশের সাধারণ মানুষ এবং আমরাও নিশ্চিত, আদালত হয়ত প্রকৃতই স্বাধীনভাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারের হয়ত কিছুই করার নেই। তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, সরকারী দলের লোকেরা একের পর এক খালাস পেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তি ও কথার ম্যারপ্যাঁচের জন্য অন্যরা জেলে যাচ্ছে। সরকারী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের কাছে সরকারী কর্মকর্তারা দৈহিকসহ নানাভাবে পীড়িত হচ্ছে, পুলিশও মার খাচ্ছে। তারপরও অভিযুক্তরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এসবই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অতীতের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেছেন, "সপ্তম সংশোধনী সংক্রান্ত রায়ে ইতিহাসের কিছু প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। ৭০ বছর আগের লাহোর প্রস্তাব পর্যন্ত সামনে আনা হয়েছে। এমন কথাও রয়েছে, দেশ বিভাগ কেউ মানেনি। এমন কথা ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার এ কথা বলবৎ হয়ে গেলে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের আইনগত ভিত্তি তৈরি হবে কিনা, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পর এটা হতে পারে উদ্ভট সমন্বয়ের অপচেষ্টা মাত্র। বর্তমানের প্রয়োজনে ইতিহাসের প্রসঙ্গ টানা অস্বাভাবিক নয়। তবে ইতিহাস বিবেচিত হবে ইতিহাসের পরম্পরায়। বর্তমানের প্রেক্ষিতে ইতিহাস বদলে দেয়া যাবে না। কেননা, সেই ইতিহাসের পরম্পরার ফলশ্রুতিই আজকের বাস্তবতা।"

আজ সামরিক শাসন সম্পর্কে উচ্চ আদালত অনেক কথাই বলছেন। কিন্তু এই উচ্চ আদালতই অতীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিয়েছেন। এটাই হয়ে থাকে। ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, আজ যেটা সত্য কাল সেটা সত্য থাকে না। আবার কাল যেটা সত্য হয়, পরশু সেটা সত্য থাকে না। এ সম্পর্কে জনাব বাহাউদ্দীন বলেছেন, নিচের পংক্তিগুলোতে ইতিহাসের বাস্তবতার কারণেই একদিন দেশের প্রধান বিচারপতিকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হতে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আদালতই এই সামরিক আইন সংক্রান্ত ঘটনাপ্রবাহকে বৈধতা দান করেছিলেন। এই ইতিহাস নজির হিসেবে উল্লেখ করা যাবে, কিন্তু ইতিহাস বদলে দেয়া যাবে না। এই সত্য স্মরণে না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা থাকে। আইনগত প্রশ্ন, নাকি রাজনৈতিক বিষয়াবলী- কোনটা আদালতের রায়ে প্রাধান্য পাবে, এটাও অজানা কথা নয়। ইতিহাস সংশোধন, নাকি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিবেচনা, কোনটা আজকের যুগের এখতিয়ার, এটাও ভেবে দেখতে হবে। ৭০ বছর আগের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এটাও স্মরণ রাখা ভাল, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, সিকিম, মনিপুর ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যগুলো কিন্তু সে রকম কোনো যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতভুক্ত হয়নি, বরং আইনী কিছু মারপ্যাঁচই এক্ষেত্রে বেশি কাজ করছে। এটা ইতিহাসের পাঠকদের অজানা থাকার কথা নয়। আইনের ফাঁক-ফোকর এড়িয়ে চলতে হয় সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে।

www.pathagar.com

"আজ যা কিছু অবৈধ বলে রায় আসছে, অতীতে সেসবই বৈধ করা হয়েছিল আদালতের রায়ের দ্বারাই। একই আদালতের অতীতের রায় আর আজকের রায় পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়লে দেশবাসীর কিছু করার থাকে না।"

॥ দুই ॥

ইনকিলাব সম্পাদক জনাব বাহাউদ্দীনের লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিলাম সেটি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। তবে সেই উদ্ধৃতি না দিয়েও উপায় ছিল না। কারণ তিনি যে কথা বলেছেন তার ঠিক ১ মাস ৯ দিন পর সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেনও সেই একই কথা বললেন। তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, খন্দকার মাহবুব হোসেন অনেক দেরি করে ফেলেছেন। কারণ ইতোমধ্যে পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় বেরিয়েছে। সপ্তম সংশোধনী সম্পর্কেও হাইকোর্ট বিভাগের সংক্ষিপ্ত রায় বেরিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রায় এখনও বের হয়নি। তারও আগে স্বাধীনতার ঘোষক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিশু পার্ক নির্মাণ, ১৫ আগস্ট ও ৭ই নভেম্বর সরকারী ছুটি মঞ্জুর এবং বাতিল, বোরখা ও টুপি পরিধান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে হাইকোর্ট/আপিল বিভাগ রায় দিয়েছেন। কিন্তু এসব রায় সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্ট বার সমিতি বিশেষ করে তার বিএনপি সমর্থক অংশটি কিছুই বলেননি। খন্দকার মাহবুব হোসেনকে আমি দীর্ঘদিন থেকেই চিনি। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথমবর্ষের ছাত্র তখন খন্দকার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে আইন পড়ছেন। সব সময় তাকে একজন সাহসী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দেখেছি। এবারও সুপ্রিম কোর্ট বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে সাহসী, দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ বক্তব্য দিতে দেখেছি। গত রোজার সময় হোটেল রাজমনি ঈশা খাঁতে একটি ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। আমাকেও সেখানে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে, খন্দকার সাহেব যেসব বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে যদি সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়কে আদালতের বাইরে রাখার জন্য উচ্চ আদালতের প্রতি আহবান জানানো হতো তাহলে সেখানে এ নীতিনিষ্ঠতার স্বাক্ষর থাকতো। কিন্তু দেখা গেল যে সব কথা শেষে সমস্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো এসে মিলে গেল বেগম জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি উচ্ছেদের ইস্যুতে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটির চারটি চরণ–

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে,
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দু'খানি নয়নে।"

www.pathagar.com

বেগম জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি সম্পর্কে খন্দকার সাহেব হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও আদালতের বাইরে বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য সরকারের প্রতি 'বিনীত' আবেদন জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, শুধু ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বেগম জিয়াকে উচ্ছেদই কি একমাত্র স্পর্শকাতর বিষয়? আর কি কোনো স্পর্শকাতর বিষয় নেই? সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর ঈমান, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হওয়া– এগুলো কি স্পর্শকাতর বিষয় নয়? আদালতের রায়ের পরেও আদালতের বাইরে যদি রাজনৈতিক বিবেচনায় বেগম জিয়ার বাড়ি উচ্ছেদের বিষয়টির জন্য আবেদন জানানো হয় তাহলে এসব জ্বলন্ত ও স্পর্শকাতর রাজনৈতিক বিষয়সমূহকেও কি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন জানানো যেত না? এখন তো দেখা যাচ্ছে যে, বেগম জিয়ার বাড়ি ইস্যুতে আপসকামী বক্তব্য দিয়ে বার সমিতির সভাপতি তার দল বিএনপির দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করেননি। কারণ গত রোববার ইংরেজি দৈনিক 'নিউ এজের' খবর থেকে জানা গেল যে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর রায়, বেগম সারওয়ারী রহমান, জেনারেল মাহবুবুর রহমান এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বার সমিতি নেতার প্রস্তাবিত কোর্ট বহির্ভূত নিষ্পত্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে কোন অবস্থানকে মানুষ বিএনপির দলীয় অবস্থান হিসাবে গ্রহণ করবে? আদালত বহির্ভূত নিষ্পত্তি? নাকি রাজপথে নিষ্পত্তি? মানবিক কারণ দেখিয়ে আদালত বহির্ভূত নিষ্পত্তির যে আবেদন বার সমিতির প্রেসিডেন্ট রেখেছেন সেই আবেদন ইতোমধ্যেই পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছেন সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ। তারা বলেছেন, আদালতের রায় মেনে নিয়ে বেগম জিয়াকে ঐ বাড়ি ছাড়তে হবে। মানবিক কারণে আদালতের বাইরে এই বিষয়টি ফয়সালার কোনো সুযোগ নেই।

॥ তিন ॥

আসলে বিএনপির মূল সমস্যা কি? শুধু সমস্যা নয়, বিএনপি এখন মহাবিপদে রয়েছে। ইংরেজি ভাষায় বলতে হয় BNP is now in a big swoop দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকে দলটির সংগ্রামী চরিত্র আর আগের মত নেই। দল হিসাবে বিএনপি বড়, কিন্তু সংগঠন হিসাবে দুর্বল। সামগ্রিক নেতৃত্বে রয়েছে আদর্শ নিষ্ঠতা এবং নীতি নিষ্ঠতার অভাব। ধনবান ও বিত্তবান ব্যক্তিরা নয়, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও বেসামরিক জাঁদরেল আমলারাও নন, বরং একঝাঁক জানবাজ ও আদর্শপাগল কর্মীই একটি দলের প্রাণ। দলটি ৩ বার ক্ষমতায় ছিল। তাই একঝাঁক বসন্তের কোকিল এবং সুখের পায়রা এসে ভিড় করেছেন দলটিতে। চাক বাঁধার আগেই সেখানে শোনা যায় ভ্রমরগুঞ্জন। শতদল

www.pathagar.com

ফোটার আগেই দেখা যায় পরাগ রেণুর লোভ। তা না হলে তাদের আমলে ৫টি টেলিভিশন কেন্দ্র দেয়া হলেও একটিও এখন তাদের হাতে নেই। N আদ্যাক্ষর যুক্ত টিভি চ্যানেলটিও ইসলামী মূল্যবোধ এবং জাতীয়তাবাদীদের খবর প্রচারে বড়ই কৃপণ। হবে নাইবা কেন? দেশের এতগুলো জ্বলন্ত সমস্যা, অথচ কোনো ইস্যুতেই তাদের কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকা তো দূরের কথা, কোনো বলিষ্ঠ বক্তব্যও নেই। সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিষয় হলো পঞ্চম সংশোধনী। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে হাইকোর্ট বিভাগ যখন এই রায় বাতিল করেন তখনই তো এ ব্যাপারে বিএনপির একটি স্পষ্ট বক্তব্য থাকার কথা ছিল। বলা হচ্ছে যে, উচ্চ আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে বর্তমান সরকার তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়লগ ধার করে বলতে হয়, "তাহলে আছে দুইখান কথা।" হাইকোর্ট ডিভিশন ২০০৫ সালে যখন পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়টি ঘোষণা করে তখন ক্ষমতায় ছিল বেগম জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। তারপরও তারা একবছর দুই মাস ক্ষমতায় ছিলেন। এই ১৪ মাসেও তারা আপিল বিভাগে রায়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি কেন? যেখানে বেগম জিয়া ক্ষমতায়, সেখানে পঞ্চম সংশোধনীর রায়ে জেনারেল জিয়াকে 'ক্ষমতা দখলকারী' বা Usurper of power বলার সাহস দেখিয়েছে হাইকোর্ট বেঞ্চ। এই সাহসকে আপনি কি বলবেন? অবশ্যই এটিকে বলতে হবে Courage of conviction অর্থাৎ বিশ্বাসের সাহস। যে পঞ্চম সংশোধনী বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক আদর্শের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক, সেই পঞ্চম সংশোধনীর রায় সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি বিএনপি। তাহলে দেশের যে ৩৭ শতাংশ মানুষ ইসলামী মূল্যবোধ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সপক্ষে ভোট দিয়েছেন তাদের কাছে কি বার্তা দিল বিএনপি? কোন বিষয়টি বেশি স্পর্শকাতর? পঞ্চম সংশোধনী? নাকি বেগম জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি?

শেষ করার আগে একটি অপ্রিয় সত্য বলতে চাই। আদালতের বাইরে, রাজপথে না এসে Secretconclave-এ সংগোপন শলাপরামর্শ করে বিএনপি তার Mettle prove করতে পারবে না । আমি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক নই। নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সত্য কথা বলতে পছন্দ করি। সেই অবস্থান থেকে বলছি যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বর শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং শেখ ফজলুল হক মনিসহ তাদের সমগ্র শীর্ষ নেতৃত্বকে হারিয়েছিল আওয়ামী লীগ। এত অপূরণীয় ক্ষতির পরও আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে সেটি সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয়েছে এ কারণেই যে, তারা রাজপথ তাদের দখলে রেখেছিলেন। আওয়ামী লীগের অন্তত এই পদাঙ্কটি অনুসরণ করে বিএনপি যদি রাজপথ দখলে নিতে পারে তাহলে তারাও একদিন ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। (দৈনিক ইনকিলাব : ১৯-১০-২০১০)

www.pathagar.com

৩৪

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল : ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যাবর্তন অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনী ও রাষ্ট্রধর্ম বহাল

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনেরা,

পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল রায়ের ওপর এ পর্যন্ত আমি ১০টি কিস্তি লিখেছি। আজ ১১নং কিস্তি লিখছি। আজকেই এই কিস্তি শেষ করতে চাই। কারণ মাঝখানে দেশে এমন সব ঘটনা ঘটেযায় যেগুলো In Depth আলোচনার দাবি রাখে।

ইতোমধ্যে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের যে রায় দিয়েছেন সেই রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশগুলো অবিকৃত রেখে বর্তমান সংবিধানে সন্নিবেশ করা হবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের যে বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল তারাও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন সেই রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে নতুন করে সংবিধান ছাপা হবে। সে পর্যন্ত তাদের আর কোন কাজ নেই। সংবিধান ছাপা হওয়ার পর নতুন আকারে যে সংবিধান মানুষের হাতে পৌঁছাবে তখন সেই সংবিধান নিয়ে বসবেন বিশেষ সংসদীয় কমিটি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং কো-চেয়ারম্যান হলেন বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি। সুরঞ্জিত বাবু আরো বলেছেন, পুনর্মুদ্রিত সংবিধান প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের যেসব নির্দেশ দেবেন সেসব নির্দেশ মোতাবেক সংবিধান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। তখন যদি মনে করা হয় যে, সংবিধানে আরও সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে তখন তারা সেসব বিষয় বিবেচনা করবেন। এ ঘোষণার ফলে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলকে কেন্দ্র করে যেসব প্রশ্নের জন্ম হয়েছে এবং যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, সেসব প্রশ্ন এবং বিভ্রান্তি সম্পর্কে সরকারের অবস্থানটি স্পষ্ট হলো। বিরোধী দলসমূহের অবস্থান কি হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি অথবা তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল সম্পর্কে বিএনপিসহ বিরোধী দলসমূহের অস্বচ্ছ অবস্থানের কারণ একাধিক হতে পারে। প্রথম কারণটি এই হতে পারে যে, যেহেতু এটি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় তাই এই রায়ের সাথে একমত না হলেও অথবা সেই রায়টি তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তারা প্রকাশ্যে সেটি বলতে পারছেন না। কারণ, বললে যদি সেটি আদালত অবমাননার শামিল হয় তাহলে তারা আইনগত জটিলতা এবং বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হবেন। তাই তারা এব্যাপারে পূর্ণ

www.pathagar.com

নীরবতা পালন করছেন। সম্ভবত তাদের কৌশলটি এই যে, বোবার কোন শত্রু নেই। আর একটি কারণ হতে পারে এই যে, ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বেগম খালেদা জিয়ার উচ্ছেদের আশংকা এবং ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর প্যারোল বাতিল হওয়ার ফলে বেগম জিয়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে একটি বড় সমস্যায় পড়েছেন। কারণ আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায়ে যদি কোকোর প্যারোল বাতিল হয়ে যায় তাহলে কোকোকে বিদেশে পলাতক অবস্থায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। এর বিকল্প হলো দেশে ফিরে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার হবেন। ঐদিকে তারেক রহমান জামিনে আছেন। তার জামিন বাতিল হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার বলেই মনে হয়। যদি তার জামিন বাতিল হয়ে যায় তাহলে ছোট ভাই কোকোর মতো তাকেও বিদেশে পলাতক জীবনযাপন করতে হবে। অন্যথায় দেশে ফিরে আসতে হবে। দেশে ফিরে এলে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার। তাই রাজনীতি এখন হয়েছে বেগম জিয়ার জন্য শাখের করাত। এধারে গেলেও কাটছে, ওধারে গেলেও কাটছে। এমন একটি ত্রিশঙ্ক অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বনকে সবচেয়ে ভাল কৌশল বলে মনে করছে বিএনপি।

॥ দুই ॥

তবে কতদিন তারা এই নীরবতা অবলম্বন করবেন? বিএনপির যারা সমর্থক তারা সকলেই মোটামুটি দক্ষিণপন্থী। পর্দা সংক্রান্ত একটি রায়ে হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চ ঘোষণা করেছেন যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের পর বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়া সর্বশেষ সরকারী সিদ্ধান্তের পর সুপ্রিমকোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহের শেষ দিকে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের ৪/৫ তারিখের মধ্যে পুনর্মুদ্রণের কাজ শেষ হয়ে নতুন আকারে সংবিধান জনগণের কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর বিএনপি কি করবে? তারা কি ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী রাজনীতি বিলোপকে মেনে নিয়ে রাজনীতি করবেন? এই প্রশ্নটি এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দেশে আলোচনা এবং সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এ মর্মে সমালোচনা হয়েছিল যে, সংবিধান সংশোধন, নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন অথবা কোনো অনুচ্ছেদ বিলোপ করার একমাত্র ক্ষমতা এবং এখতিয়ার রয়েছে জাতীয় সংসদের। আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সেই ক্ষমতা নেই। উচ্চ আদালত সংবিধানের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু সেটি সংশোধন করতে পারে না। সরকার তথা সরকার পক্ষের উকিলরা একটি মাত্র কথার মাধ্যমে বিরোধীদলীয় সমালোচনার জবাব দিয়েছে। তারা বলছেন যে, সংবিধানের কোনো সংশোধন করেননি সুপ্রিম কোর্ট। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

www.pathagar.com

রহমান ৭২-এর সংবিধানের অনেক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করেছিলেন। এসব সংশোধনী ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ এবং উচ্চ আদালত সেগুলোকে সংবিধান থেকে বাদ দিয়েছে। এসব হলো আইনী ভাষা। ঐসব যুক্তিতর্কের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, থাকার কথাও নয়। তবে পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর নতুন করে সংবিধান যেভাবে ছাপা হচ্ছে তার ফলে সংবিধানের চেহারা দাঁড়াচ্ছে মোটামুটি নিম্নরূপ–

১. **ফিরে এসেছে ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি– পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি অবৈধ ঘোষিত হলো। সে জায়গায় এখন ফিরে এলো ৭২-এর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা।

২. **ফিরে এসেছে সমাজতন্ত্র ঃ** অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতি এবং তৎসহ এই নীতি হইতে উদ্ভুত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রে পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে- পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি বাতিল হয়ে গেছে। সেখানে ফিরে এসেছে সমাজতন্ত্র।

৩. **ফিরে এলো বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ঃ** নৃতাত্ত্বিকভাবে আমরা বাঙালী হলেও জাতি হিসেবে আমরা বাংলাদেশী- পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি বাতিল হয়ে গেল। সে জায়গায় ফিরে এলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

৪. **মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জোরদার বাতিল ঃ** ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জোরদার করা হবে- ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বিধৃত পঞ্চম সংশোধনীর এই অংশটি বাতিল হলো।

৫. **ইসলামী রাজনীতি ঃ** ৭২-এর সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অর্থাৎ ইসলামী রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। পঞ্চম সংশোধনীতে এই দু'টি ধারা বিলোপ করা হয়। ফলে ইসলামী রাজনীতি করার অধিকার ফেরত পায়। সুপ্রিমকোর্টের রায়ের মাধ্যমে পঞ্চম সংশোধনী বিলোপ করার ফলে ৭২-এর সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদ ফিরে এসেছে। ফলে ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যত অনিশ্চত হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে না। আইনমন্ত্রী বলছেন ভিন্ন কথা।

৬. **গণভোটের ঐ ব্যবস্থা রহিত ঃ** পঞ্চম সংশোধনীতে ৮, ৪৮ এবং ৫৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়নি। এই তিনটি অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনের পরও গণভোটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর ৭২ এর সংবিধান ফিরে আসায় গণভোটের ঐ ব্যবস্থা রহিত হয়ে গেল। ফলে ৮, ৪৮ এবং ৫৬সহ সংবিধানের যে কোনো অনুচ্ছেদের সংশোধনের জন্য এখন থেকে শুধু জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হলেই চলবে।

www.pathagar.com

৭. **অপরিবর্তনীয় ৪টি মৌলিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো** ৭২-এর সংবিধান বা পঞ্চম সংশোধনী কোনোটাতেই সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (Basic structure) বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য (Basic feature) বলে কিছু চিহ্নিত ছিল না। কিন্তু পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রকে মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, এসব মৌলিক কাঠামো কোনোদিন সংশোধন করা যাবে না। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৮ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ফিরে এসেছে। ৮ নম্বর অনুচ্ছেদের ১নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।" ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"

Terminological jugglery বা পরিভাষার মারপ্যাঁচের আশ্রয় নিয়ে হয়তো বলা যাবে যে, উচ্চ আদালত নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করেনি বা কোনো আইন সংশোধনও করেনি। কিন্তু কঠোর বাস্তব হলো এই যে, ঐ রায়ের ফলে সংবিধানের খোল-নলিচাই পাল্টে গেছে। তারপরও যদি কেউ বলেন যে, সংবিধান সংশোধিত হয়নি তাহলে আর বলার কিছুই থাকে না।

॥ তিন ॥

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর রাজনৈতিক অঙ্গনকে যে বিষয়টি অশান্ত ও আলোড়িত করেছে সেটি হলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হচ্ছে কিনা? এ ব্যাপারে সরকারী অবস্থান সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন যে, সরকার ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করবে না। সংবিধান পুনর্মুদ্রিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন দেখবে যে কোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা? যদি সাংঘর্ষিক হয় তবে নির্বাচন কমিশন সেই দলটির নিবন্ধন বাতিল করে দেবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক ৭২ সালের সংবিধানের দু'টি অনুচ্ছেদ পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। একটি হলো ১২নং অনুচ্ছেদ। আরেকটি হলো ৩৮নং অনুচ্ছেদ। ৩৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।" ১৯৭২ সালের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদবলে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়েছিল। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ঐসব

www.pathagar.com

দল পুনরুজ্জীবিত হয় এবং আরো কতগুলো নতুন ইসলামী দল গঠিত হয়। এগুলো হলো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন (পরে ইসলামী আন্দোলন), খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম প্রভৃতি দল। এখন সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ১২ অনুচ্ছেদও পুনঃস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু এই দু'টি অনুচ্ছেদবলে ৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত দেশে মুসলিম এবং ইসলাম নামযুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করা হয় তাই ঐ দু'টি অনুচ্ছেদ ফিরে আসার ফলে বা উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী রাজনৈতিক সদস্যসমূহের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হবে না।

॥ চার ॥

বলা হচ্ছে যে, সুপ্রিমকোর্টের রায় সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' থেকে যাবে। এগুলো বিলুপ্ত হবে না। আইনগতভাবে বিসমিল্লাহ বিলুপ্ত হওয়ার কথা নয়। কারণ এটি প্রস্তাবনার ওপরে স্থাপিত হয়েছে। এটি নাকি সংবিধানের অংশ নয়।

৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহ নেই। ৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনা যদি প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিসমিল্লাহ প্রতিস্থাপিত হওয়ার কথা নয়। বরং বিলুপ্ত হওয়ার কথা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সেন্টিমেন্ট অর্থাৎ বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতির দিকে তাকিয়ে হাইকোর্টের রায়ের এই অংশটি সরকার রেখে দিয়েছে। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে হাইকোর্টের বেঞ্চটি যে রায় দিয়েছিলেন তার ভাষা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। সেদিন যিনি ঐ রায়টির প্রধান রচয়িতা ছিলেন তিনি আজ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। সেখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সরকার গেজেট প্রকাশ করুক আর না করুক, উচ্চ আদালতের রায় ইতোমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে। ফলে তার রায়ে বিসমিল্লাহ রয়ে গেছে না উঠে গেছে, সে ব্যাপারে তিনি এখন পর্যন্ত পূর্ণ নীরবতা পালন করছেন।

॥ পাঁচ ॥

উচ্চ আদালতের রায় আরেকটি নতুন প্যারাডক্স বা স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। এই রায়ের ফলে ৭২ সালের সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ ফিরে এসেছে। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান বিলোপ করা হইবে।" এই অনুচ্ছেদটি এত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন যে এই অনুচ্ছেদটি নতুন সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হওয়ার পর সেই সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ দেখা যায় না। কিন্তু সরকারী মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অক্ষুণ্ন থাকবে। এই বিষয়টি সম্পর্কে হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ এবং পরবর্তীতে আপিল বিভাগ কিছুই বলেননি।

www.pathagar.com

সবশেষে সংশোধনের কতিপয় অনুচ্ছেদকে condone করা বা মার্জনা করার প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণার মূল সুর হলো একটি। আর সেটি হলো এই যে সংবিধানে মার্শাল ল'র কোনো স্থান নেই। সামরিক শাসনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই মোশতাক, জেনারেল জিয়া ও জাস্টিস সায়েম হলেন ক্ষমতার অবৈধ দখলদার। সেই হিসাবে সামরিক শাসক বা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তারা অবৈধ, তাদের শাসনকাল বেআইনী এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ বেআইনি। তেমনি জেনারেল জিয়ার আমলে গঠিত জাতীয় সংসদও বেআইনি। সেই 'বেআইনি' জাতীয় সংসদ পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করায় সেই অনুমোদনের কাজটিও বেআইনি। এই যুক্তিতে পঞ্চম সংশোধনী বেআইনী ঘোষণা করে সেটিকে বাতিল করা হয়েছে। হাইকোর্ট তথা আপিল বিভাগের রায়ের মূল সুর হলো, বৈধভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টই কেবল সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রাখে। ঐ রায় অনুযায়ী ৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক ৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে তাদের সব কাজই বৈধ বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ অর্থাৎ ৭৩ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিলোপ করে একদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল বাকশাল পদ্ধতি করে। চতুর্থ সংশোধনী অর্থাৎ একদলীয় বাকশাল কায়েম করা হয়েছে ৭২-এর সংবিধান মোতাবেক গঠিত জাতীয় সংসদের মাধ্যমে। হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিচারে আমরা বলতে পারি যে, চতুর্থ সংশোধনী তথা বাকশাল গঠন সম্পূর্ণ বৈধ পদ্ধতিতে করা হয়েছে। অথচ পঞ্চম সংশোধনীতে সামরিক শাসনের মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনী তথা বাকশাল পদ্ধতি বাতিল করা হয়। হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগের রায়ে পঞ্চম সংশোধনী চরমভাবে অবৈধ। সেই অবৈধ সংশোধনীর মাধ্যমে চতুর্থ সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে। তাহলে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায়ে বাকশাল তথা চতুর্থ সংশোধনীকে অবিকৃতভাবে মূল সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে না কেন? এটি কি উচ্চ আদালতের রায়ে নিহিত চরম প্যারাডোক্স বা স্ববিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ নয়?

এর রেডিমেড উত্তর হলো এই যে, হাইকোর্ট বিভাগ তথা আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কৃত কতকগুলো কাজকে condone করেছেন বা মার্জনা করেছেন। প্রশ্ন হলো, সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ সংশোধনের মতো গুরুতর কাজকে মার্জনা করা, বহাল রাখা বা বাতিলের ক্ষমতা তো উচ্চ আদালতকে সংবিধান দেয়নি। তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ বা আপিল বিভাগ Pick and choose- এর মাধ্যমে সংসদের যে ক্ষমতা নিজেদের কাছে Arrogate করলেন সেই ক্ষমতা তারা পেলেন কোত্থেকে? এর মাধ্যমে কি এটি প্রতীয়মান হয় না যে, উচ্চ আদালত শুধু একটি অবৈধ সংশোধনীই বাতিল করেনি, বরং বাকশাল বাতিলকে মার্জনা করার মাধ্যমে সংবিধানকে সংশোধনও করেছেন। হয়তো একদিন ইতিহাস বলবে যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায় 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছে। (দৈনিক ইনকিলাব : ২৬-১০-২০১০)

www.pathagar.com

৩৫

কে সঠিক? চিফ জাস্টিস সাহাবুদ্দীন ও ফজলুল করিম? নাকি চিফ জাস্টিস খায়রুল হক?

জনাব রুহুল কুদ্দুস বাবু এবং জনাব খসরুজ্জামানকে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ করানোর পর এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এমন একটি মন্তব্য করেছেন যেটি শিক্ষিত এবং সচেতন মহলের তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সকলেই জানেন যে, জনাব খায়রুল হকের অব্যবহিত পূর্বে প্রধান বিচারপতি ছিলেন জনাব ফজলুল করিম। গত ১৭ এপ্রিল হাইকোর্ট বিভাগে ১৭ জনকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই ১৭ জনের মধ্যে ২ জনের অর্থাৎ জনাব রুহুল কুদ্দুস বাবু এবং জনাব খসরুজ্জামানের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মেরে ভাংচুর করার অভিযোগ রয়েছে। তাদের আপত্তি ছিল এই যে, ওই ধরনের ব্যক্তিবর্গকে দেশের উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া ঠিক হয়নি। প্রধান বিচারপতি যেন তাই ঐ দুই ব্যক্তিকে শপথ করানো থেকে বিরত থাকেন। সুপ্রীম কোর্ট বারের আপত্তির কারণেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, প্রধান বিচারপতি দুই ব্যক্তি অর্থাৎ জনাব রুহুল কুদ্দুস বাবু এবং জনাব খসরুজ্জামানকে শপথ করানো থেকে বিরত থাকেন। অবশিষ্ট ১৫ জনকে তিনি শপথ পড়ান। তাদের শপথ না করিয়ে প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম সংবিধান লংঘন করেছেন বলে এটর্নী জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, দেশের প্রেসিডেন্ট যেখানে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন সেখানে তাদের শপথ করানোর জন্য প্রধান বিচারপতির সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনমন্ত্রী এবং দেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা অর্থাৎ এটর্নী জেনারেলের এমন কঠোর মন্তব্যের পরও ঐ দুই আইনজীবীকে শপথ না পড়ানোর ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম অটল থাকেন। তখন এটর্নী জেনারেল বলেন, ঐ দুই আইনজীবীকে শপথ না করালেও তাদের নিয়োগ বাতিল হয়নি। কারণ তাদের নিয়োগ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গেজেটে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিয়োগ বাতিল করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিয়োগ বহাল থাকবে। তাদের শপথ করানোর জন্য পরবর্তী প্রধান বিচারপতিকে বলা হবে।

এটি হলো সরকারী ভাষ্য। এই মতের যারা বিরোধিতা করেছেন তারা বলেছেন, যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডযোগ্য অপরাধের অভিযোগ থাকবে তাদের উচ্চ আদালতের মত মর্যাদাশীল প্রতিষ্ঠানের বিচারকের আসনে বসানো ঠিক নয়। এদের শপথ পাঠ না

www.pathagar.com

করিয়ে প্রধান বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম সঠিক কাজ করেছেন। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে শপথ না করানোর ঘটনা নতুন নয়। এর আগে জনাব সাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করানো থেকে বিরত থেকেছেন। প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমেদ তাদেরকে শপথ না পড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রেসিডেন্টের গোচরীভূত করেন। প্রেসিডেন্ট তখন তার নিয়োগ বাতিল করেন। বার সমিতির প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন যে, জনাব বাবু ও খসরুজ্জামানকে শপথ না পড়িয়ে বিষয়টি প্রেসিডেন্টের নজরে আনার জন্য তারা প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হককে বলেছিলেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেটি না করে তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন। সেদিন কিন্তু সংবিধান লংঘন করার অভিযোগ ওঠেনি। এই মহলটি বলেন যে, বাংলাদেশের দুজন প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ জাস্টিস সাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং জাস্টিস ফজলুল করিম যে কাজটি করেছিলেন সেই কাজটিই করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল বর্তমান প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হককে।

কোন গ্রাউণ্ডে জাস্টিস সাহাবুদ্দীন এবং জাস্টিস ফজলুল করিম বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শপথ করাননি সেটি জানা যায়নি। কারণ বাংলাদেশে বিগত ৩৯ বছরের ইতিহাসে হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগের কোন প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতি সংবাদ সম্মেলন করে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেননি। জনাব খায়রুল হক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার পর অন্তত দু'বার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই দুই আইনজীবীকে বিচারক হিসেবে শপথ গ্রহণ করার বিষয়ে তার সামনে দু'টি পথ খোলা ছিল। একটি হলো তার Popularity ধরে রাখা। আরেকটি হলো তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা। অনেকে তাকে বলেছেন যে, তিনি যদি তাদের শপথ করান তাহলে তার Popularity Waned হবে। অর্থাৎ তার জনপ্রিয়তা কমে যাবে। প্রিয় পাঠক, টেলিভিশনে দেখলাম, প্রধান বিচারপতি এই দু'টি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি হলো Popularity অর্থাৎ জনপ্রিয়তা। আরেকটি হলো Waned হওয়া অর্থাৎ কমে যাওয়া। তিনি যেহেতু ইংরেজি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাই আমি ঐ ইংরেজি শব্দ দুটোই রেখে দিলাম। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ঐ দু'টি পথের মধ্যে তিনি সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার পথ বেছে নিয়েছেন।

॥ দুই ॥

তাদের শপথ করানো হবে, এই খবরটি যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবীরা সুস্পষ্টভাবে দু'ট ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি হলো-বর্তমান বার সমিতির নেতৃত্বাধীন অংশ, যারা বিএনপির প্রতি অনুগত। আরেকটি হলো, বিএনপির

www.pathagar.com

অংশের বিরোধী গ্রুপ, যারা আওয়ামী লীগের প্রতি অনুগত। শুধু সুপ্রীম কোর্ট বা আদালত প্রাঙ্গণ নয়, বাংলাদেশের ১৬ কোটি লোকের এই বিশাল সমাজটি সুতীব্রভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। বার সমিতির সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন তার সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের পদত্যাগ দাবি করেছেন। ঐ দু'জনকে শপথ গ্রহণ করানোর প্রতিবাদে সুপ্রীমকোর্ট ভবনে অবস্থিত বার সমিতি অফিসে কালো পতাকা উত্তোলন করেছেন। এছাড়াও গত রোববার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, জনাব খসরুজ্জামান এবং জনাব রুহুল কুদ্দুস বাবু যখন যে বেঞ্চে বসবেন আইনজীবীরা তখন সেই বেঞ্চ অর্থাৎ সেই এজলাস বয়কট করবেন। এছাড়া এই দুই বিচারপতিকে কোনো বিচারিক কাজ না দেয়ার জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এই হলো সংক্ষেপে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের সর্বশেষ অবস্থা। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতও রাজনৈতিক লাইনে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই বিভাজনে শুধু আইনজীবীরাই নন, মাননীয় বিচারপতিরাও রয়েছেন। এই বিভক্তি এবারই প্রথম ঘটলো না। রাজনৈতিক লাইনে হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগকে বিভক্ত করার জন্য দায়ী হলো দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক লাইনে এই বিভক্তি শুরু হয়েছে অনেক আগেই এবং সেটি শুরু হয়েছে ১৯৯১ সালে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি দু'বার ক্ষমতায় ছিল। অনুরূপভাবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগও এখন দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। প্রিয় পাঠক, মাঝখানে মাত্র কয়েক মাসের জন্য বেগম জিয়া আরেকবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। নির্বাচন হয়েছিল শুধু সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্য একটি পার্লামেন্ট গঠনের জন্য। একটি নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। সরকার গঠন করে বিএনপি এবং পার্লামেন্টে কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস হওয়ার পর বেগম জিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দেন। যাই হোক, প্রতিটি সরকারের আমলেই শুরু হয় দলীয়করণ। প্রশাসনের সর্বত্র চালু হয় দলীয়করণ। বিএনপির আমলেও হয়েছে, আবার আওয়ামী লীগ আমলেও হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে হাইকোর্টে ৩৭ জন বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাইকোর্টে বর্তমানে মোট বিচারপতির সংখ্যা ৯৪ জন। সুপ্রীম কোর্টে কাজের প্রচণ্ড চাপ। সেই চাপ লাঘবের জন্য গত বছরেরও ৯ জুলাই আপিল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ১১-তে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারকদের সংখ্যা ৫ জন। এখনও ৬ জন বিচারপতির পদ খালি রয়েছে। এই ৬টি পদে বিগত ৪/৫ মাস হলো কোন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। যে ৫ জন বিচারপতি

www.pathagar.com

রয়েছেন তাদের মধ্যে আবার ২ জন বিচারপতি প্রায় ২ মাস হলো সুপ্রীম কোর্টে আসছেন না। কেন আসছেন না সেটি তারা প্রকাশ্যে বলেননি। তবে পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছে, তাদের ডিঙ্গিয়ে জনাব খায়রুল হককে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছে। এই জন্য ক্ষোভে ও দুঃখে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের এই সিনিয়র মোস্ট আইনজীবী অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরা হলেন-জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি আব্দুল মতিন এবং দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি শাহ মুহাম্মদ আবু নাইম। বলা হচ্ছে যে, জনাব আব্দুল মতিন আর ফিরবেন না। তিনি ছুটিতে আছেন এবং সেখান থেকেই তিনি রিটায়ারমেন্টে চলে যাবেন। পক্ষান্তরে জনাব আবু নাইমের অবসর গ্রহণের সময় হলো আগামী বছরের ৩০ নভেম্বর। তার আগেই বর্তমান প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হক মে মাসের মাঝামাঝি অবসরে যাবেন। তখন যদি জনাব নাইমকে প্রধান বিচারপতি করা হয় তাহলে তিনি চাকরিতে ফিরে আসবেন। অন্যথায় তিনি কি করবেন সেটা তিনিই জানেন।

॥তিন॥

আমার মনে হচ্ছে, উচ্চ আদালতের ক্রাইসিস শেষ হয়নি বরং শুরু হয়েছে। একটু আগে আমি বলেছি যে, আপিল বিভাগে ৬ জন বিচারপতির পদ খালি রয়েছে। আর বাস্তবে ৮ জন বিচারপতির পদ খালি রয়েছে। প্রধান বিচারপতিসহ মাত্র ৩ জন বিচারপতি দিয়ে আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ গঠিত হচ্ছে। এটি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। জনাব আব্দুল মতিন এবং শাহ মুহাম্মদ আবু নাইম ১ অক্টোবর থেকে অফিস করছেন না। কবে করবেন তার ঠিক নেই। তাই মাত্র ৩ জন বিচারপতি দিয়ে আপিল বিভাগের কাজ চলছে। কিন্তু ৩ জন বিচারপতি দিয়ে কি আর ১৬ কোটি লোকের দেশে সুপ্রীম কোর্টের কাজ চলতে পারে? তাহলে কেন ক্লিয়ার ভ্যাকান্সি থাকা সত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে পদগুলো পূরণ করা হচ্ছে না? হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণকে পদোন্নতি দিয়ে সুপ্রীম কোর্টে আনা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই রেওয়াজ চলে আসছে। সুপ্রীমকোর্ট বার সমিতি দাবি করেছে, আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার সময় যেন কোনো অবস্থাতেই জ্যেষ্ঠতা লংঘন করা না হয়। অর্থাৎ সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে যেন তার চেয়ে জুনিয়রকে আপিল বিভাগে এলিভেট করা না হয়। হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম ৬ জন বিচারপতি হলেন-

১ আব্দুল ওয়াহাব মিয়া
২. নাজমুন আরা সুলতানা
৩. সৈয়দ মাহমুদ হোসেন
৪. মোঃ ঈমান আলী

www.pathagar.com

৫. শেখ রেজওয়ানুল আলী এবং
৬. আনোয়ারুল হক।

কিন্তু পত্র-পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে, হাইকোর্টের নিম্নোক্ত বিচারপতিগণকে নাকি আপিল বিভাগে এলিভেট করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। এরা হলেন–

১. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
২. শামছুল হুদা
৩. শামছুদ্দিন চৌধুরী মানিক
৪. হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রমুখ।

এই চার ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম ২০ জনের মধ্যেও এদের নাম নেই। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যে ৬ জন প্রথম আছেন, যাদের নাম একটু আগে উল্লেখ করেছি, তাদের সকলকে ডিঙ্গিয়ে যদি অপেক্ষাকৃত অনেক জুনিয়রকে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে সেটি হবে আগামী দিনের রাজনীতির একটি বড় ইস্যু। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, আপিল বিভাগের এই ৬ জনকে প্রমোশন দেবেন কে? এ ব্যাপারে এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যেমন চূড়ান্ত, তেমনি আপিল বিভাগের জজদের নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা একক ও চূড়ান্ত।

ঠিক এখানেই সবচেয়ে বড় ব্লান্ডারটি হতে পারে। সর্বশেষ অবস্থা মোতাবেক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে আপিল বিভাগ যেদিন রায় ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকেই রায়টি কার্যকর হয়েছে। বর্তমান প্রধান বিচারপতি ইতিপূর্বে সেই কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, রায়টি গেজেট আকারে প্রকাশিত হোক বা না হোক, এটি মুদ্রণ করে আদি সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা হোক আর না হোক, আপিল বিভাগের রায় অনুযায়ী সংবিধান ইতোমধ্যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করেছে। তারই রায় অনুযায়ী এখন উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের বিধানটি নিম্নরূপ : সংবিধানে ৯৫(ক)-তে বলা হয়েছে-

"প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ দান করিবেন।" এটি এখন সংবিধানের সর্বশেষ নির্দেশ। পঞ্চম সংশোধনীর পর সংবিধানের ৯৫(ক) অনুচ্ছেদটি ছিল নিম্নরূপ :

৯৫(১) এ বলা হয়েছে- "প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।"

www.pathagar.com

পঞ্চম সংশোধনী প্রথমে বাতিল করেছিলেন হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বেঞ্চে ছিলেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এবিএম ফজলে কবীর। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক রায়টি লিখেছিলেন জনাব খায়রুল হক। ঐ রায়ে পঞ্চম সংশোধনীর যেসব বিধিকে Condone বা মার্জনা করা হয়েছিল তার মধ্যে ৯৫(১) ধারাও ছিল, যেখানে প্রধান বিচারপতি এবং অন্য সমস্ত বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেবেন। কিন্তু আপিল বিভাগ জনাব খায়রুল হক এবং জনাব ফজলে কবীর কর্তৃক মার্জনা করা এই অংশটিকে বৈধতা দান করেননি। বরং তারা মার্জনার এই অংশটি বাতিল করেছেন। ফলে আদি সংবিধানের অর্থাৎ ৭২ সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অবিকল ফিরে এসেছে। এখন প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ জনাব খায়রুল হকের পরামর্শ বা রিকমেন্ডেশনের বাইরে প্রেসিডেন্ট কোনো বিচারপতি নিয়োগ করতে পারবেন না। সুতরাং এখন যদি জ্যেষ্ঠতা লংঘন করা হয় তাহলে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে প্রধান বিচারপতিকে।

শেষ করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতিকে শপথ করাননি। সেই কাজটি সংবিধান লংঘন বলে গণ্য হয়নি। এই তো ক'দিন আগেও প্রধান বিচারপতি ফজলুল করিম আলোচ্য দুই বিচারপতিকে শপথ করাননি। তিনি সংবিধান লংঘন করেছেন বলে আইনমন্ত্রী এবং এটর্নী জেনারেল মনে করলেও অন্যরা সেটা মনে করেননি। এখন বর্তমান বিচারপতি মনে করছেন যে, ঐ দু'জনকে শপথ না করালে সংবিধান লংঘিত হবে। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে অথবা সংবিধানের দৃষ্টিতে কার অবস্থানটি সঠিক? প্রাক্তন চিফ জাস্টিস সাহাবুদ্দীন ও চিফ জাস্টিস ফজলুল করিমের? নাকি বর্তমান চিফ জাস্টিস এবিএম খায়রুল হকের?

এই চার ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রথম ২০ জনের মধ্যেও এদের নাম নেই। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যে ৬ জন প্রথম আছেন, যাদের নাম একটু আগে উল্লেখ করেছি, তাদের সকলকে ডিঙ্গিয়ে যদি অপেক্ষাকৃত অনেক জুনিয়রকে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে সেটি হবে আগামী দিনের রাজনীতির একটি বড় ইস্যু। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, আপিল বিভাগের এই ৬ জনকে প্রমোশন দেবেন কে? এ ব্যাপারে একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যেমন চূড়ান্ত, তেমনি আপিল বিভাগের জজদের নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারেও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা একক ও চূড়ান্ত। ঠিক এখানেই সবচেয়ে বড় ব্লান্ডারটি হতে পারে।

(দৈনিক ইনকিলাব : ০৯/১১/২০১০)

www.pathagar.com

(৩৬)

উইকিলিকসে বাংলাদেশের রাজনীতি : হাইকোর্টের রায়ে রাজনৈতিক বিষয়

এই কলামটি লিখছি বিদায়ী বছরের শেষ দিনে, অর্থাৎ ২০১০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে। এটি ছাপা হবে ইংরেজি নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ ২ জানুয়ারি। স্বাভাবিক নিয়ম হলো, আজকের কলামে গেলো বছরের একটি সালতামামি উপস্থাপন করা। সেটি করারই ইচ্ছে ছিল। এর মধ্যে আবার উইকিলিকস বাংলাদেশের ওপর অনেকগুলো ক্ল্যাসিফাইড ডকুমেন্ট বা গোপন দলিল প্রকাশ করেছে। এগুলোর সংখ্যা ১৯৮৪। তবে সবগুলো প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে ১৬১৮টি। ৩৬৬টি দলিল এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। আবার একই সময় অর্থাৎ গত ২৯ ডিসেম্বর সপ্তম সংশোধনীর ওপর ১৩৬ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। এই রায়টি যতদূর সম্ভব পড়ার চেষ্টা করছি। রায়টির সংক্ষিপ্তসার ঘোষিত হয়েছিল ৪ মাস আগে। ৪ মাস পর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলো। দেখলাম, যে বিষয়ে মামলাটি রুজু করা হয়েছে, রায়ে সেই অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক পেছনে যাওয়া হয়েছে। আরো দেখলাম কঠোরভাবে আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেকগুলো রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, যার ফলে এই রায়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে এর রাজনৈতিক দিক নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এইদিক সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। গত ৩০ ডিসেম্বর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী অনেক কথা বলেছেন। সেসব কথা পত্র-পত্রিকায় এসেছে। সে সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোচনার দরকার। এসবের জন্য যে বিশাল স্পেসের দরকার সেটি এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে এই তিনটি প্রসঙ্গ আলোচনা করার চেষ্টা করছি। প্রথমে বাংলাদেশ সম্পর্কে উইকিলিকস।

॥ দুই ॥

বাংলাদেশ সম্পর্কে উইকিলিকস যেসব গোপন তথ্য প্রকাশ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে তুলে ধরছি।

১. ড. ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত কেয়ার টেকার সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে সৌদি আরবে নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু বেগম জিয়া কোনো অবস্থাতেই বিদেশ যেতে চাননি। এ ব্যাপারে তার অনড় ভূমিকার কারণে কেয়ারটেকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

২. শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকার আমলে আমেরিকা যান। এরপর তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বিষয়টি ভারত ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তখন ভারত এই বিষয়টি আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের কাছে উত্থাপন করে। এই তিনটি দেশ মিলে শেখ হাসিনাকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দানের জন্য ফখরুদ্দিন সরকারের ওপর চাপ দেয়। ফলে ফখরুদ্দিন সরকার হাসিনার ওপর থেকে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এবং শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন।

৩. ভারতের আশঙ্কা ছিল যে, সেনাবাহিনী হয়তো ক্ষমতা গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা সেটি চাচ্ছিল না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাকে ভারত অনুরোধ করে। এই তিনটি দেশ সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করে। ফলে দেশে আর সেনা শাসন জারি হয়নি।

৪. এ দেশের মাদরাসা শিক্ষাকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চায় যার ফলে মাদরাসার ছাত্ররা আমেরিকার সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং আমেরিকার আদলে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

৫. আমেরিকা মনে করেছিল যে, বাংলাদেশে সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে র‍্যাব সেই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, যে ভূমিকা আমেরিকার এফবিআই করছে।

৬. আওয়ামী লীগের একটি মহল র‍্যাবকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা সেটির বিরোধিতা করে। ২০০৮ সালের ১২ জুলাই আমেরিকার একটি টিম ঢাকায় আসে। এই টিমে ছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং বিচার বিভাগের সদস্যবৃন্দ। ১২ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত তারা ঢাকা অবস্থান করেন এবং র‍্যাবকে যাতে নিষিদ্ধ না করা হয় সেই অনুরোধ করেন।

৭. র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে বিনা বিচারে খুন হয়েছে ১ হাজারেরও বেশি মানুষ। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার একটি অংশ তাই র‍্যাবকে 'ডেথ স্কোয়াড' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

৮. ব্রিটেনে মুসলিম জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ঘটছে। ফলে তারা নাকি খুব উদ্বিগ্ন। ১৬ লাখ থেকে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২০ লাখে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ২২ লাখ। ইংল্যান্ডে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ৭৪ শতাংশই হলো এশিয়ান। এদের মধ্যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারীদের অংশ হলো ১৬ শতাংশ।

৯. রিপোর্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শেখ হাসিনার প্রো-ইন্ডিয়ান ভূমিকা। শেখ হাসিনা ভারতের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এই মর্মে হাসিনা যে পরিচিতি পেয়েছেন, সেই পরিচিতিতে ভারত নাকি খুব উদ্বিগ্ন। খবরটি প্রকাশ করেছে

www.pathagar.com

উইকিলিকস, যারা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গত বছরের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি বার্তা পাঠান। ঐ বার্তায় তিনি ঢাকাস্থ তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাবু প্রণব মুখার্জী ঢাকা সফরের পরিকল্পনা করেছেন। ঐ সফরকালে ঢাকার সাথে তার আলোচনার মুখ্য বিষয় হবে 'কাউন্টার টেরোরিজম' বা সন্ত্রাস দমন। লন্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার মতে, ভারত চাচ্ছিল বিষয়টি যেন দ্বিপাক্ষিক হয়। এই কথাটি বলেছেন বাবু পিনাক রঞ্জন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস মরিয়ার্টি যেভাবে পিনাক বাবুকে উদ্ধৃত করেছেন সেই উদ্ধৃতি মোতাবেক ভারতীয় হাই কমিশনার বলেছেন, 'ইন্ডিয়া উপলব্ধি করছে যে, বাংলাদেশ হয়ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের ওপর জোর দিতে পারে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি ভারতের সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ। সেই অভিযোগের ওপর একটি রাজনৈতিক আচ্ছাদন দেয়ার জন্যই হয়তো শেখ হাসিনা আঞ্চলিক টাস্কফোর্স চাইতে পারেন।' ঐ বার্তার একস্থানে ব্যক্তিগত মতামত দিতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, "ভারত প্রায়শই বলে যে, আন্তর্জাতিক ইসলামী সন্ত্রাসীরা প্রায়শই বাংলাদেশকে নিরাপদ আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করে এবং প্রায়শই বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যায় এবং সেখানে বোমাবাজিসহ অন্যান্য সশস্ত্র তৎপরতা চালায়।" মার্কিন রাষ্ট্রদূত তার ঐ ব্যক্তিগত নোটে আরো বলেন, "নতুন দিল্লী আরো বলে যে, আসামের স্বাধীনতা সংগ্রামী দল 'উলফা'সহ ভারতের যেসব অভ্যন্তরীণ চরমপন্থী দল বাংলাদেশকে তাদের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করছে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যা কিছুই করার আছে তার সবকিছুই বাংলাদেশ সরকারের করা উচিত।" উইকিলিকস প্রকাশিত ঐ মার্কিন বার্তায় বলা হয়, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়ে ভারতীয় হাই কমিশনার উল্লাস প্রকাশ করেছেন। মরিয়ার্টি উল্লেখ করেছেন যে, বিজয়ী দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সাথে ভারতের রয়েছে উষ্ণ সম্পর্ক। উইকিলিকসের ঐ রিপোর্ট মোতাবেক ভারতীয় হাই কমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টিকে আরো বলেন যে, বাংলাদেশের সাথে ভারত যেসব বিষয় উত্থাপন করবে তার মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে নিরাপত্তা সহযোগিতা। পিনাক চক্রবর্তী এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেন যে, আঞ্চলিক হোক আর দ্বিপাক্ষিক হোক, প্রস্তাবিত টাস্কফোর্সকে হতে হবে কর্মনির্ভর, বাকসর্বস্ব নয়। অর্থাৎ তাদেরকে কাজ করতে হবে, শুধুমাত্র কথার ফানুস উড়ালে চলবে না।"

www.pathagar.com

উইকিলিকস কর্তৃক প্রকাশিত গোপন দলিলে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ওপরে তুলে দেয়া হলো। রিপোর্টে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। বিষয়গুলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। পাঠক ভাইয়েরা যা বোঝার বুঝে নেবেন। এই বিষয়ে আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এবার সপ্তম সংশোধনীর ওপর হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রসঙ্গ।

॥ তিন ॥

এই রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশের সংক্ষিপ্তসার নিচে তুলে দেওয়া হলো ঃ

১. মুজিব সরকারের উৎখাতের পর তিনটি সামরিক সরকার এসেছে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র জাতির জনককে হত্যা করা নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতি ও চেতনাকে মুছে ফেলা ও ভূলুণ্ঠিত করা।

২. খন্দকার মোশতাক ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে সকল প্রচেষ্টাই ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলার।

৩. জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের স্লোগন 'জয় বাংলাকে' হত্যা করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ বিমান এসব নাম মুছে ফেলা হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, যেখানে পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল, সেই স্থানকে শিশুপার্কে পরিণত করা হয়। পাকিস্তানের দালাল শাহ আজিজুর রহমানকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদে নিযুক্ত করেন জিয়াউর রহমান। এছাড়া পাকিস্তানের দালাল কর্নেল মোস্তাফিজ ও সোলায়মানকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। অনেক দালাল, যারা মুক্তিযুদ্ধকালে দেশত্যাগ করেছিল, তারা জিয়ার শাসনামলে শুধু দেশে ফিরে এসেছে তাই নয়, তাদেরকে বাংলাদেশে বসবাসের নিরাপদ স্বর্গ গড়ে দেয়া হয়। অনেককে অধিষ্ঠিত করা হয় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে। জঘন্যতম আইন করে বঙ্গবন্ধুর স্বঘোষিত খুনীদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের বিদেশে উচ্চ মর্যাদার কূটনৈতিক পদে নিয়োগ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ৭২ সালের মূল সংবিধানকে নির্দয়ভাবে তছনছ করেন জিয়াউর রহমান। তিনি সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভ ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলেন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেন।

৪. জিয়াউর রহমান সংবিধানের যে মূল স্তম্ভ মুছে ফেলেছিলেন, এরশাদ তার পথ অনুসরণ করে এই মুছে ফেলা নীতিতে দেশ চালিয়ে গেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক স্লোগানযুক্ত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' যুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে, হাইকোর্টের আলোচ্য রায়ে লক্ষ্যের চেয়ে লক্ষ্যবহির্ভূত বিষয়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন ছিলো চার বছরের। এই চার বছরের শাসনটি ছিলো অবৈধ। এই চার বছরের মধ্যেই হাইকোর্টের রায় সীমাবদ্ধ থাকার কথা। কিন্তু তারা সময়টিকে পেছনে নিয়ে গেছেন। অধ্যাপক গোলাম আযম, শাহ আজিজুর রহমান, কর্নেল মোস্তাফিজ, জনাব সোলায়মান প্রমুখকে দালাল বলা, রাজনীতিতে তাদের প্রত্যাবর্তন, রাষ্ট্রীয় পদে তাদের নিযুক্তি ইত্যাদি কাজের সমালোচনা করার কথা রাজনৈতিক দলের। রাজনৈতিক দলের ঐসব বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে হাইকোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে। দিন যায়, কথা থাকে। ২০১০ সাল চলে গেল। এসেছে ২০১১ সাল। এমনি দিন যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে। আসবে নতুন নতুন বছর। আজকের দিনটি হয়ে যাবে অতীত। সেই আগামী দিনে অতীত যদি কথা কয়ে ওঠে, তাহলে? অতীত যদি বলে, 'জয় বাংলা' বা 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' হল দু'টি রাজনৈতিক স্রোতধারার দু'টি শ্লোগান। একটি বড় রাজনৈতিক দলের শ্লোগান আরেকটি বড় রাজনৈতিক দলের ওপর চাপিয়ে দিলে সেই দল সেটি মানবে কেন? তেমনি আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো একশত ভাগ রাজনৈতিক এবং দারুণ বিতর্কমূলক। আগামীতে যদি আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ কোন দল ক্ষমতায় আসে এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে বিপরীতধর্মী সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করে তখন পাল্টাপাল্টির বিষয়টাই মানুষকে নাড়া দেবে। আমাদের আদালত পাল্টাপাল্টির রাজনীতিতে না ঢুকলেই ভালো করতো।

নতুন বছরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নটি রেখে আজকের মত শেষ করছি। (দৈনিক সংগ্রাম : ০২/০১/২০১১)

www.pathagar.com

(৩৭)

সংবিধান পুনর্মুদ্রণ ঃ দালাল আইনের প্রত্যাবর্তন দণ্ডিত ব্যক্তি এমপি ও ভোটার হওয়ার অযোগ্য

অবশেষে পুনর্মুদ্রিত সংবিধান দিনের আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। দু'-এক সপ্তাহের মধ্যেই সংবিধান বাজারে আসছে, এমন কথা গত কয়েক মাস ধরেই শুনে আসছি। কিন্তু তারপরও সেটি বাজারে আসে না। আসি আসি করেও আসছে না। এমন একটি পরিস্থিতিতে গত শনিবার আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, চলতি মাসের মধ্যেই অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত সংবিধান সরকার তথা জনগণের কাছে আসবে। অবশ্য আইনমন্ত্রী এ ধরনের সময়সীমা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার দিয়েছেন। তবে এবার তার কথায় বিশ্বাস করার বিশেষ কারণ দেখা যাচ্ছে। কারণ তিনি বলেছেন, বিজি প্রেসের মুদ্রণ যন্ত্রে যদি কোনো বড় ধরনের ব্রেকডাউন না হয় তাহলে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সংবিধান ছাপা হয়ে আমাদের হাতে আসবে। সামরিক আইনের মাধ্যমে সংবিধানে যেসব বিষয় অসাংবিধানিকভাবে যুক্ত করা হয়েছিল সেগুলো বাদ দিয়ে সংবিধান পুনর্মুদ্রণের কাজ চলছে। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, পঞ্চম সংশোধনীর ওপর সুপ্রীম কোর্টের দেয়া রায়ের আলোকে এরই মধ্যে সংবিধান সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেন, অসাংবিধানিকভাবে সংসদে কোনো আইন পাস হলে তাও সুপ্রীমকোর্ট বাতিল করতে পারবে।

আইনমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সুপ্রীম কোর্টের রায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সংবিধানের একটি ধারা যদি আরেকটি ধারার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে কি হবে? উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, সেক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে সংবিধান সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটি বিষয়টি পরীক্ষা করবে এবং তাদের সুপারিশ জাতীয় সংসদে পাঠাবে। সংসদ এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আইনমন্ত্রী আরো বলেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে এমন কতগুলো অনুচ্ছেদ সংবিধানে ফিরে আসছে যেগুলো পঞ্চম সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে একটি হলো ৭২ সালের সংবিধানের ১২২ নম্বর অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন যদি তিনি "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।" উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের ৮নং অর্ডারবলে বাংলাদেশ দালাল আইন (স্পেশাল

www.pathagar.com

ট্রাইব্যুনাল), ১৯৭২ জারি করা হয়। এই ট্রাইব্যুনালে দালালির অভিযোগে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির বিচার করা হয়। বিচারে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি দণ্ডিত হন, অনেকে বেকসুর খালাস পান এবং অনেকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে শেখ মুজিব সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যারা দণ্ডিত হয়েছিলেন তারাও সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হন। পরবর্তীতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দালাল আইন বাতিল করেন। এসব কথা সকলেই কম-বেশি জানেন। তাই এ পয়েন্টে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিচ্ছে অন্যত্র। বিষয়টি পত্র-পত্রিকার পাতায় জোরেশোরে আসেনি। কিন্তু বিষয়টি সিরিয়াস আলোচনার দাবি রাখে।

॥ দুই ॥

পঞ্চম সংশোধনীর ফলে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১২২ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের (ঙ) ধারাটি বাতিল হয়। কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছি যে (ঙ) ধারা মোতাবেক কোনো ব্যক্তি দালাল আইনে দণ্ডিত হয়ে থাকলে তিনি বাংলাদেশের ভোটার হওয়ারও অযোগ্য হবেন। ভোটার হওয়ার অযোগ্য হলে তার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ৭২-এর সংবিধানের আলোচ্য অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদটি বাতিল হওয়ার ফলে দালাল আইনে গ্রেফতার হওয়া, অভিযুক্ত হওয়া এবং দণ্ডপ্রাপ্ত সকলেই ভোটার হওয়া তথা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। এই অনুচ্ছেদটি বাতিল হওয়ার পর দেশে যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলো নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন যারা দালাল আইনে দণ্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংবিধানের ঐ অনুচ্ছেদটি বাতিল হওয়ার ফলে দালাল আইনে দণ্ডিত হওয়ার বিষয়টি তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের কেউ কেউ জাতীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়ার পর পুনর্মুদ্রিত হয়ে যে সংবিধান আসছে সেই সংবিধানে ১১২ নং অনুচ্ছেদের (২ উপ-অনুচ্ছেদের) (ঙ) ধারাটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তাহলে যে ৭৫২ ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়া হয়েছিল তারা কি এবার তাদের ভোটাধিকার হারাচ্ছেন? ফলে তারা কি সব ধরনের নির্বাচনে অযোগ্য হতে যাচ্ছেন? এরা কিন্তু যুদ্ধাপরাধে দণ্ডিত হননি, হয়েছেন দালাল আইনে। শেখ মুজিবুর রহমান এদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। পরবর্তীতে ঐ ক্ষমার আওতায় এবং দালাল আইন বাতিলের ফলে ওদের অনেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনপ্রতিনিধি হয়েছিলেন। একই ব্যক্তির একই মামলায় কি দু'বার বিচার হয়? দু'বার কি দুই ধরনের শাস্তি হয়? একবার শাস্তি দেয়া হলো, তারপর শাস্তি মাফ করা হলো, তারপর আবার তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে- এটি ন্যায়বিচারের কোন্ ক্রাইটেরিয়াতে পড়ে?

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি এক বা একাধিকবার ইলেকশন করেছেন, ইলেকটেড হয়েছেন, সেই একই ব্যক্তি এখন ইলেকশনের অযোগ্য হবেন কোন যুক্তিতে? কোন আইনে? সুতরাং ঢালাওভাবে সুপ্রীম কোর্টের রায় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসব পয়েন্ট ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে হবে।

একটি ইংরেজি পত্রিকা গত ২৮ ডিসেম্বর বিশ্বস্ত সূত্রের খবর দিয়ে বলেছে যে, ১৯৭২ সালে জারিকৃত দালাল আইন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করা হয়। এই আইন পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ফলে যারা দালাল আইনে দণ্ডিত হয়েছেন তারা ভোটাধিকার হারাবেন। শুধু ১২২ নং অনুচ্ছেদই নয়, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৬৬ নং অনুচ্ছেদ অবিকল পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। ৬৬ নং অনুচ্ছেদের (ঙ) উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না যদি তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে যারা এতদিন ধরে ভোটার থেকেছেন তাদের ভোটাধিকার গেল। তেমনি এতদিন ধরে তারা জাতীয় সংসদ সদস্য হতে পারতেন, সেখানেও তাদের অযোগ্য করা হলো।

॥ তিন ॥

এছাড়া পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে ২৫ নং অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। বর্তমানে সংবিধানের ২৫(২) অনুচ্ছেদটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বাতিল হওয়া এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করা হবে। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে এই ধারাটি থাকবে না বলে মুসলিম জাহানের সাথে বাংলাদেশের বিশেষ সম্পর্কেও ভাটা পড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

আইনমন্ত্রী আরো বলেছেন যে, সংবিধান পুনর্মুদ্রিত হওয়ার পর নতুন সংবিধানে ৭২ সালের সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রতিস্থাপিত হবে। সেক্ষেত্রে যিনি যত কথাই বলুন না কেন, ইসলামী দলগুলো তথা ধর্মভিত্তিক দলগুলো বিলুপ্ত হবে। আবার একই নিঃশ্বাসে আইনমন্ত্রী এ কথাও বলেছেন যে, সরকার কোনো রাজনৈতিক দল বিলোপ করবে না। পুনর্মুদ্রিত সংবিধান মোতাবেক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন নাকি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সংবিধানের আলোকে নির্বাচন কমিশন নাকি সিদ্ধান্ত নেবে যে, কোন্ দলের নিবন্ধন থাকবে আর কোন্ দলের নিবন্ধন বাতিল হবে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর সাদা চোখে দেখলে নির্ভাবনায় বলা যায় যে, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন হারিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

॥ চার ॥

জানা গেছে যে, পুনর্মুদ্রিত সংবিধানের মলাটে থাকবে নিম্নোক্ত বিষয় ও কথা-

১. বাংলাদেশ সরকারের অফিসিয়াল লোগো
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধান
৩. প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগ কর্তৃক লিভ পিটিশন নং ১০৪৪/০৯ এবং ১০৪৫/০৯ এ প্রদত্ত রায়ের আলোকে পুনর্মুদ্রণ.....২০১০

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে এমন কতুগুলো বিষয় থাকবে যেগুলো আদি সংবিধান অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধান এবং বর্তমান সংবিধান অর্থাৎ পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনীর পরের সংবিধান- এই দুটির কোনোটিতেই ছিল না। গত ১৯ ডিসেম্বর আইন মন্ত্রণালয় পুনর্মুদ্রণের জন্য খসড়াটি বিজি প্রেসে পাঠায়। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম- 'স্বাধীনতার ঘোষণা।' এই অধ্যায়ে থাকবে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বার্তা। এই বার্তাটিই হলো স্বাধীনতার ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে, অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সমগ্র বাংলাদেশে সাবেক ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, সেই বার্তা। পুনর্মুদ্রিত সংবিধান অনুসারে এই বার্তাটিই হলো স্বাধীনতার ঘোষণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে থাকবে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।' ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিব নগরে স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রটি পাঠ করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে অথবা পরবর্তীতে সংবিধানের যতগুলো সংস্করণ ছাপা হয়েছে, তার কোনটিতেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুজিবনগরে পঠিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। যেহেতু হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বরাত ও উদ্ধৃতি দিয়ে সংবিধান ছাপা হচ্ছে, তাই এ সম্পর্কে স্বনামে ভিন্নমত প্রকাশ করতে অনেকে রাজি হননি।

হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে যেসব অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ ও ধারা বর্তমান সংবিধানে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে সেই সব ধারার অনেকগুলোই বর্তমান সংবিধানের অনেকগুলো ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি আলোচনা করতে হলে আরো দু'তিনটি কিস্তির প্রয়োজন হবে। আজকের এই লেখায় তার স্থান সংকুলান হবে না। 'বিস্‌মিল্লাহ' সংবিধানে থাকুক, এটি দেশের সকলেই চান। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানেও

www.pathagar.com

সেটি থাকছে। কিন্তু যে যুক্তিতে সেটি রেখে দেয়া হচ্ছে সেই যুক্তি প্রবল বিতর্ক সাপেক্ষ। এ ব্যাপারেও সম্ভব হলে পরবর্তী কোনো এক সময় আলোচনা করবো। একদিকে জাতি হিসেবে আমরা পরিচিত হবো 'বাঙ্গালী ' হিসেবে কিন্তু নাগরিকত্ব থাকবে 'বাংলাদেশী,' সেটিও সাংঘর্ষিক এবং গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশীর সংজ্ঞা যে দর্শন থেকে উৎসারিত, সেই দর্শনের সাথে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালিত্বের দর্শন সাংঘর্ষিক। এ ছাড়া সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা এসব বিষয়ে রয়েছে উৎকট পরস্পর বিরোধিতা। এই তিনটি বিষয় নিয়ে অবশ্য ইতিপূর্বে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে।

শেষ করার আগে একটি কথা। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট বলছেন যে তারা সংবিধানে নিজেরা কিছু যুক্ত করেননি। অবৈধ সামরিক শাসনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তাদের সমস্ত কাজকর্ম অবৈধ। তাদের সংশোধনীসমূহ অবৈধ। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট সেই অবৈধ সংশোধনীগুলো বাতিল করেছেন মাত্র, নতুন কিছু যুক্ত করেননি। তাই যদি হয়, তাহলে 'স্বাধীনতার ঘোষণা' এবং 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' সংবিধানে সুপ্রীমকোর্ট ঢুকাচ্ছেন কিভাবে? কোন্ ক্ষমতায়? এবং কোন্ এখতিয়ারে? এগুলো যদি অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে সেটি করার একমাত্র কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে পার্লামেন্টের। পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের চার-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে আওয়ামী লীগের বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতাটি সুপ্রীম কোর্ট নিজের হাতে নিলেন কিভাবে, সেটি আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

(দৈনিক ইনকিলাব : ১১/০১/২০১১)

www.pathagar.com

৩৮

রাজনৈতিক বিষয় থেকে হাইকোর্টের সযত্নে দূরে থাকা উচিত

আওয়ামী ঘরানার বন্ধুরা মরহুম কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেন প্রায়শই। উদ্ধৃতিটি হলো, "অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ।" আসলেই তাই। কিম্ভূতকিমাকার সব ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে। কামারের কাজ কুমার করছে, আর কুমারের কাজ কামার করছে। এই রকম অবস্থায় ফলটা কি হতে পারে? কুমারের হাঁড়ি-পাতিলও বানানো হয় না, আর কামারেরও লোহা গরম করে সেটিকে ঠিকমতো বাঁকানো যায় না। এখন বাংলাদেশে চলছে ঠিক সেই রকম অবস্থা। রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের ফয়সালা হবে রাজপথের মিছিলে অথবা পল্টন ময়দানের জনসভায় অথবা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে। পক্ষান্তরে জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পত্তি হবে মামলা মোকদ্দমা, সেটা হতে পারে দেওয়ানী মামলা বা ফৌজদারী মামলা। আরো হতে পারে কোম্পানী আইনের মামলা অথবা সাংবিধানিক মামলা মোকদ্দমা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশের জ্বলন্ত রাজনৈতিক সমস্যাগুলোও আইন-আদালতে নেয়া হচ্ছে। আর আইন- আদালতও ঐসব মামলা গ্রহণ করছেন এবং বিচার করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই দেখা যায় যে, ১৫ আগস্ট শোক দিবস কিনা, ঐদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে কিনা, জাতীয় শোক দিবস হিসাবে ঐদিন সরকারি ছুটি থাকবে কিনা, সেই সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা হচ্ছে হাইকোর্টে। তাহলে পার্লামেন্ট, পলিটিক্যাল পার্টি, পলিটিক্যাল ফোরাম, নির্বাচনী মেনিফেস্টো এবং সাধারণ নির্বাচনের আর প্রয়োজন কি? ১৫ আগস্টে তো ছুটি হলো। তাহলে ৭ নভেম্বরের কি হবে? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যানারে যে ইন্টারিম সরকার দুই বছর দেশ শাসন করল তারা ৭ নভেম্বরকে টাচ করল না। এখন ৭ নভেম্বরে কি হবে? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা বছরে যেসব দিনকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে ৭ নভেম্বর নেই। ৭ নভেম্বরের সরকারি ছুটি তারা বাতিল করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট কি বলবেন? বিশেষ করে ঐসব বেঞ্চ বা বিচারপতি যারা ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছেন। যেহেতু বিষয়টি রাজনৈতিক তাই তারা ৭ নভেম্বরের বিষয়টিও স্যুয়োমোটো টেকআপ করতে পারতেন। আগামী নির্বাচনে বিরোধী দল যদি মেজরিটি পেয়ে সরকার গঠন করে এবং হাইকোর্টের ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করে তাহলে হাইকোর্ট কি বলবেন? বাতিলের সেই সিদ্ধান্ত যদি পার্লামেন্টের মেজরিটি পেয়ে সমর্থিত হয় তাহলে কারো কিছু বলার থাকবে কি?

www.pathagar.com

আমাদের দেশে অতীতে এসব ঘটনা ঘটেছে। ১৫ আগস্ট আর ৭ নভেম্বর নিয়ে অনেক পাল্টা-পাল্টি হয়েছে। একবার সরকারি ছুটি হয়েছে, আরেকবার বাতিল হয়েছে। কারণ ১৯৯১ সাল থেকে দেশে ৪টি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ১৯৯১ সালে এসেছে বিএনপি সরকার। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার। আবার ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। তাই ২ বার করে ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বর বহাল থেকেছে আবার ২ বার করে বাতিল হয়েছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় এই দু'টি ইস্যুরও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত।

॥ দুই ॥

এদেশে কথায় কথায় ভারতীয় গণতন্ত্রের উদাহরণ দেয়া হয়। ভারতে এই ধরনের রাজনৈতিক ইস্যুর সমাধান করেনি সুপ্রীম কোর্ট। ভারতের প্রাদেশিক অথবা সুপ্রীম কোর্ট বিগত ৬২ বছরে একটি রাজনৈতিক বিষয়েও কোনো রায় দিয়েছে বলে সংবাদপত্রের পাতায় দেখিনি। সংবিধানের ১০৬ ধারায় সুপ্রীম কোর্টকে উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। সেটি কোন বিষয়ে? এটি হল, 'সংবিধানের ব্যাখ্যার বিষয়।' গত ১৫ই আগস্টের সরকারি ছুটি অথবা ৭ই নভেম্বরের ছুটি বাতিল হবে কিনা, সেগুলো এই সাংবিধানিক বিষয় নয়। সংবিধানে তার নামগন্ধও নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুস্পষ্টভাবে দু'টি ধারা প্রবহমান। একটি হলো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ স্রোতধারা। আরেকটি হলো বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন স্রোতধারা। দু'টি স্রোতধারাই অত্যন্ত শক্তিশালী। পালাক্রমে এক একটি ধারা নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ে ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী ঘরানা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মনে করে, ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস মনে করে, ৭ই নভেম্বরকে সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলাভঙ্গের দিবস বলে মনে করে। পক্ষান্তরে বিএনপি ঘরানা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা মনে করে না, ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে গণ্য করে না এবং ৭ই নভেম্বরকে সিপাহী জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস মনে করে। প্রধান দু'টি রাজনৈতিক ঘরানার মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক মতভেদ রীতিমত আদর্শিক মতভেদ। তাই তাদের বিভাজন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বিগত ৩৮ বছরে এই আদর্শিক ভেদরেখা মিলিয়ে যায়নি। আগামীতেও মিলিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ, একটু আগেই বলেছি যে বিভাজনটি আদর্শিক এবং মৌলিক। এই আদর্শিক প্রশ্নে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ বিশেষ বিচারপতি পার্টি হতে

www.pathagar.com

যাচ্ছেন কেন? যেসব রাজনৈতিক বিষয়ে তীব্র বিতর্ক সারাদেশ জুড়ে বিরাজ করছে সেখানে একটি বিশেষ মতবাদের সপক্ষে রায় দিয়ে ঐ দু'-একজন বিচারপতি নিজেদের বিতর্কিত করছেন কেন? বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত হয়েছেন। তাদের রাজনৈতিক চেতনাও এখন অনেক বেশি প্রখর। এখন অন্তত ১০টি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে। ঘন্টায় ঘন্টায় খবর হচ্ছে। অসংখ্য 'টকশো' হচ্ছে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে উপ-সম্পাদকীয়, নিবন্ধ, কলাম, মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে মানুষ বেশি সচেতন। তাই দু'-একজন বিচারপতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এরা সম্ভবত আওয়ামী ঘরানার ঘোরতর সমর্থক। রাজনৈতিক মামলা গ্রহণ করে এবং বিশেষ লাইনে সেই মামলার রায় দিয়ে তারা ঐ ধারণাকে আরো জোরদার করবেন কেন?

॥ তিন ॥

এমন একটি পটভূমিতে হাইকোর্টে উঠেছে আরেকটি রাজনৈতিক মামলা। মামলার মূল বিষয় হলো, মরহুম জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক নন। স্বাধীনতার ঘোষক হলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২০ এপ্রিল হাইকোর্ট সরকারের প্রতি একসাথে দু'টি রুল জারি করেছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের' ২০০৪ সালের সংস্করণে মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গ্রন্থের আলোচ্য সংস্করণে অর্থাৎ নবম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য আলোচ্য গ্রন্থের ২০০৪ সংস্করণ কেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য হাইকোর্ট সরকারের প্রতি রুল জারি করেছে। দ্বিতীয় রুলে সরকারকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে যে, যারা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না? বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ইতিহাস কেন বিকৃত করা হয়েছে সেজন্য সরকারকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্রের ২০০৪ সালের জুন সংস্করণে একটি তথ্য সংযোজিত হয়। ঐ তথ্যে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই তথ্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় বলা হয় যে, আলোচ্য তথ্যটি আইন ও সংবিধানের লঙ্ঘন। মামলার শুনানিতে বাদীর পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের তরফ থেকে লে.

www.pathagar.com

জেনারেল হারুন-উর-রশিদ আবেদন করেন। বিচারপতি এম. মমতাজউদ্দিন আহমদ সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ সরকারের প্রতি উপরোক্ত দু'টি রুল জারি করেন। বাদীর আর্জিতে বলা হয় যে, সংবিধানের ১৫০ ধারা এবং চতুর্থ তফসিল স্বাধীনতার ঘোষণাকে প্রোটেকশন দিয়েছে। কারণ, স্বাধীনতার ঘোষণা একটি আইনগত দলিল। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং 'স্বাধীনতার দলিলপত্র' নামক আলোচ্য গ্রন্থে মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে উপস্থাপন করা আইন ও সংবিধানের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে বক্তব্য প্রদানের পূর্বে আদালতের এমিকাস কিউরী (আদালতের সাহায্যকারী) হিসেবে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি বর্ণনা করেন।

এর আগে বিবাদীর পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক আবেদন জানালে হাইকোর্ট সেটি গ্রহণ করে। জনাব হামিদুল্লাহ খানের উকিল এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন গত ২১ মে এক আবেদনে বলেন যে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাদীর রিট আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বাদী যে বিষয়ে আবেদন করেছেন সেটি প্রথমে দেওয়ানী আদালতে দাখিল হওয়া উচিত ছিলো। যেহেতু বিষয়টির সাথে দেওয়ানী বিষয় জড়িত, তাই হাইকোর্টে সরাসরি রিট আবেদন চলতে পারে না।

॥ চার ॥

শুধুমাত্র স্বাধীনতার ঘোষক প্রসঙ্গটিই নয়, ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতির পিতা প্রসঙ্গটিও স্থান পায় নি। জাতির পিতা কে অথবা স্বাধীনতার ঘোষক কে এসব বিষয় সংবিধানের কোথাও নেই। কারণ বিষয়গুলো একান্তই রাজনৈতিক। আমি সংবিধানের চতুর্থ তফসিল তথা ১৫০ ধারা পাঠ করলাম। সেখানে শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হয় নি। জিয়াউর রহমানকেও ঘোষক বলা হয় নি। ১৯৭৫ সালের পর থেকে এই জাতি জেনে আসছে যে, মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক। ৩৩ বছর পর এমন একটি রাজনৈতিক বিষয়ে হাইকোর্টের নিজেকে জড়ানো উচিত হবে না। জড়ালে ঐ বিচারপতি বিতর্কিত হবেন। বিষয়টির ফয়সালা হবে রাজনৈতিক অঙ্গনে। সংখ্যাধিক্যের জোরে আজ যদি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে জিয়াউর রহমানকে খারিজ করে দেয় তাহলে পরবর্তী পার্লামেন্ট এই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' কিনা। তাই এসব স্পর্শকাতর রাজনৈতিক বিষয় থেকে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট নিজেদের দূরে রাখবেন, সেটাই জনগণ প্রত্যাশা করে।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৪/০৫/২০০৯)

www.pathagar.com

৩৯

ইসলামী রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তা ও পঞ্চম সংশোধনী বাতিল

ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এটি নিষিদ্ধ করলে যেমন ধর্মপ্রাণ মানুষের মন অশান্ত হয়ে উঠবে অন্যদিকে সেই নিষিদ্ধকরণের উৎস কোথায় সেটি চিহ্নিত করা আরেকটি স্পর্শকাতর বিষয়। সেজন্য আজকের এই আলোচনা আমি করব অত্যন্ত সতর্কভাবে। আমি চেষ্টা করব, ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে জনগণকে প্রকৃত তথ্য জানাতে। আমি খেয়াল রাখব, যাতে এই লেখাটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোনো দলের বিরুদ্ধে না যায়। অথবা অনাবশ্যকভাবে কোনো দলের পক্ষে না যায়। এজন্য বর্তমানে বিরাজমান অবস্থা বর্ণনা এবং তার পটভূমি নির্মোহ মন দিয়ে জনগণের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

প্রথমে বর্তমান বিরাজমান অবস্থা। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে, দেশে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মাবলম্বী ও কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দল- কারো ওপরই কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। ১৯৭২ সালে প্রথম সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ছিল। তবে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী প্রথম সাড়ে ৩ বছরে ইসলাম পন্থী দলগুলো রাজনীতি করতে পারেনি। তবে কমিউনিস্ট দলগুলো রাজনীতি করেছে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনের ফলে কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামী দল নির্বিশেষে সকলে রাজনীতি করার অনুমতি পায়। ৭৫ পরবর্তীকালে যেসব সরকার আসে তারা ফরমানবলে সকলের জন্য রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেয়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তৎকালীন জাতীয় সংসদের একটি প্রস্তাববলে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়। সংসদীয় সরকারকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া বহু দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলকে রাজনীতি করার অনুমতি দেয়া হয়। সংসদে এই প্রস্তাবই চতুর্থ সংশোধনী নামে পরিচিত হয়ে আছে। ৭৫ পরবর্তী সরকার এই চতুর্থ সংশোধনীও বাতিল করে। ফলে বহুদলীয় রাজনীতি পুনরুজ্জীবিত হয়। তৎকালীন সরকারের এসব ফরমানই একটি সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব আকারে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। সেটি ছিল ১৯৭৯ সাল। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। ঐ সংসদ ইসলামী রাজনীতিসহ বহুদলীয় রাজনীতি করার অনুমোদন দেয়। তবে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার অপরিবর্তিত থেকে যায়। এই সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হলে সেটি সংবিধানের অংশ হিসেবে যুক্ত হয়। এই সাংবিধানিক আইনই পঞ্চম সংশোধনী নামে পরিচিত। যারা নিয়মিত পত্রিকা

www.pathagar.com

পড়েন অথবা যারা জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী সম্পর্কে কিছুটা হলেও ওয়াকিবহাল তারা এই ইতিহাস মোটামুটি জানেন। তারপরেও আমাকে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঝালাই করতেই হল। কারণ ইসলামী রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাবেগ আলোচনা করতে গেলে এই পটভূমিটি স্মরণ রাখতেই হবে।

উপরের এই আলোচনায় আমরা দুইটি পর্বের সন্ধান পাই। একটি হল স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম পর্ব। অপরটি দ্বিতীয় পর্ব। এরপর আসছে তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটি অব্যাহত ছিল ২০০৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে সংবিধান থেকে বাতিল করেন। যে মামলাটি নিয়ে হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষণা করেন সেই মামলাটি কিন্তু ছিল 'মুন সিনেমা হল' নামক একটি সিনেমা হল এবং তৎসংলগ্ন সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার মামলা। মুন সিনেমা হলটি সদরঘাটের সামান্য পশ্চিমে ওয়াইজঘাট নামক এলাকায় অবস্থিত। এই রায়টি ঘোষণা করতে গিয়ে হাইকোর্টের ঐ বেঞ্চ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে যতগুলো সরকার এসেছে (১৯৭৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) সেই সবগুলো সরকারই অবৈধ। সামরিক আইনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সামরিক আইনের কোনো বিধান নেই। সুতরাং সামরিক আইনের মাধ্যমে আসা ঐ সবগুলো সরকার অবৈধ। যেহেতু ঐ সবগুলো সরকার অবৈধ তাই ঐসব সরকার কর্তৃক সম্পাদিত সবগুলো কার্যক্রম অবৈধ।

॥ দুই ॥

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল রায়ের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

১. খন্দকার মোশতাক আহমদ একজন ক্ষমতা দখলকারী। বাংলাদেশের সংবিধানে সামরিক শাসনের কোনো স্থান নেই। তাই খন্দকার মোশতাকের জারি করা সামরিক আইন ছিল অবৈধ।

২. ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দান ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল অবৈধ।

৩. ২ দিন পর ৮ নভেম্বর বিচারপতি সায়েম কর্তৃক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের (সিএমএলএ) দায়িত্ব গ্রহণ এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগদান ছিল সংবিধানবিরোধী।

৪. ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা সিএমএলএ হিসেবে দায়িত্বভার অর্পণ ছিল সংবিধানবিরোধী।

www.pathagar.com

৫. মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা এবং তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল বেআইনী।

৬. সংবিধানে গণভোটের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোট ছিল অবৈধ।

৭. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারিকৃত সমস্ত ফরমান, সামরিক আইন বিধি ও সামরিক আদেশ বেআইনী। কারণ :

ক) এর ফলে সামরিক আইন বিধি, নির্দেশ প্রভৃতির অধীনে চলে যায় সংবিধান।

খ) ঐসব বিধি এবং নির্দেশ সংবিধানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।

গ) এসব বিধি, নির্দেশ ও ফরমান সংবিধানের মূল চরিত্রকে ধ্বংস করে। এসব মূল চরিত্র হল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ। এসব কাজ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ।

ঘ) সংসদ আইন প্রণয়ন করবে। কিন্তু সেই আইন সংবিধানের অধীনস্ত হতে হবে।

ঙ) পঞ্চম সংশোধনী বেআইনী। কারণ : এসব ফরমানের কাছে সংবিধান খাটো হয়ে গিয়েছিল এবং সংবিধানের মৌলিক চরিত্র ধ্বংস করা হয়েছে।

৮. পঞ্চম সংশোধনী মূল সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী ছিল।

৯. দেশের ভয়াবহ সংকট বা আন্দোলন সংবিধান সংশোধনের কারণ হতে পারে না। বরং এই ধরনের সংকট বা আন্দোলনকে সংবিধানের আওতায় থেকে দমন করতে হবে।

১০. সংবিধান লঙ্ঘন করা একটি গুরুতর অপরাধ। তবে এই সময় এমন কিছু কাজ করা হয়েছিল, সেগুলো দেশকে বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

পঞ্চম সংশোধনীর কোনো কোনো অংশকে হাইকোর্ট ক্ষমা করে দিচ্ছে (Condone)। চতুর্থ সংশোধনীও এই ক্ষমার আওতায় পড়েছে।

॥ তিন ॥

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চম সংশোধনীর কতগুলো বিষয়কে হাইকোর্ট ক্ষমা (Condone) করে দিয়েছে। কিন্তু রায়ে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদকে ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি। সেগুলো হল–

১. প্রস্তাবনা : "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

২. অনুচ্ছেদ-৬ : "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

৩. অনুচ্ছেদ-৮ : "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

www.pathagar.com

৪. অনুচ্ছেদ-৯ : "বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"
৫. অনুচ্ছেদ-১০ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।
৬. অনুচ্ছেদ-১২ : ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য এই অনুচ্ছেদে বিধৃত ৪টি নির্দেশিকা।
৭. অনুচ্ছেদ-২৫ : আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির গাইডলাইন।
৮. অনুচ্ছেদ-৩৮ : সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক সংগঠন নিষিদ্ধ।
৯. অনুচ্ছেদ-১৪২: সংবিধানের বিধান সংশোধন বা রহিতকরণের ক্ষমতা।

উপরের এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় যদি আপীল বিভাগ বহাল রাখে তাহলে মূল সংবিধানের অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানের উপরোক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে। এই ১৩টি অনুচ্ছেদ হল সংবিধানের পিলার বা ভিত্তি। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তার অষ্টম সংশোধনীর রায়ে বলেছেন, সংবিধানের মূল স্তম্ভ সংশোধন করা যাবে না। বিচারপতি খায়রুল হক এবং ফজলে কবির বলেছেন যে, সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা যাবে না।

॥ চার ॥

আমরা ফিরে আসছি আমাদের মূল কথায়। ইসলামী রাজনীতি কি নিষিদ্ধ হবে? রাষ্ট্রধর্ম কি বাতিল হবে? সংবিধানে কি 'বিসমিল্লাহ' থাকবে? এসবের রয়েছে একটি রাজনৈতিক দিক এবং আরেকটি আইনগত দিক। আইনগত দিক বলতে আমরা এখানে বুঝাচ্ছি হাইকোর্টের আলোচ্য রায়। যদি এই রায়টি আপিল বিভাগ বহাল রাখে এবং সরকার যদি সেটি কার্যকর করে তাহলে উপরোক্ত ৩টি প্রশ্নেরই উত্তর হল ঃ ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে, রাষ্ট্রধর্ম বাতিল হবে এবং 'বিসমিল্লাহ' থাকবে। আমি আবার বলছি, এগুলো হল হাইকোর্টের রায়ের আইনগত দিক। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেক্যুলারিজম এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সংশোধনকে হাইকোর্টের আলোচ্য রায় রাষ্ট্রদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছে। যে ভাষায় হাইকোর্টের রায়টি ঘোষিত হয়েছে সেই ভাষা পড়ে মনে হয় যে, বর্তমান জাতীয় সংসদও হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না, যদিও সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এই সরকার এই ইস্যুটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে মোকাবিলা করবেন সেটা নির্ভর করছে আগামী দিনের ওপর।

(দৈনিক ইনকিলাব : ১৯/০১/২০১০)

www.pathagar.com

৪০

সুপ্রীমকোর্টে কেয়ারটেকার

কেয়ারটেকার সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি বিভিন্ন অপশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তখন সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা নিয়ে শুনানি চলছে। দেশের আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ একই বিষয়ের ওপর যুগপৎ কেন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সেটি দেশের বোদ্ধা মহলের বোধগম্য হচ্ছে না। কারণটি হলো এই যে, একই বিষয়ে দেশের দুটি অঙ্গ যদি সিদ্ধান্ত নিতে যায় তাহলে চরম বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অবৈধ করে রায় দিল। সে ক্ষেত্রে সুরঞ্জিত বাবু সংসদীয় যে কমিটির কো-চেয়ারম্যান সেই কমিটির আর কিছু কি করার থাকে? আমরা পঞ্চম সংশোধনীর ক্ষেত্রে দেখেছি, সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছে সেটি হুবহু সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিস্থাপিত হতে হবে বলে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ঐ সব সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করে সরকারী ছাপাখানা থেকে মুদ্রণ করা হয়েছে। অবশ্য নতুন করে ছাপানো এই সংবিধানের কপি বাজারে ছাড়া হয়নি। গত শনিবার বেলা ১টায় বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন নিউজে অনুষ্ঠিত একটি 'টকশো'তে ব্যারিস্টার রোকনউদ্দীন মাহমুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন। তিনি জানালেন মুদ্রিত সংবিধানের কপি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, জাতীয় সংসদেও ৩৪৫ জন সদস্যের মাঝেও সেই কপি বিতরণ করা হয়নি। কারণ অবশ্য সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার করা হয়নি। তবে ধারণা করা যায় সংবিধানের সংশোধন হবে বলে এখন এটি জনগণের মাঝে ছাড়া হচ্ছে না। একই কথা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হচ্ছে। ইতোমধ্যেই লেখাটি এমন পর্যায়ে এসেছে আর বেশি বড় করলে সেটি পাঠকের ধৈর্যের ওপর ট্যাক্স বসানোর শামিল হবে। তাই অত্যন্ত সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

সকলেই জানেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামরিক শাসনের কোনো বিধির অধীনে সৃষ্ট হয়নি। অথবা সামরিক আইনের কোনো বিধিরবলে কোনো নির্বাচনও হয়নি। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাস করত তাহলেও না হয় একটি কথা ছিলো। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পার্লামেন্ট গঠিত হয়। সেই পার্লামেন্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলটি

www.pathagar.com

পাস হয়। তারপর সেই পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়। সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন জাস্টিস হাবিবুর রহমান। তার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে পার্লামেন্ট গঠিত হয় সেই পার্লামেন্টে সংখ্যগরিষ্ঠ আসন লাভ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। এরপর আরো দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। একটি নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন এবং আজও ক্ষমতায় বহাল আছেন। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। তার আমলেই আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেন। কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা মানতে রাজি ছিলো না বিএনপি। রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবিটি আদায় করা হয় এবং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সেটি অনুমোদিত হয়।

আমরা বুঝতে পারি না যে, জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থাকবে কি থাকবে না, সেটির বিচার দেশের আইন আদালত অর্থাৎ বিচার বিভাগ করবে কিভাবে? সংবিধান কি তাদেরকে সেই অধিকার দিয়েছে? সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারকবৃন্দ এই পয়েন্ট আমলে নেবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

(৪১)

সংবিধান সংশোধনের পূর্বাহ্নে কিছু পূর্ব কথা : কিছু প্রসঙ্গ কথা

এক

সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি আবার পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে? একবার সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংবিধানের অংশ বিশেষ বাতিল আবার পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন, তাদের সুপারিশ জাতীয় সংসদে প্রেরণ প্রভৃতি বিষয় পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। ৪০ বছর পর দেশে আবার সংবিধানের ব্যাপক সংশোধনের কথা শোনা যাচ্ছে। আমাদের সংবিধান ব্যাপকভাবে সংশোধনের কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের কথা মনে পড়ল।

যারা সংবিধান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ইতিহাস জানেন তারা বিলক্ষণ জানেন সংবিধান প্রণয়ন এবং সাংবিধানিক শাসন কায়েমে ব্যর্থতাই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ । এদিক দিয়ে আমরা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছি। এখন আবার এই সংবিধান সংশোধনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশেও কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটি একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস যারা পাঠ করেছেন তারা জানেন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী ৯ বছরেও দেশটি একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেনি। স্মরণ করা যেতে পারে যে তখন এটিকে 'সংবিধান' না বলে বলা হতো 'শাসনতন্ত্র'। ১৯৪৭ সালের ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত, অনুমোদিত এবং কার্যকর হয়। কার্যকর হওয়ার দিনটি অর্থাৎ ২৩ মার্চ পাকিস্তানে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯৪৬ সালে ভারত বিভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হয় যে আইন সভা, সেটিই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের গণপরিষদরূপে কাজ করতে শুরু করে। যতদিন পর্যন্ত শাসনতন্ত্র প্রণীত না হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' এর ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী পাকিস্তান শাসিত হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন আইনের ৮ম ধারা অনুযায়ী গণপরিষদকে দ্বিবিধ ক্ষমতা দেয়া হয়। প্রথমটি হলো, এটি পাকিস্তানের ফেডারেল পরিষদ বা পার্লামেন্ট হিসাবে কাজ করবে। দ্বিতীয়টি হলো, তারা পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং সেই সাথে নতুন দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনমাফিক ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের সংশোধন করবে।

প্রথমদিকে পাকিস্তান গণপরিষদের কাজ ভালই চলছিলো। দেশটি স্বাধীন হওয়ার ১ বছর ৭ মাস পর গণপরিষদ ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সেই বিখ্যাত Objectives Resolutions পাস করে। এসব প্রস্তাবে বলা হয় :

www.pathagar.com

১. জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশটি শাসিত হবে।
২. পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন, যার অধীনস্ত ইউনিটসমূহ হবে প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে স্বায়ত্তশাসিত।
৩. পবিত্র ইসলামে বিধৃত অনুশাসন মোতাবেক গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার কার্যকর করা হবে।
৪. সংখ্যালঘুরা তাদের ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন।

এসব মূলনীতি আরো খোলাসা করার জন্য গণপরিষদ কতগুলো কমিটি এবং সাব-কমিটি গঠন করে দেয়। যেসব সাব-কমিটি গঠন করা হয় তারমধ্যে প্রধানটি ছিলো মূলনীতি কমিটি বা Basic Principles Committee (B.P.C). ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিপিসি বা মূলনীতি কমিটির সুপারিশমালা প্রকাশিত হয়। এসব সুপারিশ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। বিপিসির সুপারিশমালা তৎকালীন পূর্ববাংলায় প্রবল সমালোচনার ঝড় তোলে। কারণ এসব সুপারিশে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা ছিলো না। বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহকে যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছিলো সেই পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনই বিপিসির সুপারিশমালায় দেয়া হয়েছিলো। সুতরাং এই রিপোর্ট প্রকাশের সাথে সাথেই পূর্ববাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ইতোমধ্যে পূর্ববাংলায় গঠিত হয়েছে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এবং 'মুসলিম ছাত্রলীগ'। পরবর্তীতে এই দুটি সংগঠন থেকেই 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় এবং সংগঠন দুটির নাম হয় 'আওয়ামী লীগ' ও 'ছাত্রলীগ'।

দুই

প্রিয় পাঠক, বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যাপক সংশোধনী আনয়নের জন্য যে বিরাট তোড়জোড় চলছে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি ৬০ বছর পেছনে ফিরে যাচ্ছি কেন? এই প্রশ্নটি আপনাদের মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পাবেন সেদিন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করতে গিয়ে যে প্রধান দুটি সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো সেই দুটি সমস্যার যদি সর্বসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা যেত তাহলে হয়ত ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আজও বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে এই ধরনের এমন দুই/তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব ঘটছে যেগুলোর সর্বসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান না হলে আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস কিভাবে লেখা হবে সেটা একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে। সেদিন ছিলো দুইটি ইস্যু। একটি ছিলো স্বায়ত্তশাসন, আরেকটি হলো ধর্মবিশ্বাসের স্থান, রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় চরিত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নটির সমাধান হয়েছে। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা, ইসলামী অনুশাসন ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি। এসব কথার প্রমাণ মিলবে বিগত ষাট বছরের ইতিহাস অতিসংক্ষেপে পর্যালোচনার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

বলছিলাম মূলনীতি কমিটির সুপারিশমালার কথা। এসব সুপারিশের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনমতকে সংগঠিত করার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন বা জাতীয় মহাসম্মেলনের মাধ্যমে। ঢাকার আরমানিটোলায় ১৯৫০ সালের ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই মহাসম্মেলনে কতিপয় সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয় এবং শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আতাউর রহমান খান ঐ গ্র্যান্ড কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি গণপরিষদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেন– "১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিলো পাকিস্তান ইস্যুর ওপরে একটি গণভোট। তাই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কোনো অধিকার গণপরিষদ সদস্যদের ছিলো না । গণপরিষদ গঠনের জন্য নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরাই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমানের কথাটি ধার করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছিলেন বিএনপি মহাসচিব মরহুম খন্দকার দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যেসব এমএনএ (জাতীয় পরিষদ সদস্য বা পার্লামেন্ট সদস্য) এবং এমপিএ (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেছেন তারা কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খানের লীগাল ফ্রেম ওয়ার্ক ওর্ডার (L.F.O or Legal Frame work Order)-এর অধীনে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্যই নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান রচনার কোনো ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করতে হলে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচিত সদস্যরা সংবিধান রচনা করবেন।"

যাইহোক, গ্র্যান্ড কনভেনশনে কতিপয় সাংবিধানিক প্রস্তাব পাস করা হয়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা প্রস্তাব, ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নিকট দাখিলকৃত সাংবিধানিক প্রস্তাব এবং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পেশকৃত পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্রের উৎস ছিলো এই গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনের সাংবিধানিক প্রস্তাবাবলী। অর্থাৎ গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনের সাংবিধানিক প্রস্তাবাবলীর সাথে শেখ মুজিবের পরবর্তী সাংবিধানিক প্রস্তাবাবলীর অনেক মিল ছিলো।

ইতিহাসের এই অধ্যায় নিয়ে তেমন একটা চর্চা হয়নি। তাই ইতিহাসের এই ক্ষণটি অনেকেই অবগত নন বলে আমার মনে হয়েছে।

তিন

যাই হোক, ইতিহাস এগিয়ে চলে। এসে যায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ইতিহাসের অনেকেই হয়ত এই তথ্যটি জানেন না পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা সমস্যার সমাধান হয় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলীর মাধ্যমে। পূর্ববাংলার

www.pathagar.com

জনগণ মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি ইউনিটের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি করে স্বতন্ত্র ইউনিট হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এই দুইটি ইউনিটের মধ্যে Parity বা সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রস্তাবে আরো বলা হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুইটি। একটি উর্দু অপরটি বাংলা। পাকিস্তানের সাংবিধানিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ হলো ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদা ছিলো ঐতিহাসিক ২১ দফা। এই ২১ দফার মধ্যে অন্যতম দফা ছিলো পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন। ২১ দফার ১৯ দফায় বলা হয় যে প্রতিরক্ষা,পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা পূর্ববাংলার হাতে থাকবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে আত্মীকরণ করা হবে। এছাড়া পূর্ববাংলায় থাকবে নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর এবং সমরাস্ত্র কারখানা।

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার শুরুতেই বলা হয়েছে– "কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে"।

শুধুমাত্র বাংলাদেশের সংবিধানকেই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়নি, পাকিস্তানের সংবিধানকেও ডকে তোলা হয়েছিলো। অবশ্য তখনো পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান প্রণীত এবং অনুমোদিত হয়নি। তাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ এবং সেগুলোর সংশোধনীকেই গ্রহণ করা হয়েছিলো পাকিস্তানের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র হিসাবে।

আবার ফিরে যাচ্ছি পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের পর দ্বিতীয় গণপরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই গঠিত হয় দ্বিতীয় গণপরিষদ। এই গণপরিষদ রচনা করে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, যেটি কার্যকর হয় ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। এই শাসনতন্ত্র মোতাবেক পাকিস্তানের নামকরণ করা হয়, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান'। তখন আওয়ামী লীগের প্রধান ও একচ্ছত্র নেতা ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনিও ঐ শাসনতন্ত্র মেনে নেন। ঐ শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের দাবী নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলেও যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় সেটি যুক্তফ্রন্টের দাবীর চেয়ে অনেক কম। ইতিহাস গড়িয়ে চলে। পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে ১৯৫৯ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিলো। সেই নির্বাচনকে ভন্ডুল করার জন্য ১৯৫৮ সালের ৫

www.pathagar.com

অক্টোবর সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হয়। একই মাসের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়। এই শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু হয়।

চার

সাংবিধানিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় ৬ দফা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পরের মাসে অর্থাৎ মার্চ মাসে শেখ মুজিব লাহোর গমন করেন। সেখানে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভায় তিনি ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। পরের ঘটনা মোটামুটি সকলেরই জানা। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রবল গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। ঐ বৈঠকে শেখ মুজিব তার ৬ দফা এবং ছাত্র জনতার ১১ দফা উত্থাপন করেন। এই ৬ দফা এবং ১১দফার সাংবিধানিক প্রস্তাবসমূহের উৎস ছিলো ১৯৫০ সালের মহাসম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবল। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং পাকিস্তানে জারী করা হয় দ্বিতীয় সামরিক শাসন। ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

পাঁচ

ফিরে আসছি বাংলাদেশে। বাংলাদেশের সংবিধান শুরু থেকেই বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কারণটি প্রথমত ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করা। এটি ঘটেছে অকস্মাৎ। আওয়ামী লীগ বিগত ৬০ বছর ধরে 'অসাম্প্রদায়িক' রাজনীতি করেছে, কিন্তু কখনও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবর্তনের কথা বলেনি। ১৯৪৯ সালে এই দলটি গঠনের সময় যে ৪২ দফা মেনিফেস্টো গৃহীত হয় সেখানেও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ছিলো না। বরং সেখানেও বলা হয়েছে যে, পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে প্রণয়ন করবে না। একই কথা বলা হয়েছিলো যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায়। সেখানে বলা হয়েছিলো, "ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।" ১৯৭০ সালের যে নির্বাচনে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ১৬৭ টি আসনে, সেই নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো কথা ছিলো না। বরং ঐ মেনিফেস্টোতে জনগণকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল কোরান সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না। এই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি

www.pathagar.com

আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮টি আসন। এই বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে বিজয় দিবস। বিজয় দিবস উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জনসভার মঞ্চে জাতীয় পরিষদের ১৬৭ এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৮৮ জন, মোট ৪৫৫ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপবিষ্ট ছিলেন। ১০ লক্ষ লোকের সামনে এই ৪৫৫ জন নির্বাচিত সদস্যকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে শপথ বাক্য পাঠ করান সেটিও শুরু করেন– "করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার নামে।" শপথ বাক্য শেষ হয় এই কয়টি লাইনে, "আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টায় সহায় হোন।"

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত পাকিস্তানের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করেন। এই খসড়া শাসনতন্ত্রে ছিলো অন্তত ১১০টি অনুচ্ছেদ এবং ততোধিক উপ-অনুচ্ছেদ।

পাকিস্তানের ঐ খসড়া শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় বলা হয়– "In the name of Allah, the Beneficient, the Merciful, We, the peoples of the autonomous States of Bangladesh, the Punjab, Sind, Pakhtunistan and Baluchistan." অর্থাৎ, "পরম করুণাময় এবং মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র নামে আমরা বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, পাখতুনিস্তান এবং বেলুচিস্তানের স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহের জনগণ অঙ্গীকার করিতেছি যে.....।"

খসড়া সংবিধানে আরো বলা হয়– "To enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, to order their lives in accordance with the teachings of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunnah". অর্থাৎ,"আমরা আরো প্রতিজ্ঞা করছি যে, পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিগতভাবে পবিত্র কোরান ও সুন্নায় বিধৃত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী যাতে করে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে সেজন্য সংবিধানে রক্ষাকবচ প্রদান করা হবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের শুরু থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কখনো আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেনি। বরং সব সময় কোরান ও সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হবে না, এই আশ্বাস দিয়ে এসেছে ২২বছর ধরে। অর্থাৎ ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের ১ বছর ৯ মাস পর অপ্রত্যাশিতভাবে বাংলাদেশের সংবিধানে যখন ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হলো এবং ইসলামী দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলো তখন থেকেই বাংলাদেশের জনমত বিভক্ত হয়ে পড়ল। সেই বিভাজন আজও চলছে।

www.pathagar.com

৪২

এবার কেয়ারটেকার সরকার : উচ্চ আদালতে আবার রাজনৈতিক বিষয়

দেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন,অর্থাৎ ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন কি কেয়ারটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে? নাকি ভিন্ন কোনো ব্যবস্থায় হবে? সারাদেশে শিক্ষিত এবং সচেতন লোকের মাঝে এই প্রশ্ন আজ প্রচণ্ড আলোড়ন তুলছে। অথচ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী মতে এই প্রশ্নটি আদৌতেই ওঠার কথা নয়। অথচ এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে এই বিষয়েই শুনানি চলছে। সংবিধানের ১৩ নম্বর সংশোধনী মোতাবেক দেশের প্রতিটি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনেই হওয়ার কথা। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৩টি নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের অধীনেই হয়েছে। ১৯৯৬ সালের আগের নির্বাচন, অর্থাৎ ১৯৯১ সালের নির্বাচন সেই অর্থে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হয়নি। কারণ তখন সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তৎসত্ত্বেও বলা যায় যে ১৯৯১ সালের নির্বাচনও একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সরকারের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। ২০ বছর আগের কথা। প্রেসিডেন্ট এরশাদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। সেই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয় দেশের প্রধান ৩টি রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী। গণআন্দোলনের চাপে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে কার কাছে? নির্বাচন ছাড়া তো গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে সেই নির্বাচন পরিচালনা করবে কোন্ সরকার? এমন একটি পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি ফর্মুলা উদ্ভাবিত হয়। সেই ফর্মুলা মোতাবেক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সাহাবুদ্দিন আহমেদকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। জাস্টিস সাহাবুদ্দিনের সরকার ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। সেই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে বসে। একারণেই সাহাবুদ্দিনের সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা না গেলেও বাস্তবে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরই কাজ করেন।

বেগম জিয়ার সরকার দেশ পরিচালনা করতে থাকে। এরমধ্যে যে কয়টি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেসব স্থানে দুর্নীতি, সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং কারচুপির অভিযোগ করা হয়। ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং বেগম জিয়া কর্তৃক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে পুরাতন রাজনৈতিক বিরোধ এবং অবিশ্বাস বয়েই যায়। তারই প্রকাশ ঘটে নবগঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনসমূহে। তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ইস্যুতে ২ বছর জাতীয় সংসদের অধিবেশন বর্জন করে। বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য তারা অনবরত হরতাল দিতে থাকে। তারা যেসব দাবী করে তার মধ্যে একটি ছিলো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের দাবী। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে বিরোধী দলসমূহের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিলো না। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি বিল উত্থাপন করে। এরপর ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ একই বিষয়ের ওপর আলাদাভাবে দুটি বিল উত্থাপন করে। ৩টি বিলেরই মূল সুর ছিলো এক। কিন্তু মতদ্বৈধতা ছিলো কেয়ারটেকার সরকার প্রধান সম্পর্কে। বিল ৩টি পেশ করা হলেও আলোচনার জন্য এগুলো জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়নি। কারণ ছিলো প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সংসদ অধিবেশন লাগাতার বর্জন। যাই হোক, দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সদস্য জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

॥ দুই ॥

জাতীয় সংসদের অধিবেশন লাগাতার বর্জন এবং বিরোধী দলের অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯ মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। ২১ শে মার্চ কেয়ারটেকার সরকার গঠন সম্বলিত একটি বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। মাত্র ৭ দিন পর ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ২৬৮-০ ভোটে জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকারের বিল গৃহীত হয়। ২ দিন পর ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট এই বিলে স্বাক্ষর করেন। এই বিলটিই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী নামে খ্যাত হয়েছে এবং এই বিলের অধীনেই রয়েছে সেই বহুল আলোচিত কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা।

কেয়ারটেকার সরকার বিল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পরেও বিরোধী দলের আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং দুই দিন পর অর্থাৎ ৩০শে মার্চ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। বেগম জিয়ার সরকার ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জাস্টিস হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান মোতাবেক প্রথম কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। এই কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে একই বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সপ্তম জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। সেই নির্বাচনে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

এরপর থেকে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা চলে এসেছে। ২০০১ সালে প্রধান বিচারপতি জাস্টিস লতিফুর রহমানের কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হয়। ঐ বছর কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট সরকার গঠিত হয়। ২০০৮ সালে প্রথম প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন, এরপর জনাব ফখরুদ্দীন প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। জনাব ফখরুদ্দীনের কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারী বর্তমান সরকার গঠিত হয়। এখনও সেই সরকার ক্ষমতায় আছে।

॥ তিন ॥

এই হলো কেয়ারটেকার সরকার গঠনের পটভূমি এবং বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেয়ার জন্য মামলাটি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে শুনানি চলছে। বিষয়টি সম্পর্কে সর্বসাধারণের সম্যক অবগতির জন্য আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি, উদ্ভব ও বিকাশ তুলে ধরলাম। আলোচ্য মামলায় এই ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার দাবিদার। এসম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেয়ার আগে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এ্যামিকাস কিউরী নিযুক্ত করেছেন। এ্যামিকাস কিউরী হলো আদালত বান্ধব আইনজীবী প্যানেল। এপর্যন্ত ৬ জন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী এ্যামিকাস কিউরী হিসেবে আদালতে তাদের বক্তব্য দিয়েছেন। এরা হলেন- (১) ব্যারিস্টার রফিকুল হক (২) ডঃ এম এ জহির (৩) ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম (৪) জনাব মাহমুদুল আমীন চৌধুরী (৫) ডঃ কামাল হোসেন এবং (৬) বিচারপতি টি এইচ খান। আদালতে দেয়া বক্তব্যে সাবেক এটর্নী জেনারেল জনাব মাহমুদুল ইসলাম বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা না থাকলে দেশে আবারও সামরিক শাসন জারির আশংকা থেকে যাবে। তার মতে এই সরকার অনির্বাচিত হলেও গণতন্ত্রের স্বার্থে এ ব্যবস্থা এসেছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতা তিক্ত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনের যদি কোনো অপপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলেও তার জন্য আইনটি বাতিল করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেন রাষ্ট্রের রয়েছে ৪টি মৌলিক কাঠামো। এগুলো হলো– (১) গণতান্ত্রিক চরিত্র (২) প্রজাতান্ত্রিক চরিত্র (৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং (৪) ক্ষমতার বিকেন্দ্রিককরণ। তার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এসব মৌলিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন, বিচার বিভাগকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের সাথে জড়িত, সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সাথে জড়িত নয়। ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পদে প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত না করাই ভাল । কারণ এরফলে বিচারপতিরা বিতর্কিত হয়ে যান। তার মতে, সাবেক প্রধান বিচারপতিদেরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে

www.pathagar.com

তারা একজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করবেন। ডঃ এম এ জহির বলেছেন, দেশের প্রধান দুটি জোটের ৫ জন করে সদস্য নিয়ে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। প্রধান দুটি জোটের ঐক্যমতের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। সাবেক বিচারপতি টি এইচ খান বলেন, সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ সংসদীয় কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আলোচনা এবং পর্যালোচনা করছে। এই বিশেষ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের এই শুনানি স্থগিত রাখা হোক। প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে ৭ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চে এই মামলাটির শুনানি করছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯৬ সালে ৩ জন আইনজীবী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট মামলা হাইকোর্টে দায়ের করেন। হাই কোর্টের রায়ে রিট মামলাটি খারিজ হয়ে যায় এবং বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা তথা ত্রয়োদশ সংশোধনী বৈধ এবং সংবিধানসম্মত আইন। এর বিরুদ্ধে তারা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেন। সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চে এখন এই আপীল মামলার শুনানি চলছে। বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর আমরা এখন কোনো মন্তব্য করব না। আমাদের প্রশ্ন হলো: তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে কি থাকবে না, সেটি ঠিক করবে কে? দেশের সুপ্রীম কোর্ট ? নাকি দেশের জনগণ ? এবং সেই সুবাদে দেশের পার্লামেন্ট? পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের সময় সুপ্রীম কোর্ট যুক্তি দেখিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জিয়া ছিলেন একজন সামরিক শাসক, তাই তিনি ছিলেন অবৈধ। তার একটি ফর্মান বলে যে, পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছিলো সেটিও ছিলো অবৈধ। সেই অবৈধ পার্লামেন্ট পঞ্চম সংশোধনী অনুমোদন করেছে। তাই এই অনুমোদনের কাজটিও অবৈধ। কিন্তু এই কথা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বেলায় খাটে না। একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট যথাযথ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুমোদন করেছে। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী ৩টি সরকার গঠিত হয়েছে। এমন কি বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফসল। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে রায় দেয়ার ক্ষমতা কি বিচার বিভাগ রাখে? এছাড়া পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধন কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভবিষ্যৎসহ নানা বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের কাজ করে যাচ্ছে। কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে ঐসব প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হবে। সেই অধিবেশনেই সংবিধান সংশোধনের বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে ফয়সালা হবে। তার আগে সুপ্রীম কোর্ট যদি কোনো রায় দিয়ে থাকে তাহলে পার্লামেন্টের আর করার কি থাকবে? বিচার বিভাগ কি এসব জ্বলন্ত ইস্যুগুলোর প্রতিটির সাথে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করবে?

রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে উচ্চ আদালতে গেলে সেগুলো ফেরৎ পাঠানোর নজির কিন্তু ভারতে রয়েছে। আমাদের উচ্চ আদালত কি ভারতের এই নজির অনুসরণ করতে পারে না? (ইতোমধ্যে কেয়ারটেকার বাতিল এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেছেন সুপ্রীমকোর্ট– লেখক)

www.pathagar.com

৪৩

বাকশাল প্রত্যাবর্তনের অশুভ পদধ্বনি

সংবিধান নিয়ে আ'লীগ সরকার কেন অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করছে সেটি জনসাধারণের কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। জনগণের মনে তাই ক্রমশঃ এই সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে যে আ'লীগ সরকার তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে দেশে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করতে চায়। মনে হচ্ছে তাদের সামনে রয়েছে একটি বিরাট নীলনকশা। বোঝা যাচ্ছে সেই নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য শেখ হাসিনার সরকার ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই ভয়ংকর পরিকল্পনা যদি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যায়, যদি সরকারের অশুভ উদ্দেশ্য বিনা চ্যালেঞ্জে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে মহাস্বৈরাচারের জগদ্দল পাথর চেপে বসবে বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনগণের বুকে। সেই জগদ্দল পাথর অপসারণের জন্যে জনগণকে রাজপথে নামতে হবে। এই সরকার যেরকম পরিকল্পিতভাবে অপ্রয়োজনে সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করছে সেগুলো দেখে রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহল ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছেন। তাদের আশঙ্কা, বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের লেবাস পরে আ'লীগ বাংলাদেশে পর্তুগালের সালাজার, স্পেনের ফ্রাংকো, ইটালির মুসোলীনি অথবা জার্মানির হিটলারি রাজত্ব কায়েম করতে চায়। তাই তারা আদালতের দোহাই পেড়ে একটির পর একটি সংশোধনী বাতিল করছে। এভাবে তারা সংবিধানকে কচুকাটা করছে। অথচ এসব সংশোধনী জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। যেভাবে একটির পর একটি সংশোধনীকে উচ্চ আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে খায়রুল হকদের মতো জো হুজুরদেরকে দিয়ে বাতিল করানো হচ্ছে, তার ফলে বাংলাদেশের ৪০ বছরের মধ্যে অন্তত ৩০ বছরের শাসন আমলই অবৈধ হয়ে গেছে। উচ্চ আদালতের এসব রায় যদি আক্ষরিক অর্থে কার্যকর হয় তাহলে সেদিন সুদূর নয় যেদিন ব্যাক হোলের মতো বাংলাদেশ সাংবিধানিক শূন্যতার বিশাল গহ্বরে পতিত হবে এবং অন্তহীন নৈরাজ্য দেশকে গ্রাস করবে।

কেয়ারটেকার অবৈধ হলে সব সরকারই অবৈধ

কেয়ারটেকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে সেই কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত সমস্ত সরকারই অবৈধ হয়ে যায়। সেই কেয়ারটেকার সরকার অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে শেখ হাসিনার আমলে জনাব খায়রুল হক হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। আবার ঐ কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাহলে তার নিয়োগও অবৈধ হয়। তার নিয়োগ যদি অবৈধ

www.pathagar.com

হয়ে থাকে তাহলে তার দেয়া সবগুলো রায় অবৈধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কাচের ঘরে বসে খায়রুল হক অন্যের কাচের প্রাসাদে ঢিল ছুঁড়ছেন

কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থার অধীনে যেসব নির্বাচন হয়েছে তার সবগুলোই অবৈধ। ঐসব ইলেকশনের মাধ্যমে যেসব সরকার গঠিত হয়েছে তার সবগুলো সরকারই অবৈধ। তাহলে ১৯৯৬ সালে গঠিত হাসিনার সরকার, ২০০১ সালে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার এবং ২০০৯ সালে গঠিত শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার-এই ৩টি সরকারই অবৈধ।

এই ৩টি সরকারের বৈধতা সম্পর্কে খায়রুল হক খামোশ মেরে গেছেন কেন? যদি ৭৫ থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বিরাজমান মোশতাক,সায়েম ও জিয়ার সরকার অবৈধ ঘোষিত হয় তাহলে '৯৬ সাল থেকে বর্তমান সাল পর্যন্ত এই ১৬ বছর ধরে বিস্তৃত ও বিরাজমান সবগুলো সরকার অবৈধ ঘোষিত হবে না কেন? এব্যাপারে খায়রুল হকের রহস্যময় নীরবতার মোজেজা কি?

এসব প্রশ্ন তুলেছেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল। পরে গত বৃহস্পতিবার ঐসব কথার প্রতিধ্বনি করেছেন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। এখন এই কথাগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করেছে আ'লীগ

জনাব খায়রুল হক সংবিধানের ১৪টি সংশোধনীর মধ্যে ৩টি সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সেই সুবাদে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়েছে। অবশিষ্ট রইল মাত্র ১১টি সংশোধনী। এরমধ্যে একটি সংশোধনী বেরুবাড়ীর ওপর। বেরুবাড়ী ছিলো বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে সেই বেরুবাড়ী নৈবদ্য হিসাবে ভারতের চরণতলে উপহার দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সংবিধানের কাটাছেঁড়াই করেননি, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশেরও কাটাছেঁড়া করেছেন। এরপরেও শেখ মুজিব আরেকটি সংশোধনী এনেছেন। সেটি হলো জরুরী অবস্থার বিধান। এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানই যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আরেকটি সংশোধনী এনেছেন। এরপর শেখ মুজিব যে সংশোধনীটি এনেছেন সেটি ইতিহাসের পাতায় কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনী হিসাবে কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শেখ মুজিব মাত্র ৩ বছর ৮ মাস সময়ে ৪টি সংশোধনী এনেছেন। এরমধ্যে ৪র্থ সংশোধনী মূল সংবিধানের একেবারে খোল-নলিচা পাল্টে দিয়েছিলো। আজ খায়রুল হক সংবিধানের মূল স্তম্ভ বলে তারস্বরে চিৎকার করছেন। কিন্তু কোথায় ছিলো তার সেই গলাবাজি যখন শেখ মুজিব বহুদলীয় গণতন্ত্রকে একদলীয় বাকশালের বোতলে পুরে সেই আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য সেজেছিলেন? খায়রুল হককে জবাব দিতে হবে, এক দলীয় বাকশাল কি

www.pathagar.com

সংবিধানের মূল স্তম্ভ? বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ২৪ বছর ধরে গণতান্ত্রিক পথে লড়াই করেছেন। সেখানে শেখ মুজিব ব্রুট মেজরিটির জোরে একদলীয় শাসন পদ্ধতি কায়েম করেছিলেন। উঠতে বসতে খায়রুল হক জেনারেল জিয়াউর রহমানের চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করেছেন। কিন্তু যখনই শেখ মুজিবের প্রশ্ন এলো তখন তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না কেন? সুতরাং ঐসব বড় বড় নীতিবাক্য তার মুখে শোভা পায় না।

কোন্ সংবিধানের সংশোধন হবে?

প্রথম কথা হলো, কোন্ সংবিধানটি সংশোধন করা হচ্ছে? আরো সরাসরি প্রশ্ন করতে হয়, বর্তমানে কোন্ সংবিধানের অধীনে দেশ চলছে? ১৪টি সংশোধনীসহ যে সংবিধান মানুষের কাছে আছে সেই সংবিধান? তখনতো বলা হবে ঐ সংবিধান থেকে ৫ম ও ৭ম সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে। ঐ দুটি সংশোধনী বাদ দিয়ে যে ১২টি সংশোধনী রইল সেই ১২টি সংশোধনী সম্বলিত সংবিধানটি এখন সংশোধিত হচ্ছে। ৫ম ও ৭ম সংশোধনীসহ সংবিধানে ছিলো ১৫৩টি অনুচ্ছেদ। ঐ দুটি সংশোধনী বাদ দেয়ার পর সংবিধানে এখন কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে? আমরা সেটা জানি না। কারণ, ঐ দুটি সংশোধনী বাদ দেয়ার পর অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি জনাব খায়রুল হকের নির্দেশের পর সংবিধানটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বলে শুনেছি। অথচ সাধারণ্যে ঐ সংবিধানের কপি বিলি করা হয় নি। বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেত্রী। তিনিও নতুন করে ছাপানো সংবিধানের কপি পাননি। তারপরেও বলব, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর সংবিধান যে নতুন চেহারা নিয়ে দেখা দেয়ার কথা সেখানে কি কোনো সংশোধন চলবে? আওয়ামী ঘরানা শুরু থেকেই তারস্বরে বলছেন সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেটি সকলকে মানতেই হবে। তাই যদি হয় তাহলে সংবিধানের আর কোন্ স্থানে সংশোধন করা হবে? সুপ্রীম কোর্টের ঐ রায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানার রাজনীতির গোড়া কেটে দিয়েছে। এটি তো ইসলামী এবং জাতীয়তাবাদী ঘরানার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ফিরে যাচ্ছি আগের কথায়। আসলে কোন্ সংবিধান দিয়ে দেশ চলছে? পত্র-পত্রিকায় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের একটি মন্তব্য পড়লাম। তিনি বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে সংবিধান নতুন করে ছাপা হয়েছে। এই নতুন করে ছাপানো সংবিধানের অধীনেই দেশ চলছে। এটি যদি সমগ্র আওয়ামী লীগের অবস্থান হতো তাহলে কোনো কথা ছিলো না। কিন্তু বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির মুখপাত্র হিসেবে বিরতিহীনভাবে বলে আসছেন যে, পুনঃমুদ্রিত সংবিধান আসলে সংবিধানের একটি খসড়া। খসড়া সংবিধান কি কোনো দিন চূড়ান্ত সংবিধান হতে

www.pathagar.com

পারে? আইনমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী এটি যদি চূড়ান্ত সংবিধানই হবে তাহলে সেই খসড়া নিয়ে এত লুকোচুরি চলছে কেন? বিরোধী দলের নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও বেগম জিয়া নিজেই যেখানে খসড়া সংবিধানের কপি পাননি সেখানে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে কপি পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কোন সংবিধানে দেশ চলছে?

এর আগেও আমরা সোনার বাংলায় এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলাম। আসলে কোন সংবিধানটি সংশোধন করা হচ্ছে। এর উত্তর হলো, যে সংবিধানটির অধীনে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, সেই সংবিধানটিরই সংশোধন করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে প্রশ্ন এসে যায়, কোন সংবিধানের অধীনে দেশ চলছে? পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক বলেছিলেন যে, রায় ঘোষণার সাথে সাথেই সেগুলো কার্যকর হয়েছে। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ একাধিকবার বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষণার পর দেশ ৭২-এর সংবিধানে ফিরে গেছে। যদি তাই হয় তাহলে সংবিধানের প্রথম ৩টি সংশোধনী কি বহাল আছে? এগুলো হলো– ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল আইন, জরুরী অবস্থা জারি এবং বেরুবাড়ি ভারতকে হস্তান্তর। ৭২-এর সংবিধানে ফিরে গেলে আলোচ্য সংশোধনীগুলো আর থাকেনা। এ ছাড়াও ৭২- এর সংবিধানে ফিরে গেলে ধরে নিতে হয় যে, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সব নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপর লিখিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শব্দগুলোও আর নেই। অথচ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও নিষিদ্ধ হয়নি এবং সংবিধানের প্রথম ৩টি সংশোধনীও বহাল আছে। সুতরাং ধারণা করা যাচ্ছে ৭২- এর সংবিধান এখনো কার্যকরী হয়নি। তাহলে কোন সংবিধান দিয়ে দেশ চলছে?

পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের পর সংবিধানের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে সেটি দিয়ে কি দেশ চলছে? খায়রুল হক সাহেব অবশ্য মন্তব্য করেছিলেন পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায়কে প্রতিস্থাপিত করে সংবিধান আবার ছাপাতে হবে।

সপ্তম সংশোধনী

এরপর হাইকোর্ট বাতিল করলেন সপ্তম সংশোধনী। এর বিরুদ্ধে আপীল করার পরেও আপীল বিভাগ হাইকোর্টের রায়টি বহাল রাখলেন। ফলে সংবিধান থেকে বাদ হয়ে গেল আরেকটি সংশোধনী। যুক্ত হলো সুপ্রীম কোর্টের আরেকটি রায়। এর আগে খায়রুল হক সাহেব বলেছিলেন পঞ্চম সংশোধনীকে প্রতিস্থাপিত করে সংবিধান পুনরায় ছাপতে হবে। সেই মোতাবেক ছাপার কাজ চলছিল। এখন এলো আবার সপ্তম সংশোধনী বাতিলের রায়। এটিও বাংলাদেশের সংবিধানে ছাপা হলো। তাহলে এটিই কি বাংলাদেশের সংবিধান? তেমন কথাই বললেন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক

www.pathagar.com

আহমেদ। কিন্তু বাদ সাধলেন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। তিনি বললেন, খসড়া সংবিধান বলে কিছু নেই। ঠিকই তো। সংবিধান আবার খসড়া হয় নাকি? তাহলে ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন: কোন সংবিধানের অধীনে চলছে দেশ?

ত্রয়োদশ সংশোধনী

এর মধ্যে এই সেদিন ঘোষিত হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার মামলার রায়। খায়রুল হকের ট্র্যাডিশন অনুসরণ করে ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বাতিল হলো। সুতরাং আইনগত পরিস্থিতি এখন এই যে, সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে আর কিছু নেই। সেই ব্যবস্থাকে বহাল রাখতে হলে আওয়ামী লীগকে নতুন করে জাতীয় সংসদে বিল পাস করতে হবে। তাহলে সুপ্রীম কোর্টের এই রায়টিও প্রতিস্থাপিত করে সংবিধান ছাপতে হবে। তাহলে কতবার করে সংবিধান ছাপতে হবে? এটি ছাপতে গেলে সংবিধানের করতে হবে তৃতীয় দফা পুনর্মুদ্রণ। এক কথায় বলা যায়, বাতিল আর সংশোধনীর ঠেলায় সংবিধান নিয়ে সরকার শুরু করেছে একটি তুঘলকি কারবার।

পঞ্চম সংশোধনীর পুনর্মূল্যায়ন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধানে প্রচুর সংশোধন রয়েছে এবং প্রচুর কাটা-ছেঁড়াও রয়েছে। এখন আর তারা কোথায়, কোন জায়গায় সংশোধন আনবেন? একটি জায়গা খালি আছে। সেটি হলো পঞ্চম সংশোধনীর পুনর্মূল্যান। পঞ্চম সংশোধনীর রিভিউ পিটিশনে খায়রুল হক সাহেবের আপীল বিভাগ যে রায় দিয়েছে তার ফলে বাকশাল ফিরে আসার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঐ রায়ে বলা হয়েছে পঞ্চম সংশোধনীতে যেসব বিষয়কে ইতিপূর্বে কন্ডোন বা মার্জনা করা হয়েছে, সেই মার্জনার সময়সীমা হলো ২০১২ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর। এই সময়ের মধ্যে যদি জাতীয় সংসদ অন্য কোনো রকম বিধান তৈরি না করে তাহলে পঞ্চম সংশোধনীর মার্জনা করা বিষয়গুলোও বাতিল হয়ে যাবে। এই মার্জনার অন্তর্ভুক্ত ছিল চতুর্থ সংশোধনী তথা বাকশাল প্রতিষ্ঠা। এখন জাতীয় সংসদ যদি অন্য কোন আইন প্রণয়ন না করেন তাহলে আবার ফিরে আসবে একদলীয় বাকশাল পদ্ধতি ।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? যা করবার আওয়ামী লীগতো সেটি আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখেই করেছে। এখন অবশিষ্ট থাকলো :

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা ঘোষণা,
২. শেখ মুজিবকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে ঘোষণা এবং
৩. বাকশালের পুনরুজ্জীবন।

শেখ হাসিনা কি ঠাণ্ডা মাথায় সেই দিকেই এগিয়ে চলেছেন?

www.pathagar.com

৪৪

সংবিধান সংশোধন : এক দলীয় শাসন কায়েমের চক্রান্ত

সরকারীভাবে প্রচার করা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে এসব সংশোধনী সম্বলিত একটি বিল উত্থাপন করা হবে। তার আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সাথে অতিসম্প্রতি ৩ দিন ধরে টানা বৈঠক করেছেন। আলোচ্য সংসদীয় কমিটি বিগত মাসগুলোতে অনেক বৈঠক করেছেন, ঐসব বৈঠকে সংবিধান সংশোধনের অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছে। ঐসব সুপারিশ তারা সেদিন প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। এখন বলা হচ্ছে সংবিধান সংশোধনের বেলায় বৃহত্তর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের সাথেও নাকি আলোচনা করা হবে। এজন্য তাদের সাথে বৈঠকে বসবে ঐ কমিটি। বিএনপি বা অন্যান্য বিরোধী দলের কাছে বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বিশেষ সংসদীয় কমিটির তরফ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো চিঠি পৌঁছেনি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব এম কে আনোয়ার বলেছেন এই বিশেষ কমিটি অবৈধ। তাই সেই বিশেষ কমিটির বৈঠকে যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তী খবরে জানা গেলো, বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে বিএনপির কতগুলো জিজ্ঞাস্য রয়েছে। কমিটির চিঠি পেলে বিএনপির তরফ থেকে তার উত্তর দেয়া হবে। বিএনপির সেই চিঠিতে জানতে চাওয়া হবে সংবিধানের কোন্ কোন্ জায়গায় অর্থাৎ কোন্ কোন্ অনুচ্ছেদে সরকার সংশোধন চাচ্ছে। এপর্যন্ত সংবিধানের কোন্ কোন্ স্থানে সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। এসব প্রশ্নের সদুত্তর এবং সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বিএনপি এই বৈঠক সম্পর্কে আগাম কিছুই বলবে না।

কোন সংবিধান এখন চালু আছে ?

পত্রপত্রিকায় বিএনপির নাম করে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে সেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার আগে আরেকটি বিষয় খোলাসা করার দাবি রাখে। সেটি হলো, দেশ এখন কোন সংবিধানের অধীনে চলছে? সরকারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিদের কথাবার্তার পর ধারণা করা যায় দেশ চলছে একযোগে ৩টি সংবিধানের অধীনে। এই ৩টি সংবিধান হলো : (১) ১৯৭২ সালের সংবিধান (২) পরবর্তীতে ১৪টি সংশোধনী সম্বলিত সংবিধান (৩) ৫ম ও ৭ম সংশোধনী বাতিল সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের রায় সম্বলিত সংবিধান। এই ৩টি সংবিধানের মধ্যে কোন সংবিধানের অধীনে দেশ পরিচালিত হচ্ছে? একটি দেশে একই সময় যুগপৎ ৩টি

www.pathagar.com

সংবিধান বলবৎ থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশে সেটিও সম্ভব হচ্ছে। এখন সুরঞ্জিত বাবুর বিশেষ কমিটি কোন সংবিধানের ওপর সংশোধনী আনতে যাচ্ছেন? আদি সংবিধান তথা ৭২ এর সংবিধান? সেই প্রশ্ন ওঠে না। কখনও তারা বলছেন তারা ৭২-এর সংবিধানে ফিরে যেতে চান। তার সহজ সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের কাজটি এখনও অসমাপ্ত রয়েছে।

তাহলে কি সংশোধিত সংবিধান?

তাহলে কি বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে সংশোধিত সংবিধানের অধীনে? সংশোধিত সংবিধান বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই সংবিধান যেটি বাংলাদেশের সর্বত্র কিনতে পাওয়া যায়। 'সংশোধিত সংবিধান' নামটি ইংরেজি ভাষায় বলতে গেলে একটি 'মিসনোমার'। কারণ সংবিধান কোনোদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। যুগের পর যুগ চলে যায়। কিন্তু দেশ ও জাতি বেঁচে থাকে। সেই সাথে বেঁচে থাকে সংবিধান। সময়ের প্রয়োজনে, যুগের চাহিদা মেটানোর জন্য সংবিধানে মাঝে মাঝে সংশোধনী আনতে হয়। আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশেও সংশোধনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংবিধানিক শাসন এগিয়ে চলেছে। সংশোধন একটি হোক আর ১০টি হোক, সেটিও সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৪টি সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারপরেও কিন্তু এতদিন মানুষ বলতেন বাংলাদেশের সংবিধান। শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকার এসে সারা দেশে যেমন এঁকে দিয়েছে বিভাজন রেখা, তেমনি সংবিধানেও বসিয়েছে একটি পার্টিশন। সেটি হলো আদি সংবিধান আর জিয়াউর রহমানের সংবিধান। সেজন্যই বলছিলাম যে, কোন্ সংবিধানের ওপর তারা সংশোধনী আনতে চান? অতীতে সংবিধানের সংশোধন হয়েছে ১৪ বার। একমাত্র চতুর্থ সংশোধনী ছাড়া এবারের মত হাঁকডাক করে কোনোদিন সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তাহলে কি ১৪টি সংশোধনী সম্বলিত সংবিধানে তারা সংশোধনী আনতে চান? এই সংবিধানে সবচেয়ে বড় সংশোধনী তো এনেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। একেবারে সংবিধানের খোল-নলিচাই তারা পাল্টে দিয়েছেন। সেখানে আর কত কাটাছেঁড়া করবেন তারা?

তাহলে কি খসড়া সংবিধান?

তাহলে কি তারা খসড়া সংবিধানের ওপর সংশোধনী আনবেন? সংবিধান তো কোনোদিন খসড়া হয় না। তাহলে 'খসড়া সংবিধান' নামক এই পরিভাষাটি এলো কোত্থেকে? কিভাবে আসলো? এই পরিভাষাটিও আমদানী করেছেন দু'একজন মন্ত্রী এবং সর্বঘটের বেলপাতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। এটির উৎপত্তি স্থান হলো দেশের সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

আদালত, অর্থাৎ হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগ। ৫ম সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ যেদিন চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে, তার পরদিন প্রধান বিচারপতি জনাব এবিএম খায়রুল হক একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, যেদিন ৫ম সংশোধনী সম্পর্কে আপীল বিভাগের রায় ঘোষিত হয়েছে সেদিন থেকেই সেটি কার্যকর হয়েছে। এটি জাতীয় সংসদে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এখন যেটি দরকার সেটি হলো, আপীল বিভাগের সংশ্লিষ্ট অংশ সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা। সেজন্য সংবিধান আবার ছাপতে হবে। সরকার ছাপাক বা না ছাপাক, আপীল বিভাগের রায় সম্বলিত সংবিধান ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। শুধুমাত্র জনাব খায়রুল হকই নন, বোরকা পরিধান সম্পর্কিত একটি মামলার রায় ঘোষণাকালে হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ ঘোষণা করেছেন যে, যেদিন থেকে ৫ম সংশোধনী বাতিল হয়েছে সেই দিন থেকেই বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

যাইহোক, জনাব খায়রুল হকের এই বক্তব্যের পর সরকার সংবিধান ছাপতে দেয়। কিন্তু সেই মুদ্রিত সংবিধানের কপি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছেন যে ৬০ কপি ছাপা হয়েছে, কেউ বলছেন ২০০ কপি, কেউ বলছেন ৩০০ কপি, আবার কেউ বলছেন ৫০০ কপি। যে কয় কপিই ছাপানো হোকনা কেন, এসম্পর্কে গত মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় অত্যন্ত ফলাও করে একটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির শিরোনাম, "সংবিধানের পুনর্মুদ্রিত কপি গায়েব।"

ইত্তেফাকের ঐ রিপোর্টে বলা হয়,"গায়েব হয়ে গেছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গ্রন্থ-সংবিধান। দেশের কোথাও সংবিধানের মুদ্রিত কোনো কপি পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারে যেসব সংবিধান আছে, আপীল বিভাগের রায় অনুযায়ী সেগুলো এখন অচল। আইন বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করেছেন, ছাপার পর মুদ্রিত সংবিধানটি গায়েব হয়ে গেছে এবং তা রাষ্ট্রের গোপন দলিলে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী লিখিতভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে চেয়েও সংবিধানের কপি পান নি। সংবিধান বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য ডঃ এম জহির বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয় আপীল বিভাগের রায়ের নামে ইচ্ছামত সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করেছে। কমিটির সদস্য হলেও পুনর্মুদ্রিত সংবিধানের একটি কপিও আমাকে দেয়া হয়নি। জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য, এমনকি সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিচারককেও সংবিধানের কপি সরবরাহ করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে বিরোধী দল বিএনপি দাবি করেছে যে, দেশে বর্তমানে কোনো সংবিধান নেই এবং সাংবিধানিক শূন্যতা চলছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ শাহদীন মালিক বলেন, গত ৪০ বছরে সংবিধান সংশোধনের যে ইতিহাস তা স্বপ্ন ও আদর্শের বিচ্যুতির ইতিহাস। তিনি বলেন, ৫০০ কপি ছাপা হয়েছে। কিন্তু

www.pathagar.com

ছাপানোর পর মুদ্রিত সংবিধানটি গায়েব হয়ে গেছে এবং তা রাষ্ট্রের গোপন দলিলে পরিণত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে মুদ্রিত সংবিধানটিতে রহস্যময় কিছু রয়েছে অথবা ছাপাতে কোনো ভুল হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মূল সংবিধানের ৮টি অনুচ্ছেদসহ এ সংক্রান্ত কিছু বিষয় পুনর্বহালের কথা থাকলেও আইন মন্ত্রণালয় প্রায় ৭০টি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ডঃ শাহদীন মালিক বলেন, বই আকারে সংবিধান পুনর্মুদ্রণ করে বিষয়টিকে আরো জটিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, সুপ্রীমকোর্ট সংবিধান বা আইনের যে কোনো অংশ অসাংবিধানিক বা বেআইনী ঘোষণা করতে পারেন। তবে বেআইনী ঘোষিত অংশের জায়গায় কি প্রতিস্থাপিত হবে সেটা সম্পূর্ণ সংসদের এখতিয়ার।

সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ দাবি করেন, "পুনর্মুদ্রিত সংবিধানের কোনো ভিত্তি নেই। সুপ্রীম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে যেসব সংযোজন,সংশোধন ও পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে এটা বেআইনী ও সংবিধান পরিপন্থী। সুতরাং সুপ্রীমকোর্টের উচিত আইন মন্ত্রণালয়কে তলব করা ও এর সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।"

গায়েব হোক আর যাইহোক, আসল কথা হলো মুদ্রিত সংবিধানের কোনো কপি আমার/আপনার কাছে নেই।

তাহলে দেশ কি সংবিধান শূন্য?

আসলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা সেই রকমেরই। এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হলো, যেসব তথ্য পেশ করা হলো,সেসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় সংবিধান সংশোধনের নামে সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়েছেন। এখন সুরঞ্জিত বাবুরাই বলুন, কোথা থেকে তারা শুরু করবেন? সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর, সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী ঐ রায়ে কোনো হাত দেয়া যাবে না। তাহলে কোথায় হাত দেয়া যাবে? ঐদিকে সরকারই আবার ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় রিভিউ করার জন্য আবেদন করেছেন। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেছেন সরকার সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন জানাবেন ৫ম সংশোধনীর যেসব ধারা সুপ্রীমকোর্ট মার্জনা করেছেন,অর্থাৎ বহাল রেখেছেন, সেই মার্জনা যেন প্রত্যাহার করা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় ৫ম সংশোধনীতে যে প্রায় অর্ধশত অনুচ্ছেদ ছিলো সেগুলোর সর্বোচ্চ ১০টি বাতিল হয়েছে। অবশিষ্ট সবগুলো বহাল রয়েছে। যেগুলো বহাল রয়েছে তার মধ্যে ৪র্থ সংশোধনী অর্থাৎ বাকশাল কায়েম অন্যতম। এখন যদি বাকশাল বাতিলের সংশোধনী প্রত্যাহার করা হয় তাহলে বাকশাল ফেরৎ আসে। তাহলে কি এই সরকার পরোক্ষভাবে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায়? সুতরাং রিভিউ পিটিশনের ওপর সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশ আসার আগে সংবিধানের সংশোধন হবে কোন্ জায়গায়?

www.pathagar.com

সংসদের মাধ্যমে সব কিছু বাতিল করা হবে

৫ম সংশোধনী সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে সেটি আওয়ামী লীগ ও বাম পন্থীরা ছাড়া বিএনপি ও জামায়াতসহ দেশের আর কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঐ রায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শের ভিত্তিমূলে অর্থাৎ তাদের শিকড়ে কুঠারাঘাত করেছে। তাই এটি কোনো অবস্থাতেই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই তাদের রাজনৈতিক আদর্শ সংবিধানে প্রতিফলিত হবে। আওয়ামী লীগের মত দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলো হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টকে ব্যবহার করবে না। বিএনপি জামায়াতসহ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানা প্রয়োজন হলে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলবে রাজনৈতিক আদর্শিক বিরোধের ফয়সালা করার জায়গা উচ্চ আদালত নয়।

কোথায় হবে ঐকমত্য?

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বেগম জিয়া যদি সংবিধান সংশোধনের কমিটির সভায় যেতেন তাহলে এসব কথাই বলে আসতেন। সেই কথাগুলো কি আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? অনুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানার তরফ থেকে বেগম জিয়া বলতেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং মুসলিম জাহানের সাথে ঐক্যের অনুচ্ছেদগুলো তারা ফিরিয়ে আনবেন। আওয়ামী লীগ কি সেসবে রাজি হবে? যদি রাজি না হয় তাহলে আলোচনা করে লাভ কি? ৫ম সংশোধনীর রায়ে তো স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজনের কথা বলা হয়নি। তাহলে পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে সেই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত হলো কিভাবে? ৫ম সংশোধনী বহাল রাখলেও শেখ মুজিব জাতির পিতা হচ্ছেন না, আর বাতিল হলেও সেই ব্যবস্থা নেই।

এসব কারণে তাই স্পষ্ট বলতে হয় যে, আওয়ামী লীগ তার দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, আর সেই বৈঠকে যোগদানের নামে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানাকে তাদের পাতা ফাঁদে ফেলবে, সেই ফাঁদে পা দেয়ার মত বেওকুফ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঘরানা নয়।

www.pathagar.com

৪৫

কেয়ারটেকার বাতিল

আ'লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন, সংসদে ফেরার সব পথ রুদ্ধ

এতদিন পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল-দেশ কোন সংবিধানের অধীনে চলছে? কারণ ধারণা ছিল দেশ সংবিধান শূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের দোহাই পেড়ে এবং সংবিধানের কোনো কোনো ধারাকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে সংবিধানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুচ্ছেদকে বাদ দেয়া হয়েছে। এই ধারাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত। এই ধারাটি সংবিধান থেকে বাতিল করার পেছনে রয়েছে একটি গভীর দূরভিসন্ধি। সেটি হল, গত বছরের জানুয়ারী মাসে শেখ হাসিনা যখন ভারত সফর করেন তখন ভারতের সাথে তিনি ৫০ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে ভারতকে করিডোর দেয়া, মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দেয়া প্রভৃতি উল্লেখ ছিল। সংবিধান মোতাবেক বিদেশী রাস্টের সাথে সম্পাদিত কোনো চুক্তি জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে। এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেটি পাস হবে অথবা বাতিল হবে। দেড় বছর হয়ে গেল ভারতের সাথে সম্পাদিত আলোচ্য ৫০ দফা চুক্তি শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে পেশ করেননি। সচেতন জনগণ বিশেষ করে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এখন সন্দেহ করছেন ঐ চুক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদ অথবা স্তবক সন্নিবেশিত রয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

ইত্তেফাকের রিপোর্ট

এ সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে দেশের প্রাচীনতম দৈনিক ইত্তেফাকে। গত ৩১ শে মে মঙ্গলবার দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় রঙ্গ আইটেম হিসেবে প্রকাশিত ঐ খবরে বলা হয়েছে ৫ম সংবিধান পুনর্মুদ্রণ নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুরতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে পেশ করার যে বিধান ছিল, চাতুরতার মাধ্যমে সংবিধান থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উত্থাপনের বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের রায়ে কোথাও সংবিধানের ১৪৫ ক অনুচ্ছেদ পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন বা বিলুপ্তের নির্দেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু মুদ্রিত সংবিধানে ১৪৫ ক-এর স্থলে ১৪৫(২) অনুচ্ছেদটি ৭২ সালের সংবিধানে যেভাবে ছিল সেভাবে ফেরত নিয়ে আসা হয়েছে। তবে শর্তাংশটি রেখে দেয়া হয়েছে, পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে যা সংযোজিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, পঞ্চম সংশোধনীতে ১৪৫ ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, বিদেশের

www.pathagar.com

সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। শর্তাংশে উল্লেখ রয়েছে 'তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে শর্তাংশটি হুবহু রেখে দিলেও মূল অনুচ্ছেদ থেকে 'এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন' এই অংশটুকু বুদ্ধিবৃত্তিক চাতুরতার মাধ্যমে বাদ দেয়া হয়েছে। পুনর্মুদ্রিত সংবিধানে ১৪৫ ক অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ১৪৫ (১) ও (২) অনুচ্ছেদটি। এতে উল্লেখ রয়েছে ১৪৫ (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে। ১৪৫ (২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না। তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ হইবে। এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাড়া বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে পেশ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ওপর বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। যদিও ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশ-বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সংসদে উপস্থাপন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে উত্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের সংবিধান অলিখিত হলেও বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সংসদে উত্থাপনের রেওয়াজ রয়েছে।

বিশেষ কমিটি ঠুটো জগন্নাথ প্রধানমন্ত্রীর ইয়েস ম্যান

সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর খসড়া রচনার জন্য চলতি বছরের একেবারের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরী। কো-চেয়ারম্যান হলেন বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। কমিটি এ পর্যন্ত ডজন ডজন বৈঠক করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তার নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক, বিচারক, আইনজীবী প্রমুখের বক্তব্য তৈরি শুনেছেন এবং জাতীয় সংসদের বর্তমান অধিবেশনেই রিপোর্টটি সংশোধনী প্রস্তাব আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হওয়ার কথা রয়েছে। ঠিক এটিই যখন সর্বশেষ অবস্থা তখন কমিটি সোমবার ৩০ শে মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করেন। গত ৩১শে মে মঙ্গলবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রধান সংবাদ হিসেবে ফলাও করে ছাপা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর বহাল রাখতে রাজি

www.pathagar.com

নন। জাতীয় সংসদ ইচ্ছা করলে আগামী দুইটি মেয়াদের নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে বলে সুপ্রীম কোর্ট যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে সেই পর্যবেক্ষণকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাকি মোটেই আমলে নেননি। তিনি নাকি কমিটিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সুপ্রীম কোর্ট যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তাই তিনি ঐ অবৈধ ব্যবস্থা আর বহাল রাখতে রাজি নন। ফলে কমিটি এখন শেখ হাসিনার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী ইতোমধ্যেই তাদের প্রণীত সুপারিশমালা সংশোধন করছে। এখন সংশোধিত সুপারিশ মোতাবেক দেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে এই সরকার পদত্যাগ করবে। তবে পদত্যাগ করলেও পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত বর্তমান সরকার অর্থাৎ শেখ হাসিনার সরকার ইস্টারিম সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে কাজ করবেন।

সংসদীয় স্বৈরতন্ত্রের উৎকট বহিপ্রকাশ

গত মঙ্গলবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বাতিলের সংবাদ পাঠ করার পর রাজনীতি সচেতন জনগণ এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা প্রশ্ন করেন, সুরঞ্জিত বাবুর বিশেষ কমিটি কি তাহলে ঠুটো জগন্নাথ? তারা কি সকলে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষী গোপাল? দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের এবং মন্ত্রী পরিষদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একই ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা যখন সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন ছিল তখন মাননীয় আদালত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ১০ জন এমিকাস কিউরী বা আদালত বান্ধব আইনজীবী প্যানেল নিযুক্ত করেন। ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার এম এ জহির, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডঃ কামাল হোসেন, এডভোকেট টি এইচ খান, বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী, ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসিসহ দেশের ১০ জন নামজাদা আইনজীবী তাদের মতামত প্রদান করেন। এই ১০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন ছাড়া বাকি ৯ জন আইনজীবীই কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষে বলিষ্ঠ মতামত দেন। এই ৯ জন আইনজীবীর মতামতের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুরঞ্জিত বাবুর কমিটি এখন ফালতু হয়ে গেল। তার কমিটিও স্বাধীন মতামত দেয়ার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত আহবান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, শীর্ষ আইনজীবী, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক বৃন্দ। সকলেই কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে অভিন্ন মতামত প্রদান করেন।

হয়তো কেউ কেউ কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পরেও যুগের প্রয়োজন মোতাবেক সেটি কিছুটা সংস্কারের সুপারিশ করেন। এসব সুপারিশ নিয়ে কমিটি যখন

www.pathagar.com

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসে তখন প্রধানমন্ত্রী তুড়ি মেরে ঐসব সুপারিশ এবং মতামত নাকচ করেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে- তাহলে ঢোলমহরত বাজিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবী আইনজীবী, সাংবাদিক প্রমুখের মতামত নেয়ার এই প্রহসন করা হলো কেন? বিভিন্ন স্তরের জনগণের মতামত নেয়ার নাটকে মহড়া দেয়া হলো কেন?

এক ব্যক্তির মতামতের প্রাধান্য : আরো নজির

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় বিগত সোমবারের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র কেয়ারটেকার ব্যবস্থা বহাল রাখার প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেননি, তিনি সুরঞ্জিত কমিটির আরো অনেক সুপারিশই প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরমধ্যে একটি হলো ৭০ ধারা। অথচ এই প্রধানমন্ত্রীই গত ২৭ এপ্রিল কমিটিকে বলেছিলেন কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ হবে ৩ মাস অর্থাৎ ৯০ দিন। তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন সরকার ও বিরোধীদল থেকে ৫ জন করে নিয়ে ১০ জনের কেয়ারটেকার সরকার হতে পারে। বিকল্প হিসাবে সবদলের প্রতিনিধি নিয়েও গঠিত হতে পারে। সুরঞ্জিত বাবু সুপারিশ করেছিল সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশ মোতাবেক উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে ইমপিচ বা অভিশংসন করতে পারবে জাতীয় সংসদ। কিন্তু শেখ হাসিনা সেই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে, সেই ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে রাখার সুপারিশ করেছেন।

জাতীয় সংসদে ফিরে যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ

এই পটভূমিতে বিএনপি এবং জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফরে তিনি বলেছেন খায়রুল হককে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মানবে না বিএনপি। আর আওয়ামী লীগের অধীনেও নির্বাচন করবে না বিএনপি। এজন্য যত আন্দোলন করা প্রয়োজন বিএনপি তত আন্দোলন করবে। গত সোমবার শেখ হাসিনার সাথে সুরঞ্জিত কোম্পানির বৈঠকের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে সেই পটভূমিতে বেগম জিয়াকে একজন দূরদর্শী রাজনীতিক বললে অযুক্তি হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, বিএনপি জাতীয় সংসদে যাবে কিনা। আওয়ামী লীগের স্বভাবই হলো, 'বিচার মানি তবে তালগাছটি আমার'। এখন বিএনপিকে সংসদে ডেকে নিয়ে বক্তব্য রাখার হয়তো ঠিকই সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু সব কিছুর পর বিএনপির বক্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিন-চতুর্থাংশ ব্রুট মেজরিটি দিয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের বিল পাস করিয়ে নেবেন। এমন একটি রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্টে আরেকটি রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বিএনপি কোন অবস্থাতেই পার্লামেন্টে আর ফেরৎ যেতে পারে না।

www.pathagar.com

৪৬

কেয়ারটেকার রায় : প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেবে

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা সম্পর্কে গত মঙ্গলবার সুপ্রীম কোর্টের ফুলবেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যে রায় দিয়েছে তার ফলে 'প্যান্ডোরার বাক্স' উন্মোচিত হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন। ঐ রায়ে বলা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্বলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধান পরিপন্থী। তাই সেটি বাতিল করা হলো। তবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দশম সংসদ নির্বাচন অর্থাৎ আগামী নির্বাচন এবং একাদশ সংসদ নির্বাচন অর্থাৎ পরবর্তী সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত্তিতেই হতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিফলন দেখা গেলো মঙ্গলবার রাতের বিভিন্ন টেলিভিশন 'টকশোতে'। দেশের এতগুলো প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে মাত্র ৩/৪টি চ্যানেল বাদে অবশিষ্ট সবগুলো চ্যানেলের আলোচকবৃন্দ এই রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রায় সমস্ত আলোচক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এই রায় চরমভাবে স্ববিরোধী। একদিকে ত্রয়োদশ সংশোধনী তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ ও বাতিল বলে তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করা হলো, অন্যদিকে আবার একই নিঃশ্বাসে সেই অবৈধ, বেআইনী ও বাতিল ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন করা যেতে পারে বলে রায় দেয়া হলো। উল্লেখ করা যেতে পারে, সুপ্রীম কোর্টের এই রায় সর্বসম্মত নয়। তবে আপীল বিভাগের কোন্ কোন্ বিচারপতি এই রায়ের সাথে একমত হননি সেটি গত মঙ্গলবারের সংক্ষিপ্ত রায়ে জানা যায়নি। পূর্ণ রায়ে হয়ত সেটি জানা যেতে পারে।

জনগণের ইচ্ছা সংবিধান বিরোধী হয় কিভাবে?

এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল মঙ্গলবার রাতে চ্যানেল আই-এর সাথে সাক্ষাৎকারে কয়েকটি জ্বলন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন জনগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সেদিন রাজপথে নেমেছিলেন। জনগণের দাবিতে প্রচণ্ড গণআন্দোলনের মুখে সেদিন একটি নির্বাচন দেয়া হয় এবং সেই নির্বাচনে জনগণের দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হয় এবং এটি ত্রয়োদশ সংশোধনী হিসাবে দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ড. আসিফ নজরুলের মতে সংবিধানের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে জনগণকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন সম্বলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধান বিরোধী হয়

www.pathagar.com

কিভাবে? তিনি প্রশ্ন রাখেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি অবৈধ হয় তাহলে এই সরকারের অধীনে অতীতে তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই নির্বাচন মোতাবেক ৩টি সরকার গঠিত হয়েছে । তাহলে বেগম জিয়ার সরকার এবং শেখ হাসিনার সরকারও যেহেতু কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, তাই শেখ হাসিনার বর্তমান সরকারসহ তার ২টি সরকার এবং বেগম জিয়ার একটি সরকার অবৈধ হয়ে যায়।

আরো পেছনে গেলে অবস্থা ভয়াবহ হয়ে পড়ে

ড. আসিফ নজরুল বলেন, সুপ্রীম কোর্টের এই রায় মানলে ৭২-এর সংবিধানও প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়েছিলো পাকিস্তানের সংবিধান রচনা এবং পাকিস্তানের সরকার গঠনের জন্য। সেদিন যারা পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তারা তো নির্বাচিত হয়েছিলেন পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণপরিষদ গঠিত হওয়া উচিত ছিলো ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো মার্শালিল'-এর অধীনে । তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সামরিক আইন বিধির অধীনে জেনারেল ইয়াহিয়া খান Legal Framework Order বা এলএফও জারী করেন। সেই এলএফওর অধীনেই নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। জনাব খায়রুল হকের রায় মোতাবেক সব মার্শাল ল'ই অবৈধ এবং মার্শালিল'-এর অধীনে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনই অবৈধ।

কিন্তু এভাবে শুধুমাত্র আইনের নিরিখে সব বিচার করলে চলবে না। কারণ জনাব খায়রুল হকের বিচারে শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনও অবৈধ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এগুলোকে অবৈধ বলা কি সম্ভব?

তাহলে ৫ম সংশোধনীর বেলায় প্রযোজ্য হবে না কেন?

কেয়ারটেকার সরকার সংক্রান্ত রায়ের একস্থানে বলা হয়েছে সংসদ চাইলে আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট কেয়ারটেকার ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারে। গত মঙ্গলবারের টকশোতে একাধিক আলোচক বলেছেন কেয়ারটেকার সরকারের ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা যদি সুপ্রীম কোর্ট পার্লামেন্টকে দিতে পারে তাহলে ৫ম সংশোধনী রায়ের বেলায় চূড়ান্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি কেন?

এক যাত্রায় কি দুই ফল হয়? নাকি একই গাছে পান এবং সুপারি দুটোই উৎপন্ন হয়?

www.pathagar.com

(৪৭)

ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ হলে খায়রুল হকের নিয়োগ এবং সব রায় অবৈধ

আওয়ামী ঘরানার তরফ থেকে যতই বলা হোক না কেন সংবিধানের কাটাছেঁড়া করেছেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান, কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সংবিধানের শুধু কাটাছেঁড়াই নয়, সংবিধানকে রীতিমত শেষ করে দিয়েছেন সদ্যবিদায়ী প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক। এটি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, জনাব খায়রুল হক সংবিধানের ১৪টি সংশোধনীর মধ্যে ৩টি সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সেই সুবাদে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়েছে। অবশিষ্ট রইল মাত্র ১১টি সংশোধনী। এরমধ্যে আবার একটি সংশোধনী বেরুবাড়ীর ওপর। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে বেরুবাড়ী যেখানে ছিলো বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেখানে সেই বেরুবাড়ী নৈবদ্য হিসাবে ভারতের চরণতলে উপহার দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সংবিধানের কাটা-ছেঁড়াই করেননি, আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশেরও কাটা-ছেঁড়া করেছেন। এরপরেও শেখ মুজিব আরেকটি সংশোধনী এনেছেন। সেটি হলো জরুরী অবস্থার বিধান। এছাড়া শেখ মুজিবুর রহমানই যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আরেকটি সংশোধনী এনেছেন। এরপর শেখ মুজিব যে সংশোধনীটি এনেছেন সেটি ইতিহাসের পাতায় কুখ্যাত চতুর্থ সংশোধনী হিসাবে কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শেখ মুজিব মাত্র ৩ বছর ৮ মাস সময়ে ৪টি সংশোধনী এনেছেন। এরমধ্যে ৪র্থ সংশোধনী মূল সংবিধানের একেবারে খোল-নলিচা পাল্টে দিয়েছিলো। আজ খায়রুল হক সংবিধানের মূল স্তম্ভ বলে তারস্বরে চিৎকার করছেন। কিন্তু কোথায় ছিলো তার সেই গলাবাজি যখন শেখ মুজিব বহু দলীয় গণতন্ত্রকে এক দলীয় বাকশালের বোতলে পুরে সেই আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য সেজেছিলেন? খায়রুল হককে জবাব দিতে হবে, এক দলীয় বাকশাল কি সংবিধানের মূল স্তম্ভ? বহু দলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ২৪ বছর ধরে গণতান্ত্রিক পথে লড়াই করেছেন। সেখানে শেখ মুজিব ব্রুট মেজরিটির জোরে এক দলীয় শাসন পদ্ধতি কায়েম করেছিলেন। উঠতে বসতে খায়রুল হক জেনারেল জিয়াউর রহমানের চৌদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করেছেন। কিন্তু যখনই শেখ মুজিবের প্রশ্ন এলো তখন তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না কেন? সুতরাং ঐসব বড় বড় নীতিবাক্য তার মুখে শোভা পায় না।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, ৪র্থ সংশোধনীর ব্যাপারে তিনি এমন রহস্যময় নীরবতা অবলম্বন করলেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল- এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। তার এ বক্তব্যও সঠিক নয়। এর কারণসমূহ হচ্ছে–

১. ৫ম সংশোধনী বাতিল করতে গিয়ে তিনি খন্দকার মোশতাকের শাসনামল, জাস্টিস সায়েমের শাসনামল এবং জেনারেল জিয়ার শাসনামলকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কারণ ঐ ৩ জনের শাসনামল ৫ম সংশোধনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাহলে যে দিন শেখ সাহেব ৪র্থ সংশোধনী কার্যকর করেন সেদিন থেকে তার অবশিষ্ট সময়কাল, অর্থাৎ পরবর্তী ৮ মাসের শাসনামল অবৈধ ঘোষিত হয়নি কেন?

২. যদি ৫ম সংশোধনী বাতিল হয়ে থাকে তাহলে ৪র্থ সংশোধনী ফিরে এলো না কেন? ৫ম সংশোধনী বাতিল করে খায়রুল হক ফিরিয়ে এনেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মতো বস্তাপচা, সময়ের কষ্টিপাথরে অচল মাল। তাহলে সেই একই ফর্মুলায় ফিরিয়ে আনলেন না কেন বাকশালের মতো মহাস্বৈরাচারী ব্যবস্থা? বাকশাল বাতিল করে জেনারেল জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বাকশাল বাতিলের এই কাজটিকে খায়রুল হক বড়ই 'দয়াপরবশে' কন্ডোন বা 'মার্জনা' করেছেন। তার কাছ থেকে মার্জনা কে চেয়েছিলো? আর সেই তথাকথিত মার্জনা করার ক্ষমতাই বা তাকে কে দিয়েছে? সংবিধান তো তাকে মার্জনা করার সেই ক্ষমতা দেয় নি। আসলে খায়রুল হকের কাছে ছিলো 'গরজ বড় বালাই'। তার গরজ ছিলো ২টি। একটি হলো, তার নেতা শেখ মুজিবের ভুলত্রুটি এবং ঘাটতিগুলো আড়াল করা। দ্বিতীয়টি হলো, তার নেত্রী শেখ হাসিনার নেক নজর আকর্ষণ করা, যাতে করে তিনি একদিন প্রধান বিচারপতির ঐ লোভনীয় গদিটি দখল করতে পারেন। স্বীকার করতেই হবে যে, খায়রুল হক একজন 'সফল মানুষ'। তিনি মুজিবের ডার্ক সাইডগুলো আড়াল করতে পেরেছেন। অন্যদিকে প্রধান বিচারপতির কুর্সীটিও কব্জা করেছেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ নামক আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির বারটা বাজিয়ে ছেড়েছেন।

দুই

জনাব খায়রুল হকের কীর্তিগুলো তালিকাভুক্ত করতে হলে আরো দুটি সংশোধনী বাতিলের কথা উল্লেখ করতে হয়। নিচে সেগুলো উল্লেখ করছি।

৩. জনাব খায়রুল হক ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। সেই সুবাদে সেটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে তিনি আবার একটি লেজ লাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন সংসদ যদি চায় তাহলে আগামী ২টি মেয়াদের নির্বাচন কেয়ারটেকার ব্যবস্থার অধীনে হতে পারে। তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা অবৈধ

www.pathagar.com

তাহলে সেই অবৈধ ব্যবস্থার মরা লাশটি আগামী ২টি মেয়াদে জাতি টেনে বেড়াবে কেন? তার আসল খায়েশটি তিনি চেপে গেছেন। আগামী ২টি মেয়াদে যদি কেয়ারটেকারের অধীনে ইলেকশন হয় তাহলে তার একটিতে তিনি কেয়ারটেকারের শাহানশাহ্ হতে পারবেন। মনের সেই গুপ্ত বাসনাকে খায়রুল হক এই পথেই সূক্ষ্মভাবে বাঙময় করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের পরলোকগত কৌতুক অভিনেতা ভানু ব্যানার্জীর ডায়ালগ ধার করে বলতে হয়,'তাহলে এখানে এসে যায় দুইখান কথা'। আর সেই দুইখান কথা হচ্ছে–

১. কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থার অধীনে যেসব নির্বাচন হয়েছে তার সবগুলোই অবৈধ। ঐসব ইলেকশনের মাধ্যমে যেসব সরকার গঠিত হয়েছে তার সবগুলো সরকারই অবৈধ। তাহলে ১৯৯৬ সালে গঠিত হাসিনার সরকার, ২০০১ সালে গঠিত খালেদা জিয়ার সরকার এবং ২০০৯ সালে গঠিত শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার-এই ৩টি সরকারই অবৈধ।

২. এই ৩টি সরকারের বৈধতা সম্পর্কে খায়রুল হক খামোশ মেরে গেছেন কেন? যদি ৭৫ থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বিরাজমান মোশতাক, সায়েম ও জিয়ার সরকার অবৈধ ঘোষিত হয় তাহলে '৯৬ সাল থেকে বর্তমান সাল পর্যন্ত এই ১৬ বছর ধরে বিস্তৃত ও বিরাজমান সবগুলো সরকার অবৈধ ঘোষিত হবে না কেন? এব্যাপারে খায়রুল হকের রহস্যময় নীরবতার মাজেজা কি?

এসব প্রশ্ন তুলেছেন প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল। পরে গত বৃহস্পতিবার ঐসব কথার প্রতিধ্বনি করেছেন বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ। এখন এই কথাগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সুপ্রীমকোর্ট বার সমিতির সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেছেন যে, খায়রুল হক একজন 'চালাক' ব্যক্তি। আসলেই তাই। বিচারপতি হলেও তার আচার-আচরণ একজন পলিটিশিয়ানের মতো। তাও আবার যে সে পলিটিশিয়ান নয়। একেবারে খাস আওয়ামী ব্র্যান্ডের পলিটিশিয়ান। তার কাছে যদি প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণের অফার আসে তাহলে তিনি কি করবেন? যেহেতু তিনিই রায় দিয়েছেন যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা অসাংবিধানিক, তাই তার উচিৎ তেমন অফার পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু তিনি লোভ সংবরণ করতে পারেননি, আবার সেই মনোভাব এই মুহূর্তে প্রকাশও করেননি। তিনি আওয়ামী পলিটিশিয়ানের মতো জবাব দিয়েছেন, 'এখনও সে কথা বলার সময় আসেনি। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে। তিনি শুধুমাত্র চালাক নন, চালাকের বীচিপোড়া।

www.pathagar.com

তিন

জনাব খায়রুল হক বলেছেন তিনি বাকশাল সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। কারণ তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে পরবর্তী ৪ বছরের বিচার করেছেন। তার আগে তিনি যান নি। ভাল কথা। কিন্তু তিনি যদি সেই নীতিতে অটল থাকতেন তাহলে আমি তাকে সাধুবাদ জানাতে পারতাম। কিন্তু ৭ম সংশোধনীর বেলায় হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখতে যেয়ে তিনি ৭০ বছর পেছনে ফিরে গেছেন। ঐ রায়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, '৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সঠিক ছিলো না। তারা আরো বলেছেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নাকি পাকিস্তান চায় নি। তাহলে ৭০ বছর আগে ভারতবর্ষের মুসলমানরা কি অখণ্ড ভারতেই থাকতে চেয়েছিলেন? তাহলে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো কিভাবে? সেদিন পূর্ব বাংলার যে ৯০ শতাংশ মানুষ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ভোট দিয়েছিলেন, তারা কি সব আসমান থেকে নাজিল হয়েছিলেন? কথার পিঠে অনেক কথাই এসে যায়। হাইকোর্টের এই ধরনের তথ্য বিবর্জিত মনগড়া পর্যবেক্ষণকে খায়রুল হকের মত 'মহাপণ্ডিৎ' ব্যক্তি বহাল রাখলেন কিভাবে?

কেয়ারটেকার ব্যবস্থা যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে সেই কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত সমস্ত সরকারই অবৈধ হয়ে যায়। সেই কেয়ারটেকার সরকার অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে শেখ হাসিনার আমলে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। আবার ঐ কেয়ারটেকারের অধীনে গঠিত হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাহলে তার নিয়োগও অবৈধ। তার নিয়োগ যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে তার দেয়া সবগুলো রায় অবৈধ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কাচের ঘরে বসে খায়রুল হক অন্যের কাচের প্রাসাদে ঢিল ছুঁড়ছেন। এখন অন্যেরা যদি সেই প্রাসাদ থেকে তার কাচের ঘরে ঢিল মারে তাহলে কি হবে?

খায়রুল হকের রায়ে বলা হয়েছে সব মার্শাল ল'-ই অবৈধ। তাই জিয়া এবং এরশাদের দুটি মর্শাল ল'-ই অবৈধ (যদিও জিয়া কোনো মার্শাললি' জারি করেন নি)। তাহলে প্রশ্ন ওঠে– ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, যে নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই নির্বাচনটিও তো অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ইয়াহিয়া খানের মার্শালল'র অধীনে। তাহলে সেই নির্বাচনটিও কি অবৈধ ছিলো? জবাব দেয়ার দায়িত্ব খায়রুল হকের।

বিএনপির মহাসচিব মরহুম খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এবং অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে এলএফওর অধীনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের দায়িত্ব ছিলো পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা করা, বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করা নয়। পাক পার্লামেন্টের সদস্যরা বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন কিভাবে? এই প্রশ্নেরও জবাব দেয়ার দায়িত্ব খায়রুল হকের।

www.pathagar.com

৪৮

সংঘাতের পথে দেশ : প্রয়োজন কঠোর আন্দোলন

গত রবিবার অসুস্থতার কারণে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারিনি। সেই সপ্তাহে এবং এই সপ্তাহে অর্থাৎ গত ১৫ দিনে দেশে এবং বিদেশে আরেক ঘটনা ঘটে গেছে। সেগুলো নিয়ে একসাথে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। তাই একটি দুটি ইস্যুর মধ্যেই আজকের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। এ দুটি হলো কেয়ারটেকার সরকার বাতিল রায় এবং হরতাল। আজ রবিবার আপনারা যখন এই লেখাটি পড়বেন তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উক্তির প্রতিবাদে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা পূর্ণ হরতাল পালিত হচ্ছে। সেই হরতালকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অকস্মাৎ উত্তপ্ত হয়েছে। এবং সংঘাতের মুখে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কয়েকদিন আগে বিদেশ থেকে ফিরে শেখ হাসিনা বলেছেন ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে হাই কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আর কোনো সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিএনপি ও জামায়াতসহ ৪ দলীয় জোট তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী আলাদা আলাদা সাংবাদিক সম্মেলন করে শেখ হাসিনার উক্তির প্রতিবাদে আজ রবিবার ৫ জুন বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। চারদলীয় শরীক জোট অর্থাৎ ইসলামী ঐক্যজোট এই হরতালে সমর্থন জানিয়েছে। এছাড়া এই হরতালে সমর্থন জানিয়েছে জাগপা, ন্যাপ (ভাসানী), লেবার পার্টি, ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিস প্রভৃতি ইসলামী দল। সেই হরতালই আজ পালিত হচ্ছে। কিভাবে সেই হরতাল পালিত হচ্ছে, অর্থাৎ ঢিলেঢালা নাকি কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে, আগাম লেখার ফলে সেটি বলা সম্ভব হচ্ছে না।

ত্রয়োদশ সংশোধনী অর্থাৎ কেয়ারটেকার সরকার বাতিল রায় যে দেশের জন্য কতদূর সর্বনাশা সেটি সংবিধান বোদ্ধারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছেন। অনুরূপভাবে এই রায়কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নিজের জন্য এবং আওয়ামী লীগের জন্য যে বিপদ ডেকে এনেছেন এবং বাংলাদেশকে যে জটিল সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন সেটিও আওয়ামী পন্থী সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং আইনজ্ঞরাও ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করছেন। সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে ২ জন

www.pathagar.com

নামকরা ব্যারিস্টারের সর্বশেষ উক্তিতে। এরা হলেন দেশের প্রবীণতম আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক এবং ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ। তারা উভয়েই টেলিভিশনের বিভিন্ন টকশো এবং সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন- হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জাজমেন্ট বা রায় যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি সেই জাজমেন্টের সাথে প্রদত্ত অবজার্ভেশন বা পর্যবেক্ষণও বাধ্যতামূলক। যদি এই দুই আইনজীবীর এই ব্যাখ্যা সঠিক হয় তাহলে বলতেই হবে যে, বাংলাদেশ এখন গুরুতর রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এই দুই আইনজীবীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক এবং তার ফুল বেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধান পরিপন্থী, তাই সেটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হলো। এই রায়ের পর সংবিধানের ১৩ নম্বর সংশোধনী আর নেই। এটি তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার ঐ ২ প্রখ্যাত আইনজীবীর মতে পর্যবেক্ষণকেও রায় হিসেবে পরিগণিত করতে হবে। এবং তাই সেটিও বাধ্যতামূলক। তাহলে কেয়ারটেকার ব্যবস্থা সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, এই গ্রাউন্ডে সেটা বিলোপ করে আবার পরের নিঃশ্বাসে আগামী ২টি মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছরের জন্য কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকে বহাল রাখা যায় কিভাবে? সুতরাং সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা যখন বলেন ১৩ নম্বর সংশোধনী সম্পর্কিত সুপ্রীম কোর্টের রায়টি চরমভাবে পরস্পর বিরোধী, তখন তারা ভুল বলেন না। যে খায়রুল হক তার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং আইন পেশার দক্ষতা নিয়ে এত বড়াই করেন তিনি কিভাবে এমন গাঁজাখুরী রায় দিতে পারলেন? টেলিভিশন টকশোতে যারা নিয়মিত আসেন তাদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এই রায় আওয়ামী লীগের যত সুবিধা করে দিয়েছে অন্য কোনো রায় দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে এত ফেভার করেনি।

দুই

তাদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে এখন আওয়ামী লীগ যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে যেতে পারবে। তারা যদি দলীয় স্বার্থে মনে করে যে, এই ব্যবস্থা বাতিল করে দলীয় সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন করা সুবিধাজনক হবে তাহলে তারা তাই করবে। আবার অন্য একটি মহল বলেছে, যদি আওয়ামী লীগ মনে করে যে কেয়ারটেকার হলেই তাদের নির্বাচনে জয়লাভ করতে সুবিধা হবে তাহলে তারা রায়ের পর্যবেক্ষণ অংশের আশ্রয় নিয়ে কেয়ারটেকার সরকার রেখে দেবে। কিন্তু একটি অবৈধ ব্যবস্থাকে সাময়িকভাবে হলেও তারা কিভাবে রেখে দেবে ?

আগুনে ঘি ঢেলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারণ আগামীতে জাতীয় সংসদ কি করবে অথবা সংবিধান সংশোধনের জন্য তিনি যে কমিটি করে দিয়েছেন তারাইবা কি করবে, সে সম্পর্কে তিনি আগাম সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন। কারণ তিনি বলেছেন যে, এখন

www.pathagar.com

থেকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করে এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি চালু করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইল না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। কারণ যদি তিনি সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন তাহলে তো অন্তত এই বিষয়টি খোলাসা হয়ে যেত যে কোন্ গ্রাউন্ডে জনাব খায়রুল হক কেয়ারটেকার সরকারকে অবৈধ বলেছেন? পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়ার পর কেউ যদি সেই রায়ের সাথে একমত না হন তাহলে সেই রায়টি রিভিউ করার জন্য সংক্ষুব্ধ দল সুপ্রীম কোর্টের কাছে রিভিউ পিটিশন করতে পারতেন। এটিই দেশের প্রচলিত আইন। এছাড়া আরো বলা হয়েছে এটি নাকি ছিলো একটি বিভক্ত রায়। ফুল বেঞ্চের কতজন সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের সাথে একমত হতে পারেননি এবং কোন্ কোন্ পয়েন্টে একমত হতে পারেননি সেটিও জানা যেত এবং পুনঃবিচারের দরখাস্তে (রিভিউ পিটিশনে) সেগুলো হয়ত উল্লেখ করা যেত।

শেখ হাসিনার আলোচ্য উক্তির প্রায় এক মাস আগে, অর্থাৎ তার বিদেশ সফরের কয়েকদিন আগে শেখ হাসিনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন তিনি কেয়ারটেকার ব্যবস্থা রাখতে চান। কিন্তু বিদেশ থেকে ফেরার পর এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যে তিনি কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা না করেই একেবারে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দিলেন? তিনি পুর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য অপেক্ষা করলেন না, কেউ রিভিউ মামলা করবেন কিনা তার জন্য অপেক্ষা করলেন না, এমন কি তার সংবিধান সংশোধনী কমিটির রিপোর্টের জন্যও অপেক্ষা করলেন না। তাহলে সংবিধান কমিটির কি প্রয়োজন ছিলো? তারা এতদিন ধরে কি কাজ করলেন? আগামীতেইবা তারা কি করবেন তারও তো কোনো সুযোগ রইল না। এই অবস্থায় জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে এখন কোন্ বিল উত্থাপিত হবে? শেখ হাসিনা যেখানে সকলের সমস্ত কাজ ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন সেখানে বিএনপি সংসদে গিয়ে কোন্ 'লঙ্কা' উদ্ধার করবে? শেখ হাসিনার এক কথাই তো শেষ কথা। আর সেটি হলো, সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তারপরে তো আর কেয়ারটেকার রাখার কোনো সুযোগ নেই।

তিন

গতকাল শনিবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার সভানেত্রীত্বে গত শুক্রবার আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটির বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, "আমরা সংবিধানে সংশোধন আনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কেয়ারটেকার সরকারের সেই সংশোধন হবে সুপ্রীম কোর্টের রায় কঠোরভাবে অনুসরণ করে। কেয়ারটেকার সরকারকে আইনসিদ্ধ বলার অধিকার কারো নেই। কারণ দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক বলেছেন।

www.pathagar.com

তাহলে সুরঞ্জিত বাবুর সেই কমিটি ৪ জন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, প্রথিতযশা একঝাঁক আইনজীবী,আওয়ামী ঘরানা হওয়া সত্ত্বেও কিছু বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সিনিয়র সাংবাদিকদেরকে ডাকা হয়েছিলো কেন? কেন তাদের মতামত নেয়া হয়েছে? আর মতামত নেয়ার পর ঐসব মতামতের এক পয়সাও মূল্য দেন নি প্রধানমন্ত্রী। তাহলে সমাজের বিদগ্ধজন কি সুরঞ্জিত কমিটির কাছে গিয়েছিলেন স্রেফ ঘাস কাটতে?

এমন একটি পরিস্থিতিতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলসমূহের পক্ষে হরতাল না ডেকে কোনো উপায় ছিলো না। কারণ মাত্র এক মাসের মধ্যে রাজনীতির খেলায় শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ ডিগবাজি মারলেন। এর পেছনে নিশ্চয়ই একটি বিরাট রহস্য রয়েছে। সেই রহস্য আজও সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয় নি। ধীরে ধীরে সেটি উদঘাটিত হচ্ছে। তবে শুধুমাত্র সুপ্রীম কোর্টের রায়ই নয়, এই ইস্যুতে আওয়ামী লীগের ভূমিকাও চরমভাবে স্ববিরোধী। একদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের আর কোনো সুযোগ নেই। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতারা বলছেন এখনও দুয়ার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় নি। বিএনপি ইচ্ছা করলে এখনও সংবিধান সংশোধনী কমিটিতে তার মতামত দিতে পারে। তাও যদি তারা না দেয় তাহলে জাতীয় সংসদে এসে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে। প্রশ্ন হলো, সুপ্রীম কোর্টের দোহাই পেড়ে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে আর কোনো কিছু করার সুযোগ নেই, সেখানে বিএনপি সংসদে গিয়ে কি করবে? আর সংসদে গিয়ে বিএনপি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং পার্লামেন্ট যদি সেই বক্তব্য গ্রহণ করে তাহলে প্রধানমন্ত্রী অমন চূড়ান্ত কথা বললেন কেন?

প্রধানমন্ত্রী কি আসলে দর কষাকষির কোনো জানালা খুললেন? কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে দর কষাকষি? তাহলে তারা বলুক যে প্রধানমন্ত্রীর কথা চূড়ান্ত নয়। তারা বলুক প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে এমন ফাউল টক করেন। এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আওয়ামী লীগের দালালি করতে গিয়ে বলছেন বিএনপি সংসদে আসুক। বাইরে থেকে কথা বলছে কেন? সংসদে গেলেই কি কেয়ারটেকার সরকার এসে যাবে? এত কসরৎ না করে শেখ হাসিনা তো বলতেই পারেন, কেয়ারটেকার সরকার থাকবে। তাহলে তো আর ৫ তারিখের হরতালের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমরা জানি আওয়ামী লীগ সেই ভাষায় কথা বলবে না। তাই তো এই হরতাল সাধারণ মানুষের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

'পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা' গ্রন্থের লেখক জনাব মোবায়েদুর রহমান ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে বগুড়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়া জিলা স্কুল ও আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া থেকে তিনি যথাক্রমে ম্যাট্রিক ও আই.এ পাস করেন। তিনি ১৯৬৩-৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি 'দৈনিক আজাদে'র রিপোর্টার হিসেবে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে তিনি সাবেক 'ইপসিক' ও বর্তমান 'বিসিকে' (ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা) ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে হল্যান্ড থেকে তিনি 'এ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্টে'র ওপর ডিপ্লোমা করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থায় যোগদান করেন এবং বিটিএমসি'র অধীন ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায় প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিসিক ও বিটিএমসিতে মোট ২১ বছর চাকরি করেন।

সাংবাদিক জীবনে তিনি 'দৈনিক আজাদ' ও 'দৈনিক পূর্বদেশে' রিপোর্টিং ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। এ ছাড়া তিনি অধুনালুপ্ত 'দি মর্নিং সানে' নিয়মিত কলামিস্ট এবং 'বাংলাদেশ অবজারভারে' সম্পাদকীয় লেখক হিসেবে কাজ করেন। তিনি অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'ঝাণ্ডা' ও 'দৈনিক সকালের খবরের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।
১৯৯১ সালে জনাব মোবায়েদুর রহমান 'দৈনিক ইনকিলাবে' বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে যোগদান করেন এবং একই সাথে নিয়মিত কলাম লিখতে থাকেন। 'রূপকার' ছদ্মনামে তিনি দৈনিক ইনকিলাবে 'রাজনৈতিক রঙ্গালয়' শীর্ষক যে নিয়মিত সাপ্তাহিক কলাম লিখতেন সেটা বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বর্তমানে তিনি 'দৈনিক ইনকিলাবে'র এ্যাসোসিয়েট এডিটর। জনাব মোবায়েদুর রহমান 'দৈনিক দিনকাল' ও 'বাংলাবাজার পত্রিকা'য় কলাম ও রাজনৈতিক ভাষ্য লিখতেন। এখনও তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' এবং 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা'য় কলাম এবং সংবাদ ভাষ্য লিখে যাচ্ছেন। একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার ও গোলটেবিল বৈঠকে তাঁর বক্তব্য সচেতন জনগোষ্ঠীর মাঝে বিপুলভাবে আলোচিত হয়।

২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালালে জনাব মোবায়েদুর রহমান বাংলাদেশের একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে আফগান রণাঙ্গনের যেসব রিপোর্ট পাঠান, ইনকিলাবে প্রকাশিত সেই সব রিপোর্ট সেই সময় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চেহারা উন্মোচন করে এবং জনগণের মাঝে ঐ সব রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

জনাব মোবায়েদুর রহমান ১৯৯৩ সালে মেডিটেশন কোর্সে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করেন। শত শত গ্র্যাজুয়েটের মাঝে বাংলা ভাষায় তিনি মেডিটেশন করিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে তিনি মেডিটেশনের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন এবং গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁর এই গবেষণা এবং পড়াশোনার ফসল হলো 'সাবলাইম মেডিটেশন' নামক গ্রন্থটি। বাংলাদেশে সাবলাইম মেডিটেশনই একমাত্র কোর্স যেটি পবিত্র কোরআনে'র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর রচিত। পেশাগত কাজে জনাব মোবায়েদুর রহমান এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়া সফর করেছেন।